# ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাস

পণ্ডিতমশাই



বুক গার্ডেন

৮।৩এ, হাতীবাগান রোড, কলিকাতা-১৪।

প্রকাশক ঃ
বুক গার্ডেনের পক্ষে
শ্রীতারকচন্দ্র দাস
৮।৩এ, হাতীবাগান বোড,
কলিকাত -১৪ ।



প্রথম প্রকাশ—
স্বাধীনতা দিবস, ১৯৬০ ।

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসলিল কুমার বসু
এশিয়ান প্রিণ্টার্স
পি-১২, সি, আই, টি, রোড,
কলিকাতা ১৪ ।

পাচ টাকা

পরিবেশক ঃ
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-১২ ।
ফোন ঃ ৩৪-৭২১৪

# নিবেদন

্তক আরম্ভের পূর্ব্বে আমার যৎসামান্য বক্তব্য পাঠকবর্গের সামনে
রছি। এই ইতিহাস এর পূর্বে ১৯৪৬ সালে আমিই প্রথম প্রকাশ
রাম এবং সেটী হয়েছিল ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে, সুভেনীর আকারে,
এবার পুস্তকাকারে এবং বাংলা ভাষায় করা হলো, কারণ আমার অনেক
বান্ধব অনুরোধ জানালেন যে অনেক খুটীনাটী কথা আছে যা ইংরাজীতে
সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এবারে বাংলা ভাষায় লিখুন।
বর অগনিত সমর্থক সকলেই প্রায় বাংলা ভাষাভাষী। উক্ত কারণে
লাতেই ইহা প্রকাশ করা হলো।

এই পুস্তকের বর্ত্তমান প্রকাশক আমার অতীব স্নেহভাজন। যেহেতু এর
তা ৺রাধারমণ দাস আমার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এবং তিনি এই ক্লাবের
জন বিশেষ উৎসাহী সভ্যও ছিলেন। যাই হউক এমনি একজন বান্ধবের
ত্রর সহায়তায় এই পুস্তক প্রকাশ হলে তজ্জন্য আমি বিশেষভাবে আনন্দিত।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাস সম্বন্ধে এর পূর্বে কেহ কেহ সাময়িক পত্র-
ত্রিকায় লিখেছেন বটে, কিন্তু সঠিক বর্ণনা কেহই দিতে পারেন নি—উপর
পর যৎসামান্য লিখেই কর্ম্মসমাধা করেছেন, তাতে অনেক ভুল ভ্রান্তিও
কাশ পেয়েছে, কিন্তু এই ধরনের পুস্তক প্রকাশ করার বিষয় নিয়ে কেউ মাথা
ামান নি।

ইং ১৯১৮ সাল থেকে একাধিক্রমে ৩৫।৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে
গড়ের মাঠে খেলা দেখে এসেছি। তার পরেও মাঠে গিয়েছি বটে, তবে খুব
নিয়মিত নয় যাহা হউক, এতদিনকার অভিজ্ঞতা যা সঞ্চয় হয়েছে তার কিছুটা
আভাস মাঝে মাঝে এই পুস্তকে দিতে চেষ্টা করেছি।

বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে, বহু পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে এই পুস্তকের
বিষয়বস্তু সংগৃহী হয়েছে। এই পুস্তকের মৌলিক তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে
বহু বেগ পেতে হয়েছে। এই ক্লাবের গোড়াপত্তনের সময় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা
প্রায় অধিকাংশই পরলোক গমন করেছেন। কয়েকজন অবশ্য এখনও জীবিত
আছেন বটে তাঁরাও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবে সব কথা বলতে পারেন না, গোলমাল

করে ফেলেন। কিন্তু আমি সকল রকম তথ্য নির্ভুলভাবে সংগ্রহ ও প্রয়োগ করেছি। তা'ছাড়া আমার নিজের স্মৃতিপথেও অনেক বিষয় রয়েছে, অনেক সংগ্রহও আমার আছে। নানারকম তথ্যসংগ্রহ আমার নিজস্ব একটা বাতিকও বটে।

ইতিপূর্বে খেলাধূলা সংক্রান্ত কয়েকটি সাময়িক পত্রিকাতেও আমি অল্পবিস্তর প্রবন্ধ লিখেছি। খেলাধূলা সংক্রান্ত সাংবাদিক হিসাবে কিছুটা খ্যাতিও আছে।

যাই হউক এই ইতিহাস পাঠ করে পাঠকবর্গ এই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব সম্বন্ধে সমস্ত খুটীনাটী বিষয় জানতে পারবেন, কিছুই বাদ যাবে না একথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছি। এক্ষণে পাঠকবর্গ একে সাদরে গ্রহণ করলেই আমার পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল জ্ঞান করবো। অলমিতি—

গ্রন্থকার

## যুগান্তর বলেন

ক্রীড়া জগতে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব যেমন জনপ্রিয়, তেমনি নানা ঐতিহ্যের অধিকারী। ১৯২১ সালে এই ক্লাব প্রথম স্থাপিত হয়। তারপর ধাপে ধাপে ঐ ক্লাব গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। একাধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয় এবং আই, এফ, এ, শীল্ড জয় করে। কলকাতার মাঠে সব রকম ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে সে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। রোভার্স কাপ এবং ডুরাণ্ড কাপও সে জয় করে এনেছে। মোট কথা, ভারতের বিভিন্ন ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে নিজেকে সে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, ভারতের বাইরেও সে আমন্ত্রিত হয়ে খেলতে গিয়েছে। ১৯৪২ সালে সর্বপ্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার আগে কতবার যে 'একটুর জন্য' সে সাফল্য লাভ করতে পারেনি এবং কতবার যে তাকে 'রাণার্স আপ' হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে—সে রোমাঞ্চকর ইতিহাস ক্রীড়ামোদীদের নিকট সুবিদিত।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক পণ্ডিত মশাই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের একজন অন্তরঙ্গ প্রবীণ হিতৈষী। ক্লাবের নাড়ীনক্ষত্র তাঁর নখদর্পণে। ক্লাবের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত—ক্লাবের ধারাবাহিক ইতিহাস তিনি আকর্ষণীয় ভাষায় গল্পের মত বলে গেছেন। সে ইতিহাস যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি বিচিত্র। উল্লেখযোগ্য এবং স্মরণীয় খেলার বর্ণনা বিভিন্ন খেলার ফলাফল, সে যুগের এবং এ-যুগের বিখ্যাত খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁদের খেলার বৈশিষ্ট্য এবং অনেক 'নেপথ্য' কাহিনীও তিনি বলেছেন। সে যুগের দুর্ধর্ষ গোরা-টিমদের সঙ্গে খেলার কাহিনীও রোমাঞ্চকর।

আলোচ্য গ্রন্থখানি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের অনুরাগীদের তো বটেই, প্রত্যেক ক্রীড়ারসিকদেরই আনন্দ দেবে। ফুটবল সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনা হলেও ক্লাবের হকি এবং ক্রিকেটও বাদ যায়নি। প্রচুর ফটো থাকায় এবং প্রিয় খেলোয়াড়দের পরিচিতি থাকায় সে-যুগের দর্শকেরা তাদের হারানো মধুর স্মৃতি আবার ফিরে পাবেন, এ যুগের দর্শকেরাও লাভবান হবেন।

## দৈনিক বসুমতী বলেন

ইতিহাস কোন ব্যক্তি বা দেশ বা কোনো সংস্থাকে আশ্রয় ক'রে হ'তে পারে। আমাদের সামাজিক জীবনে এমন অনেক কিছু আছে, যা আপাতঃ দৃষ্টিতে তুচ্ছ ও ক্ষণিক এবং মনে হয়, তাদের কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই। বুদ্বুদের মত কত অজস্র ক্লাবই তো জন্মায় ও শেষ হয়ে যায়। ক্লাব সদস্যেরা ছাড়া তা বড় একটা কেউ মনে রাখেন না। কিন্তু তারও যে ব্যাতিক্রম আছে, এই বইখানি পড়লে সে-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। এখানে যেন কেবল নিছক একটা ফুটবল খেলার ক্লাবের কথা নয়, এর উদ্ভব থেকে এর চলতি পথে একটা দেশ, একটা জাতিও যেন চলছে, এই ক্লাবটির সঙ্গে একটি দেশ বা জাতির ইতিহাস যেন লেখা চলেছে। হয়তো একটা দিক মাত্র. মনে হ'তে পারে অনাবশ্যক দিক, কিন্তু না, এর মধ্যে দেশ জাতির একটা প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক বহু তথ্যের সমাবেশে একটা ক্লাবেরই শুধু ইতিহাস লেখেননি, বইখানি পড়ে আমরা নিঃসংশয় হয়েছি—এ ইতিহাস এবং জাতির সামগ্রিক ইতিহাসের এও একটি অনুপেক্ষণীয় উপকরণ। লেখক সমগ্র জাতির কাছে. একটি ক্লাবের উপলক্ষ্য করে ইতিহাসের একটা দিক উদ্‌ঘাটন করেছেন। আমাদের আশা আছে, বইখানি বহুজনসমাদৃত হবে, কেবল ক্রীড়ামোদীরা নন—সকল স্তরের মানুষই এটি পড়ে খুশী হবেন।

# সুচনা

ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাস লিখতে গেলে প্রথমেই এমন একজন লোকের নাম লিখতে হয় যিনি এই ক্লাব সৃষ্টির মূলসূত্র ছিলেন বলা চলে। তখনকার দিনে তিনি একজন নামজাদা খেলোয়াড়রূপে পরিগণিত ছিলেন। তাঁর নাম শ্রীশৈলেশচন্দ্র বসু।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার মালখানগর গ্রাম নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বংশ বসু পরিবারে তাঁর জন্ম। উক্ত মালখানগর বসু পরিবারে অনেক প্রতিভাধর খেলোয়াড় আবির্ভূত হয়েছে। তন্মধ্যে শৈলেশ বসু, ৺হেমাঙ্গ বসু, অনিল বসু প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। বর্তমানে হেমাঙ্গ বসুর পুত্র শ্রীমান শিবাজী বসু বাংলার একজন খ্যাতিমান ক্রিকেট খেলোয়াড়। অবশ্য তার পিতা হেমাঙ্গ বসু বাংলার ক্রিকেট জগতে অবিস্মরণীয় নাম রেখে গেছেন। এবং ফুটবলেও তাঁর দক্ষতা কম ছিল না।

শৈলেশবাবু ১৯১৫ সাল থেকে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে জোড়াবাগান ক্লাবে তিনি যোগদান করেন এবং নিয়মিতভাবে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলতে থাকেন। ১৯১৯—২০ সালের ক্রিকেট মরশুমে বিখ্যাত সি, সি, সি অর্থাৎ ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে জোড়াবাগান ক্লাবের খেলার দিন শৈলেশ বসুকে খেলায় অনুপস্থিত দেখা যায়। জানা গেল যে শৈলেশবসু সেদিন টিম থেকে বাদ পড়েছেন কারণ সিলেকসন কমিটি তাঁকে মনোনয়ন করেন নি। পরদিন শৈলেশ বসু জোড়াবাগান ক্লাবের তদানীন্তন বিশিষ্ট সদস্য ও ভাইস প্রেসিডেন্ট সুরেশ চৌধুরী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে গতকাল ক্যালকাটা টীমের বিপক্ষে খেলায় আমি টীম থেকে বাদ পড়লাম কেন? এইটুকু প্রশ্নের জবাব আমি আপনার কাছে জানতে চাই, দয়া করে উত্তর দেবেন কি? সুরেশবাবু বললেন যে আমিত এর কারণ

কিছুই জানি না। আচ্ছা, আমি অনুসন্ধান করে আপনাকে জানাব। সুরেশবাবু এইভাবে শৈলেশবাবুকে আশ্বস্ত করে ক্লাবে গিয়ে অনুসন্ধান করেও বিশেষ কিছু হদিস পেলেন না। তবে এইটুকু বুঝলেন যে সিলেকসন কমিটী বিনা অজুহাতে শৈলেশ বসুকে উক্ত খেলায় বাদ দিয়েছেন। বাদ দেবার মত কোনরূপ যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। অথচ শৈলেশ বসু টীমের মধ্যে একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়, তাঁকে বাদ দিয়ে টীম গঠন করার কোন অর্থ হয় না। কর্মকর্তাগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যেটুকু বুঝলেন তাতে তিনি বিশেষ ভাবে মর্মাহত হলেন। শৈলেশবাবুকে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না। উক্ত কারণে সুরেশবাবু জোড়াবাগান ক্লাবের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ করলেন। বলা বাহুল্য শৈলেশ বসু ও জোড়াবাগান ক্লাব থেকে বিদায় নিলেন। উক্ত ঘটনার আভ্যন্তরীণ যে গূঢ় অর্থ নিহিত ছিল তা, সাধারণ্যে প্রকাশ করা তখনও সম্ভব ছিল না, এখনও সম্ভব নয় অর্থাৎ সমীচীন নয়। তবু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে অত্যন্ত নীচ ও জঘন্য মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়ে উক্ত জোড়াবাগান টীমের তদানীন্তন সিলেক্ট কমিটীর কর্তাগণ এরূপ কাণ্ড করেছিলেন। যার ফলে কলকাতার মাঠে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের উৎপত্তি।

উক্ত সুরেশ চৌধুরী মহাশয় ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার নাগরপুর (Nagarpur) গ্রামের জমিদার। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় যিনি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল ও মেট্রোপলিটন কোম্পানী সকলের ভূতপূর্ব ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। নাগরপুরের জমীদার বংশের যথেষ্ট সুনাম আছে। অর্থে, বিত্তে, আচারে, ব্যবহারে, বদান্যতায় বাংলাদেশে তাঁরা প্রভূত খ্যাতিসম্পন্ন। সুরেশ বাবু প্রথম জীবনে খেলাধূলায় অত্যন্ত উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। স্বভাবচরিত্রেও তিনি অত্যন্ত অমায়িক, সদাপ্রফুল্ল ছিলেন। এ হেন খেলাধূলায় অত্যুৎসাহী সুরেশবাবু জোড়াবাগান ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। শৈলেশ বসুকে নিয়ে একদা

পরামর্শ করলেন যে আমরা ত' ইচ্ছা করলে নিজেরাই একটা টীম বা ক্লাব গঠন করতে পারি। তার পরেই পরামর্শ অনুযায়ী কাজেও তাঁরা আত্মনিয়োগ করলেন।

তখন কলকাতার ভারতীয় টীমগুলির মধ্যে, অধিকাংশ খেলোয়াড় ছিল পূর্ববঙ্গীয়। সুরেশবাবু মনস্থ করলেন যে পূর্ববঙ্গীয় বাছাই করা খেলোয়াড় সংগ্রহ করে একটা টীম গঠন করা যাক্। তখন ভাদ্র-আশ্বিন মাসে কুমারটুলি পার্কে হারকিউলিস কাপ নামীয় একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা হতো। সুরেশবাবু চেষ্টা করে একটি টীম গঠন করে উক্ত হারকিউলিস কাপের প্রতিযোগিতায় যোগদান করলেন। উক্ত টীমের খেলোয়াড়গণ সকলেই আই. এফ. এ.র সঙ্গে যুক্ত ক্লাবের সদস্য ছিলেন। হারকিউলিস কাপের সঙ্গে আই. এফ. এ.র কোন সম্বন্ধ নাই সুতরাং উক্ত খেলোয়াড়গণ অনায়াসেই, তাতে যোগ দিলেন। উক্ত টীমের নামকরণ করা হলো ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব। উক্ত টীমে মোহনবাগান ক্লাবের অধিনায়ক গোষ্ঠবিহারী পাল ব্যাক পজিসনে খেলতে নামেন। খেলোয়াড়গণ সকলেই নামজাদা চৌকস বাছাইকরা খেলোয়াড় হওয়ায় অতিরিক্ত যোগ্যতার সঙ্গেই উক্ত হারকিউলিস কাপ জয় করলেন। তখন সেটা ১৯২ সাল। সুরেশবাবু উক্ত টীমের পরিচালক বা সর্বময় কর্তা হিসাবে কাপ জয়ের আনন্দ বিশেষভাবে অনুভব করলেন এবং এই নব-গঠিত ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে কি ভাবে স্থায়ী করা যায় তার চিন্তা করতে লাগলেন। এই সময় কতিপয় অত্যুৎসাহী ক্রীড়ামোদী বন্ধুও তাঁর জুটে গেল। তন্মধ্যে রায় বাহাদুর তড়িৎ ভূষণ রায় মহাশয় ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসাহী। তিনি ঢাকা জেলার ভাগ্যকূলের বিখ্যাত কুণ্ডবংশের সন্তান এবং স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তখন তিনি কলকাতা হাইকোর্টের সলিসিটর বা এটর্নী ছিলেন। কুমারটুলি পার্কের উত্তর প্রান্তে তাঁর নিজস্ব ভবন। উক্ত ভবনে নবেম্বর মাসে (১৯২০ সাল) সুরেশবাবু ও তড়িৎবাবুর চেষ্টায় এক সভার অধিবেশন

হয়। উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলার খেলাধূলার পুরোধা প্রফেসর সারদারঞ্জন রায়। তিনি তৎকালে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। উক্ত সভাধিবেশনেই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব স্থাপনা হয়।

সভাপতি-অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়।

যুগ্ম সম্পাদক—সুরেশচন্দ্র চৌধুরী ও তড়িৎভূষণ রায়।

নন্দলাল রায়, ননীলাল রায়, নীলকৃষ্ণ রায়, পুলিনবিহারী রায়, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, বিজয় রায়, বনোয়ারীলাল রায়, কেশব চ্যাটার্জী প্রভৃতি উৎসাহী ক্রীড়ামোদী-গণ ক্লাবের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হলেন। স্বনামধন্য পঙ্কজ গুপ্তও ঐ সঙ্গে যোগদান করেন। একথা বললে ভুল হবে না যে পঙ্কজবাবু খেলা-ধূলার জগতে আত্মপ্রকাশ করেন উক্ত ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবেব মাধ্যমেই। তারপর ক্লাবের কর্ম্মকর্ত্তাগণের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব পরিত্যাগ করেন।

ক্লাব গঠন হওয়ার পর কর্মকর্ত্তাদের চিন্তা হলো যে কিভাবে ভাল ভাল খেলোয়াড় সংগ্রহ করে ভাল টীম গঠন করা যায় এবং আই. এফ. এ.র সঙ্গে যুক্ত হয়ে খেলা ধূলায় অংশ গ্রহণ করা যায়। অবশ্য অচিরেই তাঁদের আশা পূরণ হলো! ভাল টীমও গঠন হলো এবং আকস্মিকভাবে এমন সুযোগ এসে গেল যে আই. এফ. এ.র সঙ্গে যুক্ত হতেও বেশী সময় লাগলো না, অবশ্য এই সকল বিষয়ে একমাত্র রায় বাহাদুর তড়িৎ বাবুর বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টাই কার্য্যকরী হয়েছিল। রায় বাহাদুর তড়িৎবাবু ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে স্বপ্রতিষ্ঠ করার জন্য যে পরিমাণ মস্তিষ্ক চালনা করে গিয়েছেন পরবর্ত্তীকালে তার তুলনা নেই বললেও অত্যুক্তি করা হয় না? কারণ তখন এই ক্লাবের অতি শৈশবাবস্থা, একে দাঁড় করিয়ে রাখবার জন্য তড়িৎবাবু বহু রকম চেষ্টা করেছেন। একমাত্র তাঁর জন্যই এ ইক্লাব অস্তিত্ব বজায় রেখে আজ যশের উচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান হয়েছে, নতুবা হয়ত

অকালেই এর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হতে দেখা যেতো। আমরা এমন অনেক ক্লাবকে দেখেছি ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়েছে, আবার কিছুদিন বাদে লয়ও পেয়ে গেছে; কিন্তু ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব শুভক্ষণে গোড়াপত্তন করেছিল, তাই আজ তার সুনাম চারিদিকে ছড়ানো। শুধু ভারত কেন সমগ্র এশিয়া ইউরোপেও তার নাম ক্রীড়ামোদী-মহলে জ্ঞাত! ভারতবর্ষের আঁর কোন টীমই ইউরোপ হতে আমন্ত্রণ পায় নাই আজ পর্য্যন্ত একমাত্র ইষ্টবেঙ্গল টীম ছাড়া। ভারতবর্ষের ফুটবল টীম হিসাবে একমাত্র অলিম্পিক টীমই ইউরোপ পরিদর্শনে বা খেলতে গিয়াছে, কিন্তু একক টিম হিসাবে অন্য কোন টিমই ইউরোপ পরিদর্শনে বা খেলতে যায়নি। যারা "পায়োনীয়ার" টিম বলে গর্ব্ব করে থাকেন তাঁরাও এ সম্মানের অধিকারী এখনও হননি।

অবশ্য পরবর্ত্তী কালের কর্মকর্ত্তাই সেই সম্মান লাভের সুযোগ এনে দিয়েছিল, কিন্তু যদি এই ক্লাব শৈশবাবস্থা কাটিয়ে বড় হয়ে না উঠতো তা'হলে এই সুযোগ আসতো কোথা দিয়ে এটাও ভাববার বিষয়। যাঁরা একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষকে রোপণ করেছিল, তাঁরা যদি একে জল সিঞ্চন করে বাঁচিয়ে না রাখতে পারতো, তা'হলে আজ যে এই মহীরুহ বিরাটরূপে ফল পুষ্পে শোভিত হয়েছে তাকি কেউ দেখতে পেতো? সেই জন্যই বলছি যে এই ক্লাবের অগণিত সমর্থক-বৃন্দের স্মরণীয় সুরেশ চৌধুরী ও রায় বাহাদুর তড়িৎভূষণ রায় আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন বলেই আজ আমরা গৌরবান্বিত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

আমি বার বার একই কথা বলছি এবংজোরের সঙ্গেই বলছি যে রায় বাহাদুর তড়িৎবাবু এই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত না হলে এর অস্তিত্ব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতো, কেবল সুরেশ বাবুর এক-নিষ্ঠতা, অধ্যবসায়, অর্থব্যয় ও পরিশ্রম বৃথা হয়ে যেতো, কোন স্থায়ী ফল লাভ করতে পারতো না। তড়িৎবাবুর মত দৃঢ়চিত্ত ও কূটকৌশলী লোকের পরিচালনায় এর অস্তিত্ব বজায় ছিল।

এবং ক্রমে ক্রমে সুনামের পথে অগ্রসরও হয়েছে। অবশ্য এই ক্লাব খুব দ্রুতগতিতেই উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে একথা অবিসম্বাদী সত্য। এই ক্লাবের উপর দিয়ে বহু ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়েছে। বহু বাধা বিঘ্ন একে অতিক্রম করতে হয়েছে। সত্যকথা বলতে গেলে একক হিসাবে এই ক্লাব এতাবৎকাকাল যুঝে এসেছে। বাইরে থেকে এর অনেক মিত্র দেখা যায় বটে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ এর শত্রু ছাড়া মিত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি, এখনও নয়। আজ এই ক্লাবের অসংখ্য অনুরাগী দেখা যায় বটে কিন্তু প্রথম দিকে অতি অল্পসংখ্যক লোকের সহানুভূতির উপর নির্ভর করে এই ক্লাব দাঁড়িয়েছিল। প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ চৌধুরী ও রায় বাহাদুর তড়িৎভূষণ রায় মহাশয়, মধ্যসময়ে সুবিখ্যাত মাননীয় সন্তোষের মহারাজা মন্মথ নাথ রায়চৌধুরী মহাশয় ও বিখ্যাত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় দৃঢ়হস্তে ক্লাবকে ধরে রেখেছিলেন। তাঁদের জন্যই ঝড় ঝঞ্ঝা এলেও কিছুই ক্ষতি করে উঠতে পারে নি। আরও যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা এই ক্লাব পবিবর্দ্ধিত হয়েছে তাঁদের নাম জানাচ্ছি—বনোয়ারীলাল রায়, ইনি ঢাকা জেলার ভাগ্যকুলের বিখ্যাত কুণ্ডু বংশের সন্তান। ইনি এই ক্লাবকে আপন অঙ্গস্বরূপ মনে করতেন। লক্ষাধিক টাকা ইনি এই ক্লাবের কল্যাণে ব্যয় করেছেন। এত অধিক অর্থ ব্যয় শুধু এই ক্লাবের কেন কলকাতায় বোধ হয় কেহই কোন ক্লাবের জন্য করেন নি। এই বনোয়ারী বাবু ক্লাব সৃষ্টিকালীন ফুটবল সেকসনের সেক্রেটারী হয়েছিলেন, তারপর ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ১৭ বৎসর পর্যন্ত তিনি ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত ছিলেন। সেক্রেটারী থাকা কালীন তাঁর কর্ম্মতৎপরতা হয়ত বিশেষ দেখা যায় নাই, কিন্তু অর্থ ব্যয় করতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তৎকালীন তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কাজ করে গিয়েছেন জিতু মুখার্জী। এই জিতু বাবু ছিলেন শিক্ষিত এবং কূটকৌশলী। প্রকৃতপক্ষে সেক্রেটারীর যা

কাজ তা জিতু বাবুই সম্পন্ন করতেন, শুধু নাম থাকতো বনোয়ারী বাবুর। জিতুবাবু রায় বাহাদুর তড়িৎবাবুর চিন্তাধারা ও কর্ম্ম-পদ্ধতিকেই অনুসরণ করতেন। তিনি অর্থাৎ জিতুবাবু ১৯৩৫-৩৬ সালে আই. এফ. এ.র যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। বাস্তবিক জিতু মুখার্জী (J. N. Mukherjee) এই ক্লাবের জন্য প্রাণপাত করে গেছেন। ইহা শুধু মৌখিক কথা নয়—খাঁটি সত্য কথা। জিতু বাবু এই ক্লাবের জন্য যা করে গেছেন তা' অতুলনীয়। বনোয়ারী বাবু অবশ্য পরবর্ত্তী কালে ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রেসিডেন্ট পদপর্য্যন্ত উন্নীত হয়েছিলেন। আরও যে কয়েকজন বিশেষ কর্ম্মী এই ক্লাবের জন্য অক্লান্তভাবে খেটেছেন তাঁদের নাম জানাচ্ছি। যথাক্রমে—শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীঅমিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত, ৺সুধীর সেন, শ্রীরমণীরঞ্জন ঘোষ (শ্যাম দা), শ্রীগিরিশ ঘোষ দস্তিদার, শৈলেশ মিত্র, মানিক গুহ, বিজয় বসু প্রভৃতি। ১৯৪০ সালের পর শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র গুহ এই ক্লাবে একজন দিকপাল কর্মী হয়ে দেখা দিলেন। প্রথমে তিনি এসিষ্টেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হন। তারপর জেনারেল সেক্রেটারী। প্রায় দশ বৎসর তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর কর্ম্মপ্রচেষ্টা ভালমন্দ সব কিছু সমালোচনার বহির্ভূত। যেহেতু তাঁর আমলেই ক্লাবের উন্নতির চরম অবস্থা গিয়েছে। ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি এই ক্লাবের সঙ্গে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন কারণ শেষ দিকে তাঁর কর্ম্মধারায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে অপসারিত করেছেন কিন্তু তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না, একথা ঠিক।

তারপরে নাম করা যায় শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ওরফে কপিবাবু। ইনি মোহনবাগান ক্লাবের ১৯১১ সালের শীল্ড-বিজয়ী টিমের সেণ্টার ফরোয়ার্ড অভিলাষ ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি পূর্ব্বে মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন, ১৯৩৫ সালে ইনি মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গ ত্যাগ করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এসে যোগ দেন। তারপর এতাবৎ-

কাল ইনি এই ক্লাবের জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করে ক্লাবের উন্নতির জন্য খেটেছেন। কপিবাবু ধীরমস্তিষ্ক, কূটকৌশলী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি। ইনি ১৯৪৯ সালে ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু মতানৈক্যের দরুণ উক্তপদ পরিত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে ইনি ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেণ্ট। এবং ক্লাবের কর্ম্ম-পরিষদে ইনিই বয়োবৃদ্ধ এবং বিশেষ উপদেষ্টা।

যাঁরা খেলোয়াড়রূপে ক্লাবে যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মীরূপে ক্লাবের জন্য খেটেছেন ও অক্লান্তকষ্ট হিসাবেই খেটেছেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম দিলাম যথাক্রমে—৺ভোলা সেন, নসা সেন, ৺ননী গোঁসাই, সূর্য্য চক্রবর্ত্তি, মোনা মল্লিক, হারাণ সাহা, পরেশ দাসগুপ্ত ও নসা বসু প্রভৃতি। অবশ্য জিতু মুখার্জ্জি ও জ্যোতিষ গুহ এই দুইজনও ক্লাবে খেলোয়াড়রূপেই প্রথমে যোগদান করেন, পরে তাঁরা দুইজনই দিকপাল কর্ম্মী হিসাবেই কাজ করে গেছেন। আরও কয়েকজন কর্ম্মীব নাম করা যায়, যাঁরা এই ক্লাবের জন্য প্রশংসনীয় কাজ করেছেন বা করছেন। তাঁরা যথাক্রমে—ডাঃ সুরেন সেনগুপ্ত, শ্রীমন্ত দাশগুপ্ত, রাজেন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, ডাঃ ডি. কে. চাটার্জি, পবিত্র সরকার, সুবিমল সরকার, তরুণ রায়, যাদব চন্দ, কালিদাস ব্যানার্জ্জি, নীরেন ব্যানার্জি, শচীন চাটার্জি, রুহিদাস পোদ্দার, ক্ষিতিশ সাহা, ব্রজদুলাল সেন, কে. ডি. রায় (বাহাদুরবাবু), অধ্যাপক দুর্গাশরণ চক্রবর্ত্তী, সতী প্রসন্ন দাশগুপ্ত, নন্দলাল সাহা (এটর্নী), জগদীশ চন্দ্র সাহা, ননী কুণ্ডু মহাশয়, নন্দলাল পাল, জিতেন চৌধুরী, রণদাচরণ মজুমদার, তারাপদ গুহ, শিশির সেন, শৌর্য্যেন্দু গোস্বামী, অনিল ব্যানার্জী, লোকনাথ সাহা।

তারপর যাঁদের নাম দিলাম, এঁরা ক্লাবের অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী সভ্য। ক্লাবের ভালমন্দ এঁদের পারিবারিক চিন্তার সমান এবং এঁরা ক্লাবের কর্মীও বটেন। যথাক্রমে—চপলাকান্ত গুহঠাকুরতা, তরণী

গাঙ্গুলী, ললিত মোহন দে, সুধাংশু দত্ত (টুনু), গোপাল সেন, বিনয়েন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কর, গোপাল দাস, বিমল সেন, আশুতোষ দাশগুপ্ত, দীনেশচন্দ্র সরকার, শ্যামাকান্ত আচার্য্য, ঝণ্টু সেন, শৈলেন মৈত্র, রাজেন চক্রবর্ত্তী, বলাই ঘোষ, প্রভৃতি।

৺তরুনকুমার রায় ছিলেন রায় বাহাদুর তড়িৎ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি অল্প বয়সেই ক্লাবে যোগদান করেছিলেন—ক্রিকেট খেলায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তারপর তিনি ক্লাবের কর্ম্ম পরিষদে যোগ দেন এবং সহকারী সম্পাদকের পদ পর্য্যন্ত তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু বছর তিন পূর্ব্বে অকালেই তাঁর জীবনান্ত হয়। পিতার ন্যায় কর্ম্ম-দক্ষতা তিনি লাভ করতে পারেন নি বটে, কিন্তু তাঁর অমায়িক সরল ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ ছিল।

আর একজন লোকের নাম আমি না জানিয়ে পারলাম না, যিনি কর্ম্মের বিনিময়ে ক্লাবের নিকট থেকে অর্থগ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর কর্ম্মদক্ষতা অতীব প্রশংসণীয় এবং ক্লাবকর্তৃপক্ষ একথা স্বীকার করতে বাধ্য। যদিও তিনি কর্ম্মচারী হিসাবে কাজ করেছেন তথাপি ক্লাবের শুভাশুভের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কিভাবে ক্লাবের সুনাম বৃদ্ধি হয় বা কোনরূপ ক্ষতি না হয়, সেই দিকে তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা ছিল। তিনি শ্রীমাখনলাল গোস্বামী। উক্ত মাখন গোঁসাই ক্লাবের সমস্ত বিভাগের কাজ একাই সুষ্ঠুভাবে সমাধা করেছেন। এরূপ কর্ম্মদক্ষ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ব্যক্তি ক্লাবে আর দ্বিতীয় দেখা যায়নি, একথা অত্যুক্তি নয়। অন্য কোন ক্লাবেও তাঁর মত কর্ম্মদক্ষলোক আছে কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমানে তিনি অবৈতনিক গ্রাউণ্ড সেক্রেটারী।

বর্ত্তমান ভাইস-প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত রণদেব চৌধুরী (ব্যারিষ্টার) ক্লাবের জন্য বিশেষভাবে তাঁর চিন্তা ও কর্ম্মধারা প্রয়োগ করছেন। তিনি একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি, বাংলার একটি বিশিষ্ট বংশের সন্তান তিনি. তাঁর সহযোগিতা লাভ করে ক্লাব গৌরবান্বিত।

১৯২১ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আই. এফ. এ.র সঙ্গে যুক্ত হয়ে দ্বিতীয় ডিভিসন লীগে খেলবার অনুমতি পায়। অবশ্য এর একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে গিয়েছিল, তারজন্যই ইহা সম্ভব হয়েছিল, নতুবা আই. এফ. এ.র মধ্যে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট টিম ছিল। যারা লীগ খেলতে পেতো। আই. এফ, এ,র দ্বিতীয় ডিভিসনে তাজহাট নামক টিম খেলতো, তারা ১৯২০ সালে আই, এফ, এ,র সংশ্রব পরিত্যাগ করে অর্থাৎ তাজহাট টিম আই, এফ, এ, হ'তে নাম প্রত্যাহার করে। এদিকে ইস্টবেঙ্গলের কর্ম্মকর্ত্তারা সেই সুযোগে তাহাদের টিমের নাম আই, এফ, এ,র সঙ্গে যুক্ত করে নেয়। এই সুযোগ গ্রহণ করার ব্যাপারে রায় বাহাদুর তড়িৎ বাবুর কূটকৌশল বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। একমাত্র তাঁর কর্ম্মকৌশলেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আই, এফ, এ,র সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল। ইহা অবিসম্বাদী সত্য কথা।

১৯২১ সাল হতে ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ খেলতে আরম্ভ করে এবং খেলার শেষে লীগ কোঠায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে। উক্ত বৎসর ৭টি জুনিয়ার ট্রফিও জয়লাভ করে। সেই প্রথম বৎসর যে সকল খেলোয়াড় খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম যথাক্রমে—

গোলে—নগেন কালী ও মণি তালুকদার

ব্যাকে—ভোলাসেন, ভানুদত্ত রায়, প্রফুল্ল চ্যাটার্জি

হাফব্যাক—প্রফুল্ল মিত্র, ননী গোঁসাই, সুরেন ঠাকুর (চক্রবর্তী,) বিজয়হরি সেন, শৈলেশ বসু।

ফরোয়ার্ডে—দেবেন পাল, নসাসেন ( অধিনায়ক ), ধীরা মিত্র, প্রশান্ত বর্দ্ধন, নেপাল চক্রবর্তী জিতু মুখার্জি, এস, দাস, প্রভৃতি।

এই সকল খেলোয়াড়গণ প্রত্যেকেই খ্যাতিসম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় ছিলেন, কিন্তু সকলেই আগ্রহের সঙ্গে দ্বিতীয় বিভাগে

খেলেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই পূর্ববঙ্গীয় খেলোয়াড় ছিলেন এবং কলিকাতা ও ঢাকার বিখ্যাত টিমগুলিতে এঁরা সকলেই খেলেছেন। পরবর্তীকালেও এঁরা এই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত থেকেই খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। ননী গোঁসাই ও ধীরা মিত্র তাজহাট-টীমে খেলতেন। ননী গোঁসাই সেণ্টার হাফ-পজিসনে খেলতেন। আজ পর্যন্ত তাঁর মত উচ্চাঙ্গের খেলোয়াড় দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁর খেলা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জীবনে কখনও ভুলতে পারবেন না এমনি মনোমুগ্ধকর খেলা তিনি খেলে গেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর জুড়ী পাওয়া যায় নাই। ধীরা মিত্র তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরোয়ার্ড ছিলেন। নগেন কালী ও সুরেন ঠাকুর মোহনবাগানে খেলতেন, তাঁরাও বিশিষ্ট খেলোয়াড় ছিলেন। প্রথম অধিনায়ক নসা সেন ও প্রশান্ত বর্দ্ধন ঢাকা ওয়াড়ী টীমের বিশিষ্ট ফরোয়ার্ড ছিলেন। তাঁদের খেলাও ভোলবার মত নয়। ভোলা সেন, ভানুদত্ত রায়, প্রফুল্ল চাটার্জী ব্যাক পর্যায়ে খেলতেন, তাঁরাও অতি উচ্চাঙ্গের খেলোয়াড় ছিলেন। জিতু মুখার্জী ঢাকা ওয়াড়ী টীমে লেফট আউট পজিসনে খেলেছেন এবং ভাল খেলোয়াড় বলে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল, কিন্তু তিনি তাঁর খেলার শেষ সময়ে এসে এই ক্লাবে যোগদান করেন। তবে খেলায় তিনি ততটা নাম না করতে পারলেও ক্লাবের উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপাত করে গেছেন একথাও পূর্বেই বলেছি। মণি তালুকদার প্রথমে জুনিয়ার গোল-কীপার হিসাবে এই টীমে যোগদান করেন বটে কিন্তু পরবর্তীকালে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শৈলেশ বসু খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন খুবই কম, তবে ক্রিকেট খেলায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং তাঁর জন্যই এই ক্লাবের উৎপত্তি, একথা পূর্বেই বলেছি। উক্ত খেলোয়াড়গণের অধিকাংশই পরলোক গমন করেছেন, মাত্র কয়েকজন এখনও জীবিত আছেন বটে কিন্তু এঁরা ক্লাবকে সকলেই প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন। সেই সকল আদর্শ খেলোয়াড় বর্তমানকালে দুর্লভ, একথা খাঁটি সত্য। ইস্ট বেঙ্গল

ফুটবল টীমের প্রথম অধিনায়ক নসা সেন ( ডাঃ রমেশ চন্দ্র সেন ) ঢাকা বিক্রমপুর আউটসাহী গ্রাম নিবাসী ছিলেন, এক্ষণে তিনি লণ্ডন প্রবাসী।

১৯২২ সালে ইস্টবেঙ্গল টীম দ্বিতীয় ডিভিসন লীগে ২য় স্থান অধিকার করে। প্রথম স্থান অধিকার করেছিল আর. জি. এ. (R. G. A.) রেজিমেণ্টাল গোরা টীম। তাদের অবস্থান ছিল ফোর্ট উইলিয়মে। উক্ত আর জি. এ. টীম প্রথম ডিভিসনে খেলবার উপযুক্ত টীম ছিল কিন্তু সেই বৎসর রয়েল ওয়েষ্ট কেণ্ট নামক রেজিমেটাল টীম প্রথম বিভাগে খেলতে থাকায় বাধ্য হয়ে আর. জি. এ. টীম দ্বিতীয় বিভাগে খেলে। দ্বিতীয় বিভাগে তাদের সমকক্ষ টীম কোনটাই ছিল না, কেবল ইস্টবেঙ্গল টীম লীগের শেষ খেলায় তাদের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র গেম করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু প্রথম খেলায় ৫ গোলে তাদের নিকট হেরেছিল। আর. জি. এ. টীম দ্বিতীয় বিভাগে ১টি মাত্র গেম ড্র করা ভিন্ন বাকী সমস্ত গেমই জয়লাভ করে এবং সবশুদ্ধ ৮২টী গোল করে রেকর্ড সৃষ্টি করে। সেই রেকর্ড আজও পর্যন্ত কেউই ভাঙতে পারে নাই।

তারপর আই.এফ.এ. শীল্ডে উক্ত আর. জি. এ. টীমের সঙ্গে প্রথম রাউণ্ডে ইস্টবেঙ্গল টীমের খেলা পড়ে। খেলার মাঠের ক্রীড়ামোদী দর্শকদের মধ্যে তখন একটা আলোচনা চলে, যে দুর্দ্ধর্ষ আর. জি. এ. টীম—যাদের আই. এফ এ. শীল্ড জয় করার সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল টীম হয়ত অনেক গোলের ব্যবধানে পরাজয় বরণ করবে, কিন্তু কার্যকালে হয়ে গেল তার ঠিক বিপরীত। সেই কথাটাই বলি—শীল্ডের খেলায় যেদিন উক্ত দুই টীমের খেলা পড়লো, সেই দিনটি ছিল খুবই পরিষ্কার। অর্থাৎ যদিও বর্ষাকাল তথাপি সেই দিন ছিল আকাশ পরিষ্কার, খট্‌খটে রদ্দুর এবং মাঠটিও ছিল খট্‌খটে শুকনো। ইস্টবেঙ্গল টীম নূতন জার্সী গায়ে দিয়ে খেলতে নামলো এদিকে আর, জি, এ, টীমও বেশ দাপটের সঙ্গেই মাঠে অবতীর্ণ হলো।

বিখ্যাত ক্যালকাটা মাঠে উক্ত খেলাটী অনুষ্ঠিত হয়। W. Bennet নামক এক ধুরন্ধর রেফারী খেলাটী পরিচালনা করেন। সেদিন ঐ একটীমাত্র খেলাই শীল্ডের তালিকায় ছিল, সুতরাং দর্শকসংখ্যাও যথেষ্টই হয়েছিল বলা চলে। দর্শকদের আগ্রহ ও ধারণা ছিল যে দ্বিতীয় ডিভিসনের দুইটী সেরা টীমের খেলা হচ্ছে—রেকর্ড সৃষ্টিকারী আর.জি.এ. টীম খেলছে সুতরাং খেলাটি খুব উপভোগ্য ও আকর্ষনীয় খেলা হবে। অবশ্য দর্শকদের ধারণা যে বিফল হয়নি তা' বলাই বাহুল্য। খেলা ত আরম্ভ হলো, কিন্তু দেখা গেল আর. জি. এ. টীমের পরিবর্তে ইস্টবেঙ্গল টীমই দাপটের সঙ্গে খেলছে এবং আর. জি. এ. টীম কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। ২০ মিনিট খেলা চলবার পর আর. জি. এ. পেনালটী করে বসলো ইস্ট বেঙ্গল টীমের লেফ্‌ট ইন প্রশান্ত বর্ধন সট নিলেন, বলটী গোলকীপার থাবা দিয়ে প্রতিহত করলেন কিন্তু হাত ফস্‌কে কিছু দূরে গিয়ে পড়লো এবং বর্ধন লাফ মেরে এগিয়ে গিয়ে বলটী আয়ত্তে নিয়ে এসে পুনরায় কিক্‌ করে গোল করলেন। দর্শকদের মধ্যে তখনও ইস্ট বেঙ্গলের জয়লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল, সকলের ধারণা যে শেষ পযন্ত হয়ত খেলার মোড় ঘুরে যাবে, আর. জি. এ. টীমই জিতবে। কিন্তু সকলের ধারণা উল্টে গেল; আর. জি.এ.টীম দ্বিতীয়ার্ধে আরও নেতিয়ে পড়লো, আর পরপর আরওদুইটী গোল তারা ভক্ষণ করলো। শেষ মুহূর্তে ইষ্ট বেঙ্গল টীমের শৈথিল্যের অবকাশে আর.জি. এ.র সেণ্টার ফরোয়ার্ড একটী গোল শোধ করেন। ৩—১ গোলে খেলাটীর পরিসমাপ্তি ঘটে। দর্শকগণ খেলা দেখে তাজ্জব বনে যায়। পরদিন স্টেট্‌সম্যান, ইংলিশম্যান, ডেলী নিউজ প্রভৃতি পত্রিকায় ইষ্ট বেঙ্গল টীমের ভূয়সী প্রশংসা বেরোয়। সেইদিন যাঁরা টীমে খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে দুজন নবাগত খেলোয়াড় ছিলেন। একজন পরবর্তীকালের বিখ্যাত সেণ্টার ফরোয়ার্ড মোনা দত্ত, অপরজন শিলচরনিবাসী আশু দত্ত। আশু দত্ত রাইট ইনসাইডে খেলতেন এবং উক্ত খেলার শেষার্ধে পরপর ২টী গোল একাকী তিনিই

করেন। এই দুজন খেলোয়াড় লীগ খেলায় অংশ গ্রহণ করেন নাই। উক্ত খেলার দিনই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। উক্ত খেলায় যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের নাম, যথাক্রমে—নগেন কালী, ভোলা সেন, ভানু দত্ত রায়; প্রফুল্ল মিত্র, ননী গোঁসাই, সুরেন ঠাকুর; নসা সেন, আশু দত্ত, মোনা দত্ত, প্রশান্ত বর্ধন, নেপাল চক্রবর্তী। ইস্ট বেঙ্গল টীমের পক্ষে ইহা একটী স্মরণীয় খেলা। পরবর্তী শীল্ডের খেলায় কর্দমাক্ত মাঠে আর বেশী অগ্রসর হতে পারেন নি। লীগ খেলায় আরও কয়েক জন খেলোয়াড অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নাম যথাক্রমে গোলে—মণি তালুকদার; ব্যাকে-প্রফুল্ল চাটার্জি; হাফে—বিজয়হরি সেন, ফরোয়ার্ড—দেবু পাল, কালু ঘোষ, যোগেশ তালুকদার প্রভৃতি।

১৯২৩ সালে টীমের বিশেষ কোনরূপ কৃতিত্ব দেখা যায়নি—সে বছর টীম কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল যেহেতু প্রথম অধিনায়ক নসা সেন সেই বৎসর জার্মানী চলে যান। আশু দত্তও মোহনবাগান ক্লাবে যোগদান করেন। নূতন খেলোয়াড় মোনা মল্লিক সেই বৎসর থেকে ক্লাবে যোগদান্ করেন। লীগে মোটেই সুবিধা করতে পারে নাই। আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলায় বিখ্যাত ক্যালকাটা টীমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। খেলাটী সেদিন খারাপ হয় নাই। দুর্দ্ধর্ষ ক্যালকাটা টীম মাত্র ১ গোলে জয়ী হয়, অথচ এই ক্যালকাটাই ফাইনালে ৩—০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে শীল্ড পায়। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ ১৯২৩ সালে টীমে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মণি তালুকদার, প্রফুল্ল চাটার্জী, ভোলা সেন, ভানু দত্ত রায়, ননী গোঁসাই, বিজয়হরি সেন, মোনা মল্লিক, কালু ঘোষ, মোনা দত্ত, প্রশান্ত বর্ধন, নেপাল চক্রবর্তী, চিত্ত বসু প্রভৃতি।

১৯২৪ সালে টীম ২য় ডিভিসন লীগে ক্যামেরনস্ 'বি' রেজিমেন্টাল টীমের সঙ্গে যুক্তভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে অর্থাৎ ক্যামেরনস্ 'বি' টীম ও ইষ্টবেঙ্গল টীম উভয়ে সর্বসমেত ৩৭ পয়েন্ট পায়। মাত্র ৫টি গোল বেশী দেওয়ায় ক্যামেরনস্ 'বি'-র নাম প্রথমে রাখা

হয়। ক্যামেরনস্ 'বি' টীম সর্বসমেত ৩৭টি গোল দেয়, আর ইষ্টবেঙ্গল দেয় ৩২টি গোল সেই জন্য লীগ টেবলে ক্যামেরনস্ 'বি' প্রথম ও ইষ্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় স্থানে নাম থাকে, কিন্তু উভয়ের পয়েন্ট ছিল সমান। সুতরাং যুক্তভাবে প্রথম স্থান বলা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? ষ্টেটস্‌ম্যান প্রদত্ত ফাইনাল টেবল দেওয়া হলো।

---

## ২য় ডিভিসন লীগ—১৯২৪

### ফাইনাল টেবল

( ১৯২৪ সালের ২রা জুলাই তারিখের ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার ৪র্থ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্যামাবনস্ "বি" | ২৪ | ১৫ | ৭ | ২ | ৩৭ | ৬ | ৩৭ |
| ইষ্টবেঙ্গল | ২৪ | ১৬ | ৫ | ৩ | ৩২ | ১১ | ৩৭ |
| ই, বি, বেল | ২৪ | ১৩ | ৬ | ৫ | ৩৪ | ১৭ | ৩২ |
| পুলিশ এ. সি, | ২৪ | ১২ | ৭ | ৫ | ৩৬ | ১৭ | ৩১ |
| ভবানীপুর স্পোর্টিং | ২৪ | ৯ | ১০ | ৫ | ২০ | ১১ | ২৮ |
| টাউন ক্লাব | ২৪ | ৬ | ১১ | ৭ | ১৮ | ১৭ | ২৩ |
| স্পোর্টিং ইউনিয়ন | ২৪ | ৮ | ৬ | ১০ | ১৪ | ২১ | ২২ |
| সেন্ট জেভিয়ারস্ | ২৪ | ৮ | ৬ | ১০ | ১৭ | ২৩ | ২২ |
| জোড়াবাগান | ২৪ | ৪ | ১২ | ৮ | ১৬ | ২৫ | ২০ |
| ভবানীপুর ইন্সি. | ২৪ | ৭ | ৫ | ১২ | ২১ | ৩১ | ১৯ |
| গ্রীয়ার | ২৪ | ৪ | ১০ | ১০ | ৯ | ১৮ | ১৮ |
| কুমারটুলি | ২৪ | ৬ | ৫ | ১৩ | ১৫ | ৩১ | ১৭ |
| টেলিগ্রাফ ইন্ষ্টি: | ২৪ | ১ | ৬ | ১৭ | ১১ | ৫২ | ৮ |

# ১৯২৪ সালের ইষ্টবেঙ্গল টীমের

## ২য় ডিভিসন লীগের সম্পূর্ণ খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম | খেলা | ৬ই মে | ইষ্টবেঙ্গল | ১ (সুধীর মিত্র) | ভবানীপুর স্পোর্টিং | ০ | ২ পঃ |
| ২য় | ,, | ৭ই মে | ,, | ১ (সুধীর মিত্র) | জোড়াবাগান | ১ বি, ঘোষ | ১ ,, |
| ৩য় | ,, | ১২ই মে | ,, | ১ (মনা দত্ত) | গ্রীয়ার স্পোর্টিং | ০ | ২ ,, |
| ৪র্থ | ,, | ১৪ই মে | ,, | ১ (মনা দত্ত) | সেণ্ট জেভিয়ারস্ | ০ | ২ ,, |
| ৫ম | ,, | ১৬ই | ,, | ০ — | পুলিশ এ, সি, | ২ ওহারা, কার্টার | |
| ৬ষ্ঠ | ,, | ১৯শে | ,, | ০ — | ক্যামারনস্ "বি" | ০ | ১ |
| ৭ম | ,, | ২১শে | ,, | ৩ হেমাঙ্গবসু ২ | স্পোর্টিং ইউনিয়ন | ০ | ২ |
| ৮ম | ,, | ২৩শে | ,, | ২ (মনা মল্লিক ২) | টাউন ক্লাব | ০ | ২ |
| ৯ম | ,, | ২৬শে | ,, | ৩ (মানা দত্ত ২<br>সুধীর মিত্র ১) | ই, বি, রেল | ০ | ২ |
| ১০ম | ,, | ২৮শে | ,, | ২ (মনা দত্ত ১<br>চিত্ত বসু ১) | টেলিগ্রাফ ইন্‌ষ্টঃ | ০ | ২ |
| ১১শ | ,, | ৩০শে | ,, | ০ – | কুমারটুলী | ১ এ, সিংহ) | |
| ১২শ | ,, | ২রা জুন | ,, | ২ (মনা দত্ত ২) | ভবানীপুর ইন্সিং | ১ (এইচ, রায়) | |
| ১৩শ | ,, | ৪ঠা | ,, | ১ (মনাদত্ত) | ভবানীপুর স্পোর্টিং | ২ (ভুপেন দাস) | |
| ১৪শ | ,, | ৬ই | ,, | ১ (মনা দত্ত) | জোড়াবাগান | ০ | ২ |
| ১৫শ | ,, | ১০ই | ,, | ১ (মনা দত্ত) | গ্রীয়ার | ০ | ২ |
| ১৬শ | ,, | ১৩ই | ,, | ১ (যোগেশ) | সেণ্ট জেভিয়ারস্ | ০ | ২ |
| ১৭শ | ,, | ১৬ই | ,, | ১ (মনা দত্ত) | পুলিশ | ১ (জনসন) | ১ |
| ১৮শ | ,, | ১৮ই | ,, | ১ (হেমাঙ্গ বসু) | ক্যামারনস্‌ বি | ০ | ২ |
| ১৯শ | ,, | ২০শে | ,, | ০ | স্পোর্টিং ইউনিয়ন | ০ | ১ |
| ২০শ | ,, | ২৩শে | ,, | (ওয়াকওভার) | টাউন ক্লাব | (অনুপস্থিত) | ২ |
| ২১শ | ,, | ২৫শে | ,, | ১ (মনা দত্ত) | ই, বি, রেল | ১ (উইলিয়ামসন) | ১ |
| ২২শ | ,, | ২৭শে | ,, | ৬ (হেমাঙ্গবসু ২<br>সুধীর মিত্র ২<br>চিত্ত বসু) | টেলিগ্রাফ | ০ | ২ |
| ২৩শ | ,, | ৩০শে | ,, | ২ (সুধীর মিত্র<br>ননী গোঁসাই) | কুমারটুলী | ১ (এ, রায়) | ২ |
| ২৪শ | ,, | ২রা জুলাই | ,, | ২ (সুধীর মিত্র<br>এস, সেন) | ভবানীপুর ইন্সিঃ | ১ (কে, বসু) | ২ |
| | | | | ৩২ | | ১১ | ৩৭ |

লীগ খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ক্লাব কর্তৃপক্ষের এই কথাই বারবার মনে আসতে লাগলো যে 'আমাদের টীম যখন প্রথমই হয়েছে (যদিও ব্র্যাকেটে) তখন এই টীম প্রথম বিভাগে উন্নীত হবে না কেন?' কিন্তু এর একটা মস্ত বাধা ছিল কারণ তখন আই এফ এর নিময় ছিল এই যে যে কোন ভারতীয় টীম যদি প্রথম বিভাগে নিম্ন স্থানাধিকারী হয়, আর কোন ভারতীয় টীম যদি ১য় বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারী হয় তবে প্রমোশন-রেলিগেশন বা উঠানামা হবে নতুবা হবে না। ঠিক উক্ত নিয়মে বাধা প্রাপ্ত হয়ে ১৯১৯ সালে কুমারটুলী টীম ২য় বিভাগে ১ম হয়েও প্রমশন পায় নি। কিন্তু এবারে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব তা' হতে দেবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। ক্যামেরনস 'বি' টীমের প্রমোশনের কোন প্রশ্নই নাই যেহেতু তাদের 'এ' টীম রীতিমত প্রথম বিভাগে খেলছে, সুতরাং তারা যতদিন কলকাতায় থাকবে তত-দিন ঐ পজিসনে থেকেই খেলে যাবে, কিন্তু ইষ্টবেঙ্গল টীম এ সুযোগ ছাড়বে কেন? এই প্রশ্ন সমাধানে ক্লাব কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে অনু প্রাণিত হয়। তখন তাঁরা এ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টাও করতে লাগলেন শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের চেষ্টা ফলবতী হয়।

অক্টোবর মাসের শেষদিকে সন্তোষের মাননীয় মহারাজার ভবনে সেইসূত্রে আই. এফ. এ.র এক সভাধিবেশন হয়। সেই সভায় পূর্বোক্ত নিয়ম রদবদল করা হয়। আই এফ. এর অধিকাংশ সদস্য উক্ত নিয়ম রদবদল করার পক্ষে ভোট দেন, তাতেই পূর্বনিয়ম পাল্টে নূতন নিয়ম প্রবর্তন হয়। দ্বিতীয় বিভাগে যে কোন টিম ফাষ্ট হবে, সেই টিম পরবর্তী বৎসরে প্রথম বিভাগে প্রমোশন পাবে, আর প্রথম বিভাগে যে টিম নিম্ন স্থানাধিকারী হবে সেই টিম পরবর্তী বৎসরে দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যাবে। অর্গলবদ্ধ দ্বার চিরদিনের জন্য খোলা হয়ে যায়। এবং এই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তৃপক্ষের চেষ্টাতেই ইহা সম্ভব হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন আই. এফ. এ.র সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় জাষ্টিস স্যার

ইউয়ার্ট গ্রীভস্ সাহেব, এবং আই. এফ. এ.র তৎকালীন সেক্রেটারী মিঃ. মেডলিকট (কাষ্টমস্) এই ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেন। ক্যালকাটা, ডালহোসী, রেঞ্জার্স প্রভৃতি ইউরোপীয়ান টিমের সদস্যগণ নূতন নিয়মের পক্ষে ভোট দেন, কেবলমাত্র মোহনবাগান ও এরিয়ান টিমের সদস্যগণ বিপক্ষে ভোট দেন। উক্ত ব্যাপারে রায় বাহাদুর তড়িৎ বাবুর বিশেষ চেষ্টা কার্যকরী ও ফলবতী হয়েছিল, ইহা খাঁটি সত্য কথা। তারপর যথারীতি ইষ্টবেঙ্গল টিম প্রথম বিভাগে খেলবার অনুমতি লাভ করে ও পরের বৎসর '২৫ সাল থেকে প্রথম বিভাগে উন্নীত হয়ে খেলতে আরম্ভ করে।

এই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাঠকবর্গের বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন বিধায় লিখতে বাধ্য হলাম। এই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের উপর আই. এফ. এ.র সদস্যগণের কোন দিনই সুনজর ছিল না। ইয়োরোপীয়ান টিমগুলির প্রাধান্য চলে যাওয়ার পর এই মনোভাব আরও প্রবল আকার ধারণ করেছে। এর প্রধান কারণ এই ক্লাবের নাম। এই "ইষ্টবেঙ্গল" নামটিই এক দল লোকের চক্ষুশূল, ইহা নিছক সত্য কথা। এই ক্লাবের যদি অন্য কোন নাম হতো তাহলে বোধ হয় এতটা চক্ষুশূলের কারণ ঘটতো না। জনসাধারণের একাংশও যে এই মনোভাব পোষণ করে তাতে কোন সন্দেহ নেই, অনেকেই তা' বুঝতে পারেন।

এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাগণ এই নামকরণের উপরই জোর দিয়েছিলেন। অনেক চিন্তা করেই তাঁরা নাম দিয়েছিলেন "ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব"। কেন যে এই নাম দিয়েছিলেন সে কথা এখন আর ভেঙ্গে বলার কোন প্রয়োজন দেখিনে, যাঁদের অন্তর্দৃষ্টি আছে, তাঁরা তা' অনায়াসেই দেখতে ও বুঝতে পারেন। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছুই লেখা চলে, কিন্তু অনেক না লিখলেও কিছু লিখতে হলো শুধু পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে। কারণ এসব গোপন কথা অনেকেরই জানা নেই, সুতরাং জানবার আগ্রহ ও কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

পূর্বলিখিত প্রমোশন সম্বন্ধে যা' লেখা হয়েছে, তা' অন্য কোথাও দেখতে বা শুনতে পাবেন না। কারণ এই সম্বন্ধে নানারকম. অসত্য ও বিকৃত প্রচার হয়েছে, সেইজন্য প্রকৃত কথা অনেকেই জানেন না।

আই. এফ. এ.র অফিসে পুরাতন লীগ টেবল ·দেওয়া একখানি রেকর্ড বুক আছে। উক্ত ক্ষুদ্রাকৃতি পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন বিখ্যাত পাবলিশার্স এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং.লিঃ। সেই পুস্তকে ১৯২৪ সালের ২য় ডিভিসন লীগ খেলার ফাইনাল টেবলটি দেওয়া আছে। তাতে দেখা যায় যে প্রথম পুলিশ এ. সি. দ্বিতীয় ক্যামেরনস 'বি' এবং তৃতীয় ইষ্টবেঙ্গল। অন্যান্য ফিগার সবই ঠিক আছে। কেবল নামের বেলায় এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়ে আছে। এই পরিবর্তন কিসে হলো তা' বুঝতে পারা গেল না। আই. এফ. এ র প্রধান কর্মকর্তা এম, দত্ত রায় ওরফে বেচু বাবুকে জিজ্ঞাসা করেও তাব সত্নত্তর পাওয়া গেল না, তিনি বললেন, "আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানিনা"। এস. কে. লাহিড়ী কোং-র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অজিত লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেও সত্য উত্তর পাওয়া যায় নাই। তিনি বললেন, 'ছাপাখানায় এরকম ভুল হওয়া বিচিত্র নয়।' অথচ এই ভুল তাঁরা পরিবর্তনও কবলেন না। এই ভুল রেকর্ড বজায় রেখেই পরবর্তীকালে নানা পত্র পত্রিকায় ও আই. এফ. এ-র জুবিলী সুভেনীরে ইহা প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এটা যে একটা মারাত্মক ভুল এ সম্বন্ধে কারোর নজর নেই, কোন উচ্চবাচ্যও নেই।

১৯২৪ সালের পুরাতন দৈনিক পত্রিকাগুলি, যথা···ষ্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশম্যান, ডেলী নিউজ, অমৃতবাজার পত্রিকা প্রভৃতি এখনও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এইসব পত্রিকা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে (বর্তমান ন্যাশনেল লাইব্রেরী) মজুত আছে। সেখানে গিয়ে যদি কেউ উক্ত পত্রিকাগুলি দেখে আসেন তবে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে কোন অসুবিধা হবে না। ১৯২৪ সালের জুলাই মাসের পত্রিকাগুলিতে নির্ভুল লীগ টেবল দেওয়া আছে। তাতে কোন্ টিমের কি পজিসন সবই বিস্তারিত

ছাপা আছে, সুতরাং সেইগুলির উপর নজর দিলেই প্রকৃত তথ্য নির্ধারণে সকলেই সমর্থ হবেন।

ছাপাখানায় ভুল ছাপা অনেক সময়েই হয়ে থাকে একথা সবাই জানে, ইহা অস্বীকার্য্য নয়, কিন্তু এরকম সাজানো গোছানো ভুল বড় একটা দেখা যায় না। এ থেকে কি আমরা একথা মনে করতে পারি না বা ধরে নিতে পারি না যে উক্ত রেকর্ড বুকখানিতে ইচ্ছাকৃত ভুল ছাপা হয়েছে? অবশ্য এই ইচ্ছাটা কেন হলো সেইটিই প্রশ্নের বিষয়। এর সোজা উত্তর এই যে প্রচারকদের উদ্দেশ্য এই ক্লাব সম্বন্ধে অপপ্রচার করা। যথা—ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব কৃতিত্ব দেখিয়ে প্রমোশন পায় নাই, নিছক আই. এফ. এ-র দয়ার উপর নির্ভর করেই প্রথম বিভাগে প্রমোশন পেয়েছিল। এইরকম অপপ্রচার নানাভাবে এই ক্লাবের সম্বন্ধে এ যাবৎকাল হয়ে এসেছে। বিখ্যাত. অখ্যাত নানারকম পত্র-পত্রিকাগুলিও এই ক্লাবের কোন খুৎ বার করে (তা' সত্য হউক আর মিথ্যাই হউক) প্রচার করতে পিছপা হয় নাই। বরং প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে তা সম্পাদন করেছে এবং এখনও করে থাকে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে এর নাম। ক্লাবের উক্ত নামের জন্যই বিরুদ্ধবাদীরা এরকম খাপ্পা, তারা চায় যে ঐ নামীয় ক্লাব উৎখাত হয়ে যাক—এর যেন কোন চিহ্নও না থাক।

পরবর্তীকালে প্রচারকেরা উক্ত প্রমোশন সম্বন্ধে একটি অলীক সংবাদ রচনা করেছে। যথা ১৯২৪ সালে ২য় ডিভিসন লীগে পুলিশ এ. সি. দল প্রথম হয়েছিল, কিন্তু প্রথম বিভাগে প্রমোশন নিতে রাজী হয় নি, সেইজন্য তৃতীয় স্থানাধিকারী ইষ্টবেঙ্গল দল প্রমোশন পেয়ে যায়। এই যে অলীক সংবাদ রচনা হলো তার সত্যাসত্য নির্ণয়ে কেউ কি কোনদিন চিন্তা করেছে? কি ভাবে কত পরিশ্রম, কত মাথা ঘামিয়ে তবে পূর্বের কঠিন নিয়মের রদবদল করে এই প্রমোশন-রেলিগেশনের নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছিল, তার খবর কয়জন রাখে? অবশ্য অলীক রচনার একটা কারণ ঘটেছিল ১৯২৬ সালে। সেই

বৎসর পুলিশ এ. সি. দল ২য় বিভাগে প্রথম হয়েও প্রমোশন নেয় নি, ২য় স্থানাধিকারী ই. বি. রেল দল প্রমোশন পায়। তার জন্য কোন নিয়ম প্রবর্তন করতে হয় নি, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ীই তা' হয়েছিল। প্রচারকরা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়েই বাহাদুরী নিয়ে নিল।

এই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে দেশের গণ্যমান্য ও অতি বিখ্যাত, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ছিলেন বা আছেন, কিন্তু এই ক্লাবের সম্পর্কে এইসব অপপ্রচার নিবারণার্থে কেহই কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। এসব বিষয় আলোচনা হলে কেহ কেহ বলেন, "হাতী চলে বাজার মে কুত্তা ভুকে হাজার।" সুতরাং এ সকল বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই, কিন্তু অপপ্রচার যে কিছুটা ক্ষতিরও কারণ হয়, তাঁরা সে বিষয় বুঝতে নারাজ।

কয়েকজন বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষকের নাম দিলাম।

স্বর্গতঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, স্বর্গতঃ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, স্বাধীন ত্রিপুরার ভূতপূর্ব মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, নেপালের প্রিন্স, দ্বারভাঙ্গার ভূতপূর্ব জমীদার মহারাজা বাহাদুর, ময়মনসিং গৌরীপুরের ভূতপূর্ব জমীদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মুড়াপাড়ার ভূতপূর্ব জমীদার কেশবচন্দ্র ব্যানার্জি, মুক্তাগাছার কিরণ-চন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী, ঢাকার নবাব বাহাদুর, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার জে. সি. গুপ্ত, মাননীয় এ. কে. ফজলুল হক, আর. পি. সাহা, খান বাহাদুর আরশেদ আলী, জনাব ওয়াজীর আলী, আই. সি. এস, কুমার বিশ্বনাথ রায়, বিখ্যাত চিত্রপরিচালক কুমার প্রথমেশ বড়ুয়া, বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ কুমার শচীন দেববর্মণ, রায় বাহাদুর গুণেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, আর. গুপ্ত (বর্তমান মুখ্য সচিব,) ডাঃ ধীরেন সেন, শান্তিভূষণ দত্ত—বার. এট. ল, দেবেন্দ্র নাথ চৌধুরী (বঙ্গশ্রী মিল), বি. কে. বিড়লা, গোপীনাথ দাস, বিপিন সাধু খাঁ, যোগীন্দ্রনাথ সাহা, নির্মলচাঁদ বড়াল, রাইমোহন ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার প্রভৃতি। দেশের আরও বহু অতীত ও বর্তমানের বিশিষ্ট গণ্যমান্য রাজনীতিবিদ, দেশ-

নেতা, সমাজ-নেতা, উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রকর্মচারী ও বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি অথচ ক্রীড়ামোদী এই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা আছেন।

প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি রূপে এই ক্লাবে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, যথা—প্রথম সভাপতি, অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায়, অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর কলেজ, দ্বিতীয় সভাপতি, সতীশরঞ্জন দাশ (বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এস. আর. দাস, কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারেল ও ল, মেম্বার ভাইসরয় কাউন্সিল); তৃতীয় সভাপতি—সন্তোষের মহারাজা মাননীয় মন্মথনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর; ৪র্থ সভাপতি মাননীয় নলিনীরঞ্জন সরকার—এঁদের ব্যক্তিত্ব সর্ব্বজন বিদিত, ক্ষুদ্র লেখনীমুখে আর কতটুকু জানাবো।

১৯২৪-সালে ২য় ডিভিসন লীগ খেলায় যে সকল খেলোয়াড় নিয়ে টীম গড়া হয়েছিল, তাঁদের নাম ; যথাক্রমে—

গোলে--মণি তালুকদার ; ব্যাকে—প্রফুল্ল চ্যাটার্জী, ভানুদত্ত রায়, ভোলা সেন; হাফে—প্রফুল্ল মিত্র, ননী গোঁসাই. বিজয়হরি সেন, ডি, রায়, জে, সেন; ফরোয়ার্ডে—মোনা মল্লিক. সুধীর মিত্র, মোনা দত্ত, হেমাঙ্গ বসু (অধিনায়ক) নেপাল চক্রবর্ত্তী, চিত্ত বসু, যোগেশ তালুকদার, এস্, সেন।

উক্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে দুজন খেলোয়াড় ছিলেন নবাগত। একজন লেফ্‌ট ইন হেমাঙ্গ বসু অপর জন রাইট ইন সুধীর মিত্র। হেমাঙ্গ বসু মোহনবাগানে খেলতেন, তিনি অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েই ক্লাবে যোগদান করেন। তাঁর অধিনায়কতা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল যেহেতু ক্লাবের প্রমোশন ও কোচবিহার কাপ জয় ঐ বৎসরেই প্রথম হয়।

কোচবিহার কাপের ফাইনালে মোহনবাগান টিমকে ১ গোলে হারিয়ে কাপ জয় করেন। জয়ের নিদর্শন একমাত্র গোলটিও অধিনায়ক হেমাঙ্গ বসুই করেন।

ফাইনালে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের নাম দিলাম, যথাক্রমে :—

ইষ্টবেঙ্গল—মনি তালুকদার, প্রফুল্ল চ্যাটার্জি, বিজয়হরি সেন, এস. নাগ. ননী গোঁসাই, বি. গুহ, মোনা মল্লিক, সুধীর মিত্র, মোনা দত্ত, হেমাঙ্গ বসু, নেপাল চক্রবর্তী।

মোহনবাগান—অম্বু ভট্টাচার্য্য, গোষ্ঠ পাল, পান্না পরামাণিক, মতি সেন, বলাই চ্যাটার্জি, মনি দাস, সুধাংশু বসু, এন. দাস, রহমান, এস. গুপ্ত ও পল্টু দাস-গুপ্ত।

১৯২৫ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীম আই. এফ. এ. লীগের প্রথম বিভাগে উন্নীত হয়ে খেলতে আরম্ভ করে। লীগ খেলার শেষে তাঁরা ৩য় স্থান অধিকার করে। সেই বৎসর কয়েকজন খ্যাতনামা উচ্চাঙ্গের খেলোয়াড় অন্যান্য টীম থেকে এসে এই ক্লাবে যোগদান করেন। তন্মধ্যে মোহনবাগান টীম থেকে লেফট্ হাফ ব্যাক মণি দাস, এরিয়ান টীম থেকে গোলকীপার পুর্ণ দাশ, রাইট ইন সূর্য্য চক্রবর্তি, রাইট হাফ ব্যাক হারান সাহা, ভবানীপুর টীম থেকে যতীন সরকার, ঢাকা থেকে ফুল ব্যাক দীনেশ গুহ। এঁরা প্রত্যেকেই চৌকস খোলোয়াড় ছিলেন। এঁদের সমন্বয়ে উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের টীম গঠন হয়।

টীম, যথা—গোল—পূর্ণদাস, মণি তালুকদার। ব্যাক—দীনেশ গুহ, ভানুদত্ত রায়, প্রফুল্ল চাটার্জি। হাফ—হারান সাহা, ননী গোঁসাই, মণি দাস, বিজয়হরি সেন। ফরোয়ার্ড—মোনা মল্লিক, সূর্য্য চক্রবর্তী, মোনা দত্ত ( অধিনায়ক ) হেমাঙ্গ বসু, নেপাল চক্রবর্তী, প্রশান্ত বর্ধন, যতীন সরকার প্রভৃতি।

সেই বৎসর আন্তর্জাতিক ( ইউরোপীয়ান বনাম ইণ্ডিয়ান ) খেলার বাছই ইণ্ডিয়ান টীমে ইষ্টবেঙ্গলের ছয়জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হন এবং খুব যশের সহিত খেলেন। সেই খেলোয়াড়গণ, যথাক্রমে—পূর্ণ দাশ, দীনেশ গুহ, ননী গোঁসাই, মোনা মল্লিক, সূর্য্য চক্রবর্তী, মোনা দত্ত। উক্ত আন্তর্জাতিক খেলায় ইণ্ডিয়ান বা ভারতীয় দল ২ গোলে জয়লাভও করে। গোলদাতা সূর্য্য চক্রবর্তী ও কুমার।

সে বৎসর ইষ্টবেঙ্গল টীম শুক্নো মাঠে খুব ভালই খেলেছিলো, কিন্তু বর্ষাগমে মাঠ কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হওয়ার পর তারা খালি পায়ে বুটধারী সাহেব টীমের সঙ্গে কুলিয়ে উঠ্‌তে পারলো না। তখন যদি এঁরা বুট পায়ে খেলার অভ্যাস করতেন তা হলে বোধ হয় চাম্পিয়ানশিপ এঁরাই লাভ করতে পারতেন। আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলাতেও কর্দমাক্ত মাঠে এঁরা বেশী দূর এগুতে পারেনি তৃতীয় রাউণ্ডে হেভী ব্যাটারী রেজীমেণ্ট টীমের সঙ্গে দুই দিন ড্র করার পর তৃতীয় দিনে ২-১ গোলে পরাজয় করণ করেন।

১৯২৬ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমের কিছুটা অবনতি হয়, যেহেতু সেই বৎসর দলের অধিনায়ক ও বিখ্যাত সেণ্টার ফরোয়ার্ড মোনা দত্ত মোহনবাগান ক্লাবে চলে যায়। নূতন খেলোয়াড় তেমন আমদানী হয় নাই, পুরোনো টীম নিয়েই খেলা চালাতে হয়। লীগ খেলার শেষে দেখা যায় যে তারা ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। আই. এফ. এ. শীল্ডেও দ্বিতীয় রাউণ্ড পর্যন্ত গতি। সেই বৎসর কলকাতার মাঠে উল্লেখযোগ্য খেলা অবশ্য হয়েছিল কারণ লীগে নর্থষ্টাফোর্ড রেজিমেণ্ট টীম খুব সুনামের সঙ্গেই লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ পেয়েছিল। তাদের বিখ্যাত সেণ্টার ফরোয়ার্ড ষ্টিল ( steell ) ২১টী গোল ক'রে শ্রেষ্ঠ গোলদাতার সম্মান অর্জন করেন। আই. এফ. এ. শীল্ডে সেরউড ফরেষ্টার্স নামক রেজিমেণ্টাল টীম খুবই কৃতিত্ব দেখিয়ে শীল্ড জয় করে। ফাইনালে ক্যামেরণ হাইলেণ্ডার্স টীমকে ২—০ গোলে পরাজিত করে।

সেই বৎসর ( ১৯২৬ ) সিমলায় ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতায় ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান টীমকে আমন্ত্রণ করে। উভয় টীমই যথা সম্ভব প্রস্তুত হয়ে খেলায় যোগদান করে। ইষ্টবেঙ্গল টিম কুমারটুলীর বিখ্যাত ব্যাক তুলসী দত্ত ও ভবানীপুর ক্লাবের খ্যাতিমান লেফট আউট ভূপেন দাসকে দলভুক্ত ক'রে যথাসম্ভব শক্তিশালী টিম গঠন করেই খেলতে যায়। মোহনবাগান টিমও খুবই শক্তিশালী হয়।

তারা বিখ্যাত খেলোয়াড় সামাদ ও টেলিগ্রাফের পি, দত্তকে দলভুক্ত করেন। কিন্তু উভয় দলই কাপ বিজয়ী ডারহাম টিমের নিকট ৩ এবং ৪ গোল খেয়ে ফিরে আসে। মোহনবাগান ২ য় রাউণ্ডে ১ম খেলায় ডারহামের সঙ্গে খেলে ৩—০ গোলে পরাজিত হয়। ইষ্টবেঙ্গল ৩য় রাউণ্ডে ৩য় খেলায় উক্ত ডারহামের সঙ্গেই ৪—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করেতে বাধ্য হয়। ১ম ও ২য় রাউণ্ডে ২টি গোরা টীমকে পরাজিত করায় অনেকেই আশা করেছিল যে ইষ্টবেঙ্গল টীম আরও কিছু অগ্রসর হবে কিন্তু ডারহাম টিমের শক্তির কাছে এদের অবনত হতে হয়। অবশ্য উক্ত খেলা সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে সেইদিন পরাজয়ের প্রধান কারণ গোলকীপার পূর্ণদাস। উক্ত পূর্ণ দাসের দোষেই এতগুলি গোলও হয়েছিল। অথচ পূর্ণদাস তখন ভারতীয় গোলকী পারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পূর্ণদাসের যেমন গুণ ছিল তেমনি দোষও কম ছিল না। তিনি অনেক সময় পানমত্ত অবস্থায় খেলতে নামতেন, এই অভ্যাসের জন্য তিনি অনেক খেলা পণ্ড করেছেন। উক্ত খেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। রক্ষণভাগের খেলা বেশ ভালই হয়েছিল। তুজন ব্যাক ও সেণ্টারহাফ ননী গোঁসাই অতি উচ্চাঙ্গের খেলা দেখিয়েছিলেন। ননী গোঁসাইয়ের খেলা দেখে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড রেডিং বলেছিলেন যে ভারতীয় খেলোয়াড় যে এ রকম খেলা খেলতে পারে চোখে না দেখলে এ কথা বিশ্বাস করতে পারতাম না। ফরোয়ার্ডের মধ্যে তুজন প্রান্তিক খেলোয়াড় ও সূর্য চক্রবর্তী প্রাণপণ চেষ্টায় আক্রমণ রচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু ডারহামের তুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড়দের কাছে তাঁরা সুবিধা করতে পারেন নি। উক্ত ডারহাম টিম ফাইনালে আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী সেরওড ফরেষ্টর্স টিমকে ১—০ গোলে পরাজিত করে কাপ জয়ী হন। সেই বৎসর রোভার্স-কাপও ডারহাম টীমই জয়ী করেছিল। তখন সারা ভারতে ডারহাম টীমই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ টীম। সেই বৎসর (১৯২৬) ডুরাণ্ড কাপের ফাইনাল খেলাটী যেরূপ উৎকৃষ্ট ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল সেরকম খেলা এর পূর্বে

বা পরে কোন দিনই আর হয় নি এ কথা সর্বজন স্বীকৃত। ডারহাম টীমের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ই ছিলেন শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের,তন্মধ্যে তাদের রাইট ইন রবিনসন ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর মত খেলোয়াড় খুব কমই দেখা গেছে। পরবর্তীকালে বর্মা ও ইষ্টবেঙ্গলের প্রাক্তন খেলোয়াড় পাগস্লী কতকটা ঐ ধরনের খেলা খেলে গেছেন। তিনিও এককালে একজন সেরা খেলোয়াড় ছিলেন।

১৯২৭ সালে টীমের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি—নূতন খেলোয়াড় হিসাবে কয়েকজন যোগদান করেছিলেন বটে, তবে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলতে পরবর্তী কালের খ্যাতনামা রাইট আউট দুলাল গুহ ঠাকুরতার নাম করা যায়। অবশ্য তখনও তিনি বিখ্যাত হন নাই। জুনিয়ার খেলোয়াড়রূপেই গণ্য ছিলেন। উক্ত বৎসর লীগে টীম পুনরায় ষষ্ঠ স্থানই লাভ করে। শীল্ডেও পূর্ববৎ। অন্য কোন খেলাতেই বিশেষ কোন ফলাফল হয় নাই! পরবর্তী বৎসর ১৯২৮ সালে ক্লাবে দারুণ বিপর্যয় দেখা দেয়। সে বৎসর ক্লাবের খ্যাতনামা গোলকীপার পূর্ণ দাস, রাইট হাফ হাবান সাহা, প্রসিদ্ধ রাইট ইন সূর্য চক্রবর্তী ই. আই. রেল কোম্পানীতে চাকরী পেয়ে ক্লাব পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। রেল কোম্পানী এঁদের খেলার জন্যই চাকরী দেন, সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁদের ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হতে হয়। পরিবর্তনের মধ্যে সেণ্টার ফরোয়ার্ড মোনা দত্ত মোহনবাগান ক্লাব ছেড়ে পুনরায় এসে যোগদান করেন। আরও কয়েকজন জুনিয়ার খেলোয়াড়ও এসে দলের পুষ্টিসাধন করেন। ব্যাক পজিসনে একজন খ্যাতিমান খেলোয়াড় রাজেন ঘোষ ঢাকা থেকে এসে ক্লাবে যোগ দেন। একজন নূতন হাফ ব্যাক খেলোয়াড়ও ঢাকা থেকে এসে ক্লাবে যোগদান করেন, তিনি মন্দ খেলতেন না, তাঁর নাম ছিল হবিবুল্লা। বর্তমানে উক্ত সাইড হাফ ব্যাক খেলোয়াড় পূর্ব পাকিস্থান গভর্ণমেন্টের একটি বিভাগীয় মন্ত্রী জনাব হবিবুল্লা বাহার সাহেব। এইবার বিপর্যয়ের কথাটাই বলি। লীগের খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই অন্যতম নির্ভরযোগ্য গোলকীপার

মণি তালুকদার কলেরা রোগে আক্রান্ত হন, জীবন রক্ষা অবশ্য তাঁর হলো বটে, কিন্তু খেলায় যোগদান করার সামর্থ তাঁর আর রইল না। সেজন্য অখ্যাত অনভিজ্ঞ কয়েকজন গোলকীপার দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করে খেলা চালাতে গিয়ে দেখা গেল যে প্রায় খেলাতেই হারতে হচ্ছে, অথচ কোন উপায় নেই। টীমের অন্যান্য খেলোয়াড়গণ প্রাণপণ শক্তিতে খেলতে চেষ্টা করেন, বটে কিন্তু গোলকীপারের জন্য তাদের জিতবার আশা থাকে না। লীগের সর্বশুদ্ধ ১৮টী গেমের মধ্যে ১১টী পরাজয়, ৫টী ড্র গেম, মাত্র ঢুটী খেলাতে জয়লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত ৯টী পয়েন্ট পেয়ে সর্বানিম্ন স্থানাধিকারী হন। ক্লাব কর্তৃপক্ষ বহু চেষ্টা করেও এই পতন রোধ করতে পারেন নি। ইহাকে ভাগ্যবিপর্যয় ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে!

লীগের ২য় খেলায় বৃষ্টিভেজা কর্দমাক্ত মাঠে সেই বৎসরের চ্যাম্পিয়ান ডালহৌসী টীমের সঙ্গে টীম শোচনীয়ভাবে ৭—১ গোলে পরাজিত হয়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাসে ইহা একটি কালো দাগ। ভারতের মাটীতে এই ক্লাবের ভাগ্যে এতাবৎকালে এরকম কালোদাগ আর একটিও পড়ে নি। এর কারণও ছিল, যথা—একে ত লীগের ২য় খেলা, সেইজন্য নিয়মিত খেলোয়াড় সেদিন অনেকেই অনুপস্থিত ছিল। তার উপরে সেদিন প্রায় সারাদিনই বৃষ্টি হচ্ছিল, মাঠও যথাসম্ভব কর্দ্দমাক্ত। অনেকের ধারণা ছিল সেদিন খেলা হবে না, কিন্তু কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যথাসময়ে খেলা আরম্ভ হলো। প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্ধর্ষ ডালহৌসী টীম, তারা তাদের পূর্ণশক্তি নিয়েই মাঠে অবতীর্ণ। এদিকে ইস্টবেঙ্গল টীম কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে কয়েকজন জুনিয়ার খেলোয়াড়কে নিয়েই মাঠে খেলতে নামলো—তখনও পুরো ১১জন হয় নি, একজন কম। জিতু মুখার্জী দেখলেন যে আর ত কোন খেলোয়াড়ই উপস্থিত নেই, কি করা যায়—তিনিই জার্সি গায়ে দিয়ে রাইট-ইন পজিসনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি অবশ্য এককালে খ্যাতিমান খেলোয়াড়ই ছিলেন, কিন্তু তখন তিনি খেলা ছেড়েই দিয়েছেন; দায়ে

পড়ে তাঁকে নামতে হলো, কিন্তু কোন ফল হলো না। ডালহৌসী বৃষ্টি কাদার মাঠে দুর্বল টীম পেয়ে ইচ্ছামত নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দিলো। এই বৃষ্টি কাদার মাঠে এর চেয়ে ভাল টীম নামিয়েও উক্ত শক্তিশালী ডালহৌসীর সঙ্গে পারতেন কিনা তাতে সন্দেহ ছিল, কারণ তখন ভারতীয় খেলোয়াড়রা সবাই খালি পায়ে খেলতেন। উভয় পক্ষে কিরূপ টীম ছিল—

ডালহৌসী—গোলে—ডেভিস ; ব্যাক—সি. ব্রাউটন, সি ডানকান; হাফে—এম. ব্রাউটন, জিম ডেভিডসন, মার্শাল ; ফরোয়ার্ড —পাউয়েল, বেল, হেগি, কুক, ষ্টাবস।

ইষ্টবেঙ্গল—গোলে—বি. দাস ; ব্যাক—এন. দাস, মণি দাশ (অধিনায়ক); হাফে—হবিবুল্লা, বিজয়হরি সেন , সমাদ্দার ; ফরোয়ার্ড —দুলাল, জে. মুখার্জি, সুধাংশু মিত্র, অনিল বসু, দুদা।

নিয়মিত ব্যাক খেলোয়াড়দের অনুপস্থিতিতে সেই বৎসরের অধিনায়ক মণি দাশ তাঁর হাফ ব্যাক পজিসন ছেড়ে ব্যাক পজিসনে খেলতে নামেন। ননী গোঁসাইয়ের অনুপস্থিতিতে বিজয়হরি সেণ্টার হাফে খেলেন, আর বাকী খেলোয়াড় প্রায় সবাই জুনিয়ার ছিল, এমতাবস্থায় যে আরও অধিক গোল হয় নি এইটাই আশ্চর্য বলতে হবে। অথচ ডালহৌসী টীম সেই বৎসর উপরোক্ত খেলোয়াড়দের নিয়েই লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল! বিখ্যাত গোলকীপার ডেভিস, বিখ্যাত ব্যাক চার্লস ডানকান, সেণ্টার-হাফ জিম ডেভিডসন, ফরোয়ার্ড বেল, কুক, ষ্টাবস এদের কথা কোন দিনই ভোলবার নয়। জিম ডেভিডসনের মত সেণ্টার-হাফ খুব কমই দেখা গেছে। তখনকার বাৎসরিক ইয়োরোপীয়ান-ইণ্ডিয়ান খেলায় এক দিকে জিম ডেভিডসন আর এক দিকে ননী গোঁসাই এই দুই সেণ্টার-হাফে খেলা একটা দেখবার মত জিনিষ ছিল। ডালহৌসী টীম এই রকমভাবে ইস্ট-বেঙ্গলকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করালে, কিন্তু পরবর্তী-কালে এই ইস্টবেঙ্গল টীমের কাছে তারাও এর চেয়ে বেশী গোলের

ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে, যথা—১৯৩২ সালে ৫—০ গোলে, ১৯৪১ সালে ৭—০ গোলে, ১৯৪২ সালে ৪—০, ৫—০ গোলে, ১৯৪৩ সালে ১০—০ গোলে ১৯৪৫ সালে ৪—০, ৫—০ গোলে। অনেকে বলে থাকেন বা সংবাদপত্রেও লেখা হয়ে থাকে যে অমুক টীম অমুক টীমকে হারিয়ে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে। তা'হলে ইস্টবেঙ্গল টীম উক্ত ১৯২৮ সালের একটি মাত্র শোচনীয় পরাজয় ৭—১ গোলের বিনিময়ে পরবর্তীকালে কি প্রকার প্রতিশোধ নিয়েছিল তার হিসাব দিলাম। ভারতের মাটীতে ইস্টবেঙ্গল টিম একমাত্র ঐ খেলাটি ছাড়া আর কোনদিন ওরকম শোচনীয় ভাবে কারো সঙ্গেই পরাজিত হয়নি (ভারতীয় অন্যান্য বিখ্যাত টিমও একধিক বার ৬ গোল ৮ গোল খেয়ে হজম করেছে এরূপ নজীর বিরল নয়, সুতরাং এ ক্লাবের দুঃখ করবার কিছুই নেই)।

১৯২৯ সালে টীম দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে থাকে কিন্তু সে বৎসর হাওড়া ইউনিয়ন টীম বেশ শক্তিশালী থাকায় তারাই দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয় এবং ইষ্টবেঙ্গল দ্বিতীয় হয়। পরবর্তী ১৯৩০ সালে টীম বেশ শক্তিশালী হয়। ২য় ডিভিসন লীগের খেলায় ৭টী গেম খেলে ১৪ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে এমন সময় কলকাতার মধ্যে তখন ভয়ানক স্বদেশী হাঙ্গামা ছিল, নন কো অপারেশন মুভমেণ্ট পুরাদমে চলছিল। হঠাৎ একদিন খেলার মাঠে উক্ত নন কো অপারেশন আরম্ভ হয়ে গেল। "সাহেবদের সঙ্গে খেলা বন্ধ করে নন কো অপারেশন সাক্‌সেসফুল কর"—এই শ্লোগান তুলে মাঠের সমস্ত খেলা পণ্ড করে দিয়ে গেল। ১৯৩০ সালের সমস্ত ভারতীয় দলের খেলা এইরূপ বন্ধ হয়ে যায়। এর ভেতর কোন চক্রান্ত যে ছিল না একথা জোর করে বলা যায় না। যাই হউক লীগের খেলা ত পণ্ড হলো কিন্তু শীল্ড বন্ধ করার ক্ষমতা ছিল না যেহেতু ওটা সাহেবদের খেলা সুতরাং ও খেলা চালু হলো এবং নির্বিঘ্নে তা সম্পন্ন হলো। সিফোর্থ হাইলেণ্ডার্স টীম লয়াল রেজিমেণ্ট টীমকে ২—১ গোলে

হারিয়ে শীল্ড জয় করে নিল। ১৯৩১ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীম ২য় বিভাগে খুব কৃতিত্বের সঙ্গে খেলে চ্যাম্পিয়ন হয়। পরবর্তী বৎসরে ১৯৩২ সাল থেকে পুনরায় প্রথম বিভাগে স্থায়ী আসন লাভ করে ১৯৩০ সালে সূর্য চক্রবর্তী পুনরায় ক্লাবে ফিরে আসেন তারপর তাঁরই চেষ্টায় ক্লাবের উন্নতি হতে থাকে। কয়েকটী ভাল খেলোয়াড়ও সংগ্রহ হয়। বিখ্যাত লেফট ইন মজিদ, লেফট আউট হীরাদাস, সেণ্টার ফরোয়ার্ড সুধাংশু মিত্র, রমিজ, শৈলেন দাশগুপ্ত, উষা রায় ব্যাক পরেশ মজুমদার জে, সরকার বা জিতা পাগলা, কমল গাঙ্গুলী প্রভৃতি। এঁরা ক্রমশঃ ক্লাবে যোগদান করে। এঁরাই প্রাণপণ খেটে টীমকে পুনরায় দাঁড় করিয়ে দেন।

১৯৩২ সালে ইষ্টবেঙ্গল টিম পুনরায় প্রথম বিভাগীয় লীগখেলায় যোগদান করেন—টিম যে খুবই শক্তিশালী ছিল এ কথা বলা চলে না তবে খেলোয়াড়দের সংঘবদ্ধতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার জন্য খেলায় খুবই উন্নতি দেখা গেল। সেই বৎসর এদের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ডারহাম লাইট ইনফেন্ট্রি। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত ডারহাম টিম যেরূপ দুর্ধর্ষ টিম ছিল, ততটা জোরদার টিম অবশ্য তখন ছিল না এ কথা ঠিক কিন্তু যা ছিল তাতেই তারা এখানকার কোন টিমকেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না তথাপি একমাত্র ইষ্টবেঙ্গল টিমের সঙ্গেই তাদের লীগ খেলার সত্যিকার প্রতিযোগীতা চললো। ডারহাম টিম তখন ব্যারাকপুরে অবস্থান করছিল। ফোর্ট উইলিয়মে কে, আর আর (কিংস রয়াল রাইফেলস্) রেজিমেণ্ট টিম ছিল। যাই হোক প্রথম খেলায় ডারহাম টিম ইষ্টবেঙ্গলকে ৪—০ গোলে হারিয়ে দেয় বটে কিন্তু ২য় গেমে ৩—৩ গোলে ড্র গেম করতে বাধ্য হয়। ইষ্টবেঙ্গল প্রায় সমান সমান পয়েণ্টে এগিয়ে চলেছে, ৪টি গেম বাকী আছে, খেলা পড়লো এরিয়ানের সঙ্গে। এরিয়ান ইষ্টবেঙ্গল টিমকে ২—১ গোলে হারিয়ে দিল। এই খেলাটির কথা অনেকেরই মনে থাকার কথা কেননা এই খেলাটি একটি স্মরণীয়

খেলা। যেহেতু এই খেলায় জিততে পারলে ইষ্টবেঙ্গলের পক্ষে চ্যাম্পিয়নশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা সমধিক ছিল কিন্তু ভাগ্যদোষে খেলার ফল উল্টে গেল। এই খেলাটি খুবই উত্তেজনামূলক হয়েছিল বিশেষতঃ এরিয়ান টিম গোড়া থেকেই মারধোর করতে আরম্ভ করে সেই কারণে ইষ্টবেঙ্গল লেফটইন মজিদ মাথা গরম করে খেলতে থাকে—এবং তার জন্যই খেলাটি শেষ পর্যন্ত এরিয়ানের পক্ষে সুফল দান করে। সূর্য চক্রবর্তী অনেক চেষ্টা করেও খেলার মোড় ঘোরাতে সক্ষম হন নাই। এই খেলাটি যাতে ইষ্টবেঙ্গল জিততে না পারে তারজন্য নানা রকম কারসাজী হয়েছিল সে সব কথা এখন আর উল্লেখ করে লাভ নাই তখনকার দর্শক সাধারণ এসব কথা জ্ঞাত আছেন সুতরাং বাহুল্য কথা নিষ্প্রয়োজন। আরও তিনটি খেলা বাকী ছিল এবং তাতে ৫টি পয়েন্ট সংগ্রহ হলেই চ্যাম্পিয়ানশিপ পাওয়া যেতো কিন্তু তা' আর হলো না মাত্র শেষ খেলায় মোহনবাগানকে ৩—২ গোলে হারিয়ে ২টি পয়েন্ট সংগ্রহ হলো। ডারহাম ১ পয়েন্টে উপরে থেকে চ্যাম্পিয়ানশিপ দখল করলো। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে মোহনবাগান সেই বৎসর প্রথম দুবার ইষ্টবেঙ্গলের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। ইষ্টবেঙ্গল টিমের সে বৎসরের অধিনায়ক ছিলেন গোলকীপার মণি তালুকদার কিন্তু প্রধান পরিচালক ছিলেন সূর্য চক্রবর্তী। তাঁর চেষ্টাতেই টিম আগের বছর প্রমোশনও পেয়েছিল, এবারও চ্যাম্পিয়ন হতে হতে ভাগ্য দোষে রানার্স আপ পেয়েই ক্ষান্ত থাকতে হলো। সূর্যবাবুর কথা পরে অবশ্য বিস্তারিত-ভাবে জানানো হবে তবে এখন এইটুকু জানাচ্ছি যে ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩৪ পর্য্যন্ত তাঁর সমতুল্য রাইটইন ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে আর কেউ ছিল না। যদিও কেহ কেহ অন্য খেলোয়াড়ের নামও করতে পারেন কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখলে আমার কথায় কেহই দ্বিমত করবেন না এ কথা ঠিক। সূর্যবাবুর অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্য, খেলা পরিচালনার দক্ষতা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি ছিল অপূর্ব

এবং অতুলনীয় কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এমন একজন প্রতিভাশালী খেলোয়াড় কোন প্রথম শ্রেণীর ট্রফি জয় করতে পারেন নি। না পারুক, খেলাব জগতে তাঁর নাম অবিস্মবণীয় হয়ে থাকবে একথা অবিসম্বাদিত সত্য। সে বৎসর সুবিখ্যাত লেফট ইন মজিদ ইষ্টবেঙ্গল টিমের হয়ে অদ্ভুত খেলা খেলেছিলেন। মজিদেব হেডওয়ার্ক ছিল অতুলনীয়। বল কন্‌ট্রোল ও ড্রিবলিংয়ে কেউ তাঁব সঙ্গে পেরে উঠতো না। গোল করাব ক্ষমতাও ছি-ল তাঁর অসাধাবণ। এই দুইটি ফবওয়ার্ড ও গোলকীপারেব উপরই টিমের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল। ননী গোঁসাই তখনও টিমের সেণ্টার হাফে খেলছিলেন কিন্তু তখন তাঁর পড়তি খেলা। রাইট আউট দুলাল কিছুটা শক্তির উৎস যোগাচ্ছিলেন বটে আর বাকী খেলোয়াড়দেব মধ্যে নাম কবার মত কেউ ছিল না বলা চলে কিন্তু সামগ্রিক ভাবে সকলেই প্রাণপণ খেটেছে। লীগ বা শীল্ড জয় করার আর একটা বাধা ছিল সে কথা আগেও বলেছি। খালি পায়ে শুকনো মাঠে খুব ভাল খেলা এঁবা খেলেছেন বটে কিন্তু ভিজে কর্দমাক্ত মাঠে এদের পরিশ্রম করাই সার হতো। ভিজে বা কর্দমাক্ত মাঠে খালি পায়ে কৃতিত্ব দেখাবার কোন সুযোগ থাকে না বুটধারী যে কোন টিমের কাছে কাবু হয়ে পডতে হয়।

১৯৩২ সালে টিমে যাঁরা খেলেছিলেন—

গোলে—মণি তালুকদার (অধিনায়ক) ডি, ঘোষ

ব্যাক—পরেশ মজুমদার, জে সরকার (জিতা পাগলা) রসিদ (গদা) শৈলেন চক্রবর্তী

হাফ ব্যাক—উষা রায়, জলিল খাঁন, শৈলেন দাশগুপ্ত (কালোমাণিক) ননী গোঁসাই, কমল গাঙ্গুলী অনিল বসু

ফরোয়ার্ড—দুলাল, সূর্য চক্রবর্ত্তী, রসিদ, মজিদ, হীরাদাস, বি, সোম, সুধাংশু মিত্র। সে বছর ডালহৌসীর বিখ্যাত সেণ্টার ফরোয়ার্ড আর, কার ইষ্টবেঙ্গল টিমে খেলবার জন্য খুবই ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু ক্লাব কর্তৃপক্ষের অধিকাংশ সদস্য এতে অমত প্রকাশ করেন। সেইজন্য কার সাহেব খেলতে পাবেন নি নতুবা হয়ত টিম খুব শক্তিশালী হতো। একটা কথা এখানে উল্লেখযোগ্য বাংলার বাইরের খেলোয়াড় দিয়ে বা এংলো ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড় দিয়ে টিম গঠন করা বা পুষ্ট করা, এমন কি মুসলমান খেলোয়াড় দল ভুক্ত করা প্রথমে ক্লাব কর্তৃপক্ষের একান্ত অনিচ্ছা ছিল কিন্তু ক্রমে সেই মনোভাব দূরীভূত হয়। যেহেতু এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক ছিলেন মোহনবাগান ক্লাব। তাঁরাই প্রথমে মুসলমান খেলোয়াড় ফজলুর রহমানকে দলভুক্ত করেন তাঁরাই প্রথমে মাদ্রাজ থেকে একটি দেশীয় খৃষ্টান খেলোয়াড় সুরী, কে, এট্টীলী নামক সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে এনে খেলান ১৯১৮ সালে।

১৯৩৩ সালেও ইষ্টবেঙ্গল টিম লীগ রানার্স আপ হয়। সে বৎসর আটটি জয়, নয়টি ড্র ও তিনটি পরাজয় হয়েছিল। ২৬ পয়েণ্ট পেয়ে ডারহাম চ্যাম্পিয়নশিপ পায়। ইষ্টবেঙ্গল ২৫ পয়েণ্ট পেয়ে রানার্স আপ হয়। ইষ্টবেঙ্গলের শেষে খেলা ছিল স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে। এই খেলাটি জিততে পারলেই নির্ঘাৎ চ্যাম্পিয়ান হওয়া যায়। তা ছাড়া স্পোর্টিং ইউনিয়ন টিম তেমন শক্তিশালী টিম নয়। খেলা আরম্ভ হওয়ার পর হাফ টাইমের মধ্যেই ইষ্টবেঙ্গল পর পর দুটি গোল করে ভাবলেন যে খেলাত জিতেই গিয়েছি সুতরাং একটু ঢিলে দিয়ে খেললেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু স্পোর্টিং ইউনিয়ন টিম হাফ টাইমের পর মরিয়া হয়ে খেলতে লাগলো এবং তার ফল স্বরূপ

পর পর দুটো গোল শোধ করে বসলো। খেলা ঘুরে গেল। শেষ কয়েক মিনিট বাকী, এমন সময় তাদের রাইট আউট অজয় বোস একটা বল পেয়ে দৌড়ে এসে দূর থেকেই কোণাকুণি এমন এক সট মারলো যে বলটি অপ্রত্যাশিতভাবে গোলে ঢুকে গেল। গোলকীপার মণি তালুকদার হাঁ করে চেয়ে রইলো। ইষ্টবেঙ্গলের লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের আশা শেষ হয়ে গেল ? হাফ টাইমের মধ্যে দুটো গোল হয়ে যাওয়ার পর ইষ্টবেঙ্গলের সমর্থকগণের মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে চলে ছিল তখনও তারা বুঝে উঠতে পারেনি যে ইষ্টবেঙ্গলের ভাগ্যে কিরূপ নির্ম্মম পরিহাস রচনা করে রেখেছেন। খেলা শেষ ৩—২ গোলে হেরে গিয়ে সমস্ত আনন্দ লুপ্ত হয়ে নিরানন্দেব আঁধাব ঘনিয়ে এলো। আই, এফ, এ শীল্ডেও সুবিধা কবতে পারলেন না। ববং ভিজে কর্দমাক্ত মাঠে স্রপশয়ার রেজিমেণ্ট টিমের কাছে ৬—০ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। ইহা ইষ্টবেঙ্গল টিমের পক্ষে দ্বিতীয় বিপর্যয়। পরবর্ত্তী কালে তেমন বিপর্যয়, আর কোনদিন হয় নি। অনেকে ভেবেছিল যে শ্রফসায়ার টিমই সে বৎসর শীল্ড নিয়ে যাবে কাবণ তাদের সেণ্টার ফরোয়ার্ড এ, ড়েবিক একজন দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড় বলেই পরিচিত ছিল কিন্তু পরবর্তি গেমে ডি সি্ এল, আই টিমের কাছে তারা ১—০ গোলে পরাজিত হয়। ঐ ডি, সি, এল আই টিম শেষ পর্যন্ত শীল্ড বিজয়ী হয়। ১৯৩০ সালে টিমের প্রায় সব খেলোয়াড়ই বজায় ছিল পুরাতন খেলোয়াড় কেহই দল পরিত্যাগ করেন নি একমাত্র হীরাদাস ভিন্ন। উপরন্ত বিখ্যাত সেণ্টার হাফ নুর মহম্মদ সেই বৎসর মোহামেডান টিম পরিত্যাগ করে ইষ্টবেঙ্গলে যোগদান করেছিলেন এবং এই টিম থেকেই তিনি ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেণ্টার হাফ বলে খ্যাতি লাভ করেন। সেই বৎসর আরও কয়েকজন নবাগত খেলোয়াড় যোগ দিয়েছিলেন তন্মধ্যে ফরোয়ার্ড সেলিম- যিনি পরে মোহামেডানে রাইট আউট খেলে নাম করেছিলেন ও রবি ধর সমধিক খ্যাতিমান। রবি ধর পরে খেলার জন্য পুলিশ লাইনে চাকুরী পেয়ে টিম পরিত্যাগ করেন এবং পুলিশ

টিমে খেলেন। এক্ষনে তিনি কলিকাতা পুলিশের একজন সাব ইনস্পেক্টর।

১৯৩৪ সালে লীগে ইষ্টবেঙ্গল টীম মোটেই সুবিধা করতে পারে নি। ৫টা জয়, ৭টা পরাজয়, ৮টা ড্র করে সর্বশুদ্ধ ১৮টী পয়েণ্ট পেয়ে অষ্টম স্থান অধিকার করে। আই.এফ.এ. শীল্ডেরও প্রথম রাউণ্ডে কে. আর. টীমের সঙ্গে ২—০ গোলে পবাজয় বরণ কবে। ক্লাব-সমর্থকগণ ভেবেছিল যে মুর মহম্মদ যখন টীমে রয়েছে তখন টীম খুব শক্তিশালী তা ছাড়া সে বৎসর আরও কয়েকজন নূতন খেলোয়াড় আমদানী হয়, যথা—সেণ্টার ফরোয়ার্ড গৌর বসাক, নিধু মজুমদার, ইন্‌সাইডে বেহারীলাল, রাইট আউট রঞ্জিত নারায়ণ বা রুনু, সাইড হাফে সুরেশ ব্যানার্জী প্রভৃতি আর পুরাতন প্রায় সকলেই ছিল। কিন্তু কার্যকালে অর্থাৎ খেলায় দেখা গেল যে টীম মোটেই শক্তিশালী নয়। দ্বিতীয় গোলকীপার হিসাবে স্পোর্টিং ইউনিয়ন টীম থেকে জ্যোতিষ গুহ যোগ দান করেন। তিনি মাত্র ৩টী গেম খেলেন সর্বশুদ্ধ। অবশ্য পরবর্তী-কালে তিনি কর্মকর্তা হিসাবে প্রভূত নাম করেন। সে বৎসব প্রথম ভারতীয় টীম হিসাবে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লীগ চ্যাম্পিয়ান-শিপ লাভ কবে। আগেব বছব তারা ২য় বিভাগে প্রথম হয়ে প্রমোশন পেয়ে সেই বৎসরেই চ্যাম্পিনশিপ পায়। আই. এফ. এ. শীল্ডের ফাইনালে ডারহাম ও কে. আর. আব টীম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কিন্তু ২—২গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ হয়। পরে আর তারা প্রতিযোগিতায় নামে নি, শীল্ড খেলা অমীমাংসিত ভাবেই থেকে যায়। শীল্ডের ইতিহাসে এই প্রথম এরূপ পরিণতি। মিলিটারীদের বড় কর্তা রেফারীর নির্দেশে সন্তুষ্ট হতে না পেরে টীম দুটীকেই পরে আর খেলতে দেন নি। ঐ ফাইনালে রেফারী ছিলেন বিখ্যাত পঙ্কজ গুপ্ত। তিনি ফাইনাল খেলায় ১ মিনিট ৪ সেকেণ্ড বেশী সময় খেলিয়েছিলেন নতুবা আর কোন ত্রুটী তাঁর ছিল না, যা হোক পরে তিনিও আর কোনদিন রেফারীগিরি করেন নি।

১৯৩৫ সালে টীমের বিশেষ পরিবর্তন হয়। আগের বছর ১৯৩৪ সালে ভারতীয় টীম দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে গিয়েছিল। সেই কারণে বাঙ্গালোরের কয়েকজন খেলোয়াড় কলকাতায় ট্রায়াল গেম খেলতে আসে। মাত্র দুজন খেলোয়াড় ভ্রমণকারী টীমে স্থান পায়, আর বাকী খেলোয়াড় কলকাতায় থেকে যায়—তাদের মধ্যে লেফট ইন রহমৎ মোহামেডান টীমে যোগদান করে এবং অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে খেলে যথেষ্ট নাম করে ও চ্যাম্পিয়নশিপও লাভ করে। যে দুজন খেলোয়াড আফ্রিকা টুরে গিয়েছিল তারাও খুবই সুনাম অর্জন করে ফিরে আসে। সে দুজন খেলোয়াড় ১৯৩৫ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগদান করে। দুজন খেলোয়াড়ই বাঙ্গালোরের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রাইটইন লক্ষ্মী নারায়ণ ও সেণ্টার ফরোয়ার্ড রামানা। রামানা উচ্চাঙ্গের খেলোয়াড় হলেও কলকাতার মাঠে তিনি খুব সুনাম অর্জন করতে পারেন নি, কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁর অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যে দর্শকচিত্ত জয় করেছিলেন। প্রথম প্রথম তিনিও খুব সুবিধা করে উঠতে পারেন নি বটে, কিন্তু তাঁর ক্রীড়াধারা সত্যিই উচ্চাঙ্গেরও বিশেষরূপে লক্ষ্যনীয় ছিল। অবশ্য ক্রমে ক্রমে তাঁর খেলার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। সে বৎসর টীম যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছিল বটে, কিন্তু লীগ প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত ১ পয়েণ্টের ব্যবধানে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের হাতেই চ্যাম্পিয়নশিপ ছাড়তে হয়। মোহামেডান টিমের নিকট দুবার পরাজিত হওয়ার কারণেই লীগের আশা লুপ্ত হয়, নতুবা এবারও পুরামাত্রায় চ্যাম্পিয়নশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। লীগের প্রায় অর্দ্ধেক খেলার পর সেণ্টার ফরোয়ার্ড রামানা ই. বি. আর. টিমের বিপক্ষে খেলতে গিয়ে পায়ে গুরুতর আঘাত পান, তারপর তিনি আর কোন খেলায় যোগ দিতে পারেন নি। কয়েকজন নবাগত খেলোয়াড় টীমে যোগদান করেছিলেন, তাঁরাও নামজাদা খেলোয়াড় ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলার ফল আশাপ্রদ হলো না। আই. এফ. এ. শীল্ডেও ই. আই. আর. ( জামালপুর ) টীমের কাছে ২—১ গোলে

পরাজয় স্বীকার করতে হয়। টীম এইরূপ ছিল

গোল—মণি তালুকদার, মীর হোসেন।

ব্যাক—পরেশ মজুমদার, সেলিম, রসিদ ( গদা ), বসন্ত বাগচী।

হাফব্যাক—নাসিম, নূরমহম্মদ, মুথরাজ, বাদল মহলানবিশ, কমল গাঙ্গুলী।

ফরোয়ার্ড—তুলসাল ( অধিনায়ক ), লক্ষ্মীনারায়ণ, রামানা, মজিদ জ্ঞান বর্দ্ধণ, হীরা দাস, ভূপেন রায় চৌধুরী, নিধু মজুমদার, লাখিয়া।

মীর হোসেন ও সেলিম পেশোয়ার থেকে খেলতে আসেন। মীর হোসেন আফ্রিকা টুরে গিয়েছিলেন। বিখ্যাত সেণ্টার হাফ নাসিমও আফ্রিকা টুরে গিয়েছিলেন এবং ঐ বৎসর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগদান করেন ও রাইট হাফে খেলেন।

১৯৩৬ সালে টীমের অনেক পরিবর্তন হয়। বিখ্যাত সেণ্টার-হাফ নূরমহম্মদ ও নাসিম মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে যোগ দান করেন। নূর মহম্মদ অবশ্য পূরাতন টীমেই প্রত্যাবর্তন করেন। এদিকে মোহামেডানের রহমৎ, হবিব ও মহীউদ্দিন ইষ্টবেঙ্গল টীমের পক্ষে খেলবার জন্য আই. এফ. এ.-র ছাড়পত্রে সই করেন, শেষ পর্যন্ত রহমৎ ও হবিব ইষ্টবেঙ্গলে খেলতে আসেই নি, মহীউদ্দিন খেলেছিল। তা'ছাড়া বিখ্যাত গোল-কীপার পদ্ম ব্যানার্জি ও লেফট আউট কে. প্রসাদ হাওড়া ইউনিয়ন থেকে, দিল্লী থেকে নবাগত রাইট হাফ কাইসার ( পরবর্তী বিখ্যাত সেণ্টার হাফ ) ও ভবানীপুর থেকে প্রমোদ দাশগুপ্ত নামে একটি ব্যাক খেলোয়াড়, বাঙ্গালোর থেকে লক্ষ্মীনারায়ণ মুর্গেশ নামে একজন সেণ্টার ফরোয়ার্ড ও করিম নামে একটি রাইট আউট ও রামানাকে নিয়ে আসেন। দানাপুর থেকে মজিদ, আখতার হোসেন নামে একটি ফরোয়ার্ড খেলোয়াড় নিয়ে আসেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত, কাইসার, কে. প্রসাদ, করিম, আখতার হোসেন এই কজন খেলোয়াড় নিতান্ত কম বয়স্ক ও খর্বাকৃতি ছিলেন, কিন্তু তাঁদের খেলা দেখে দর্শক

সাধারণ মুগ্ধ হয়। ঢাকা থেকে সুবোধ মিত্র নামক একজন খ্যাতিমান হাফ ব্যাকও যোগ দেন। এদের সমন্বয়ে টীম গঠন হলো বটে, কিন্তু লীগের খেলায় শেষ পর্যন্ত খুব সুবিধা করতে পারেলেন না। ২০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে অষ্টম স্থান অধিকার করলেন। লীগ খেলায় প্রথম দিকে টীম সেট করতেই অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। সেণ্টার হাফের শূন্যস্থান পুরণ করতে মজিদকেই খেলতে হয়। অবশ্য মজিদ সেণ্টার হাফ পজিশনে খেলে অদ্ভুত খেলা দেখালেন, কিন্তু টীমকে দাঁড় করাতে পারলেন না; সেইজন্য তিনি ২।৩টী গেমে সেণ্টাব হাফ খেলে পুনরায় লেফট ইনে খেলতে লাগলেন। মুর্গেশ সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলতে লাগলেন বটে, কিন্তু প্রথম প্রথম তিনিও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। লীগের শেষের দিকে মুর্গেশ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আরও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। রামানা এসেছিলেন বটে, কিন্তু একটীমাত্র গেমে যোগদান করেই তিনিও আর খেলেননি। সেই বৎসর একমাত্র উল্লেখ যোগ্য খেলা হয়েছিল মোহনবাগানের বিপক্ষে। মোহনবাগান প্রথম গেমে ৪—০ গোলে ইষ্টবেঙ্গলের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। ইষ্ট-বেঙ্গল টীমে সেদিন খেলেছিল, গোলে পদ্ম ব্যানার্জি, ব্যাকে—পরেশ মজুমদার ও প্রমোদ দাশগুপ্ত, হাফে—কাইসাব, মহীউদ্দিন, কমল গাঙ্গুলী; ফবোয়ার্ডে—ডুলাল ( অধিনায়ক ), লক্ষীনারায়ণ, মুর্গেশ, মজিদ, কে. প্রসাদ। মোহনবাগান টীমেব গোলে—কে. দত্ত; ব্যাকে —সম্মথ দত্ত ও বিরাজ ঘোষ; হাফে—বিমল মুখার্জি, প্রেমলাল, দরবারী দত্ত; ফরোয়ার্ডে – মানা গুঁই, এ. দেব (কানি), পল্টু গাঙ্গুলী, কুমার ও সতু চৌধুরী ( অধিনায়ক )। ইষ্টবেঙ্গলের পক্ষে গোল করেন লক্ষীনারায়ণ, কে. প্রসাদ, মুর্গেশ ও মজিদ।

১৯৩৭ সালে ইষ্টবেঙ্গল টিমকে নূতন রূপদানের চেষ্টা করলেন কপিবাবু (তদানীন্তন এ. জি. এস.) তিনি প্রত্যেকটি বাঙ্গালী খেলোয়াড় দিয়ে টীম গঠন করার মনস্থ করে সেই অনুযায়ী খেলোয়াড় সংগ্রহ করতে লাগলেন। কয়েকটি উদীয়মান তরুণ বাঙ্গালী

খেলোয়াড় নিয়েও এলেন। উদ্দেশ্য, দেখা যাক্ এর পরিণাম কতদূর বা এই প্রচেষ্টা কতদূর ফলপ্রসূ হয়, কিন্তু তাঁর মনোবাসনা ঠিক পুরোপুরি সফল হলো না, যদিও তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। সেই কথাটাই বলি।

ঢাকা থেকে ব্যাক,—রাখাল মজুমদার, লেফট ইন পাখী সেন; হাফব্যাক—রমেন সেন, রূপা ভট্টাচার্য; স্পোর্টিং ইউনিয়ন টীমের উদীয়মান সেণ্টার-হাফ বীরেন সেন; জর্জটেলিগ্রাফের সেণ্টার ফরোয়ার্ড—ডি. ব্যানার্জিকে দলভুক্ত করা হলো। এঁরা সকলেই বেশ নাম করা খেলোয়াড়ই ছিলেন। টিম এইরূপ হলো—গোল পদ্ম ব্যানার্জী মণি তালুকদার।

ব্যাক—প্রমোদ দাসগুপ্ত, রাখাল মজুমদার ও পরেশ মজুমদার (অধিনায়ক)

হাফ—রামু সেন, বীরেন সেন, রূপা ভট্টাচার্য্য, সুবোধ মিত্র, কমল গাঙ্গুলী, রজব-আলী।

ফরোয়ার্ড—দুলাল, রাজেন সাহা, পরেশ মুখার্জী, অজিত নন্দী, ডি. ব্যানার্জি, পাখী সেন, নিধু মজুমদার, খালেক।

লীগের খেলা আরম্ভ হলো, টীমও যথাসম্ভব বাঙ্গালী খেলোয়াড় দিয়ে গঠন করে খেলা চলতে লাগল, কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারা গেল না। তখন মজিদ ও কে. প্রসাদকে টীমে স্থান দেওয়া হলো— সুবিধা হলো না। ৮টি গেম খেলে মাত্র ৪টি পয়েণ্ট সংগ্রহ হলো। তাতে ক্লাবের মেম্বার ও সমর্থকগণ ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠ্‌লো। বাধ্য হয়ে বাঙ্গালোরের লক্ষ্মীনারায়ণকে তার করা হলো। লক্ষ্মীনারায়ণ তার পেয়ে মুর্গেশ ও করিমকে নিয়ে এসে হাজির হলেন। পরে যে টীম নির্বাচিত হলো তাতে রক্ষণভাগ ঠিকই থাকলো, কেবল লক্ষ্মী-নারায়ণ, মুর্গেশ ও করিম টীমে স্থান পেল। খেলায় ভাল রেজাল্ট পাওয়া গেল। ডালহৌসীকে ৩—১ গোলে পরাজিত করা সম্ভব

হলো। পরের গেমে ভবানীপুর টীমকে ৩—০ গোলে হারিয়ে দিল। ভবানীপুর সে বৎসর খুবই ভাল খেলছিল। তারপরের গেম এরিয়ানের সঙ্গে, তারাও ৫—০ গোলে হারলো। তারপর ক্যালকাটা টীমকে ৫—০ গোলে হারাবার পর মাঠে খুব হৈ চৈ পড়ে গেল—খুব জটলা হতে লাগলো কারণ পরের গেম মোহামেডানের সঙ্গে। এদিকে মোহামেডান লীগ চাম্পিয়ানশিপ পাওয়ার পথে—তাছাড়া তাদের টিমও খুবই শক্তিশালী এবং দুর্ধর্ষ। উপর্যুপরি তিন বছর লীগ নিয়েছে, গত বছর শীল্ড পেয়েছে, "সুতরাং তাদের সঙ্গে এঁটে উঠ্‌বে কে? ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে প্রথম খেলায় মহামেডান ২—০ গোলে জিতেছে। এবারে ২য় গেম এসে পড়েছে সুতরাং মাঠময় কেবল এই আলোচনা। লোকে বলাবলি করতে লাগলো যে এবারে ইষ্টবেঙ্গল কি করে দেখা যাবে? মুর্গেশ যে রকম দুর্দ্দান্ত গেম দিচ্ছে, যে হারে গোল করছে, এবারে মোহামেডানকে কাৎ করবেই। আবার একদল বলছে, আরে রেখে দাও মুর্গেশ, একি আর আজেবাজে টীম পেয়েছ—একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী টিম। এই চার বছর ধরে ইষ্টবেঙ্গল খেলছে মোহামেডানের সঙ্গে, একদিনও পেরেছে কি? খেলার সময় দেখবে সব ভেস্তে গেছে। ঐ লক্ষ্মীনারায়ণ, মুর্গেশ কারো ক্ষমতা হবে না মোহামেডানকে গোল দিতে।" এইসব জল্পনাকল্পনা হচ্ছে, এদিকে খেলাও এসে পড়লো। কি হয়, কি হয়, সুতরাং সেদিন অগণিত দর্শক সমাবেশে মাঠ জনসমুদ্রে পরিণত। মোহামেডান ও ইষ্টবেঙ্গল মাঠে নামলো, জনসমুদ্র গর্জ্জন করে উঠলো। বিখ্যাত ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে খেলা—আকাশ পরিষ্কার, রৌদ্রে ঝলমল, মাঠও শুক্‌নো খট্‌খটে। মোহামেডান টিম নামলো—ওসমান, সফি, জুম্মার্খা, নাসিম নুরমহাম্মদ, মাসুম, সেলিম, রহিম, সাবু, রহমৎ ও আব্বাস। রহমৎ গত বৎসর ইষ্টবেঙ্গলের পক্ষে ছাড়পত্রে সই করেও খেলতে আসেনি; এ বৎসর পুনরায় মোহামেডানে খেলবে বলে আবেদন করেছিল,

সুতরাং খেলারম্ভ থেকে নিয়মিত খেলছেন। তাদের বিখ্যাত সেণ্টার ফরোয়ার্ড হাফেজ রসিদ গত বছর লীগের মাঝামাঝি সময়ে এটাচ্‌ড (Attached) সেকসন গোরা টিমের সঙ্গে খেলতে গিয়ে গুরুতরভাবে পায়ে আঘাত পান, তারপর তিনি আর খেলায় যোগদান করতে পারেন নি। হাফ-ব্যাক সাবুকে দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা হয়। সাবু সেণ্টার ফরোয়ার্ডে উপযুক্ত প্রতি-নিধিত্ব করেন। সেই থেকে সাবু রীতিমত সেণ্টার ফরোয়ার্ড-রূপেই খেলে আসছেন। তা'ছাড়া তাদের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ই উচ্চাঙ্গের খেলা খেলে, প্রত্যেকেই দুর্ধর্ষ। কোন খেলোয়াড় ন্যূন নয়। এহেন টিমের বিপক্ষে ইষ্টবেঙ্গল টিমের খেলোয়াড় নামলো গোলে —পদ্ম ব্যানার্জী, ব্যাকে—প্রমোদ দাসগুপ্ত ও রাখাল মজুমদার, হাফে—অজিত নন্দী, বীরেন সেন ও কমল গাঙ্গুলী। ফরোয়ার্ডে-সূর্য্য চক্রবর্ত্তি, লক্ষীনারায়ণ, মুর্গেশ, পাখী সেন ও কে. প্রসাদ। এই টিম সম্বন্ধে বলা চলে যে মোহামেডানের তুলনায় এরা অতি নগণ্য, যেহেতু এই টীমের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নবাগত এবং তরুণ। তা ছাড়া চেহারা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও মোহামেডানের তুলনায় এরা নগণ্য বলা চলে। গোলকিপার পদ্ম ব্যানার্জী অবশ্য পুরাতন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় কিন্তু ব্যাক দুজন খর্বাকৃতি ও তরুণ। হাফ ব্যাক হিসাবে, রাইট হাফে অজিত নন্দী এর পুর্বে কোনদিনই হাফব্যাক পর্যায়ে খেলেননি এমন কি কোন বড় খেলাতেও এর পূর্বে কোনদিন যোগদান করেনি কিন্তু এই প্রথম খেলাতেই তিনি যে নমুনা দেখালেন পরবর্ত্তীকালে তার আসন পাকা হয়ে গেল এবং এই অজিত নন্দী পরবর্ত্তী এমন খেলাই খেলেছেন যে ফুটবল জগতে ( ভারতীয়দের মধ্যে ) তার তুল্য এমন চমৎকার রাইট হাফ আগেও ছিল না পরবর্ত্তী সময়ও দেখা যায় নাই। সেণ্টার হাফ বীরেন সেন ছিলেন তরুণ এবং নবাগত। লেফট হাফ কমল গাঙ্গুলী ছিলেন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। রাই আউট সূর্য্য চক্রবর্ত্তী

খেলায় তখন আর যোগদান করেন না। এক বৎসর পর সেইদিনই প্রথম নামলেন তাঁকে অবশ্য তখন বিদায়ী খেলোয়াড়ই বলা চলে। লেফটইন পাখী সেন ও নবাগত এবং তরুণ। লেফট আউট খর্বাকৃতি কে প্রসাদ অবশ্য অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ছিলেন কিন্তু একমাত্র ভরসা লক্ষীনারায়ণ ও মুর্গেশের উপর। খেলা আরম্ভের পূর্বে দুই দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের মধ্যে অভিবাদন বিনিময় হলো। ইষ্টবেঙ্গলের নিয়মিত অধিনায়ক পরেশ মজুমদার খেলায় যোগদান না করায় প্রবীন সূর্য্য চক্রবর্ত্তী টস করতে এলেন। মোহমেডানের অধিনায়ক আব্বাস টসে জিতে মাঠের উত্তরদিক নিলেন। খেলা আরম্ভ হলো।

প্রথম মিনিটদশেক মোহামেডান একটানা আক্রমণ চালালেন কিন্তু ফল হলোনা। খর্বাকৃতি ব্যাকদ্বয় প্রমোদ ও রাখাল অপূর্বদক্ষ-তার সঙ্গে সেই আক্রমন প্রতিরোধ করলেন। সেই সঙ্গে কমল গাঙ্গুলী এবং বীরেন সেনও যথাযথ সাহায্য কবলেন। তারপর সুরু হলো ইষ্টবেঙ্গলের আক্রমণ। আক্রমণের বেগ যখন তীব্র হয়ে উঠেছে তখন ১৭ মিনিট পরেই লক্ষীনারায়ণ দূব থেকে তীব্র সটের সাহায্যে প্রথম গোল করলেন। তার কয়েক মিনিট পরেই মুর্গেশ দ্বিতীয় গোল করলেন। ওসমানের পায়ের ফাঁক দিয়ে বল ভেতরে প্রবেশ করেছে ওসমান ক্ষিপ্রহস্তে বলটিকে টেনে নিয়েছে কিন্তু রেফারী খুব নিকটেই ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ দেখতে পেয়ে তীব্রস্বরে বাঁশী বাজালেন। ২।৩ মিনিটের সময় লক্ষীনারায়ণ দূর থেকেই কোনাকুনি মাটিঘেষা সট করে তৃতীয় গোল করলেন। ওসমান হতভম্ব হয়ে গেল। তখন তাদের দুর্ধর্ষ রক্ষণভাগও বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওসমানের মত গোল-কীপার সাত মিনিটের মধ্যে তিন তিনটি গোল খেয়ে হতভম্ব হবেনা ত কি হবে ভেবে দেখুন। ওসমান ভারতীয় গোলকীপারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ একথা অস্বীকার করবার মত কোন যুক্তি নাই। জুম্মাখাঁর মত ব্যাক ও ভারতীয় সাইডে আর দেখা যায় নাই। এই অদ্বিতীয় গোলকীপার

ব্যাক ও সেণ্টার হাফ ইত্যাদির বেষ্টনী ভেঙ্গে তছনচ করে দেওয়া যে কিরূপ দক্ষ খেলোয়াড়ের প্রয়োজন চিন্তা করলে মাথা ঘুরে আসে। খেলোয়াড়েরা যেমন চক্ষে সর্ষে ফুল দেখছিলেন দর্শকবৃন্দ তথৈবচ অর্থাৎ তারাও চক্ষে সর্ষেফুল দেখছিলেন। ধারণার বহির্ভূত রেজাল্ট। তা ছাড়া খামখেয়ালী বা আচমকা গোল হয়ে গেছে এমন নয়, দস্তুরমত আক্রমণ চালিয়ে তীব্র সট করে গোল দেওয়া এবং সেই গোলগুলিও দর্শনীয় গোল ছিল, যা তা নয়। তারপর খেলার প্রায় শেষ সময় রহমৎ একটি বল প্রায় মধ্য মাঠ থেকে ধরে নিয়ে চললো, তাকে আর কেউ প্রতিরোধ করতে পারলোনা একেবারে মরিয়া হয়ে রহমৎ ছুটলো গোল পোষ্টের কাছে গিয়ে বল গোলে সট করে ঢুকিয়ে দিল কিন্তু সেই দৌড়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে পোষ্টের উপর গিয়ে পড়ে গেল এবং তাতে আহত হলো। কয়েকজন লোক তাকে ধরে গোলপোষ্টের পেছনে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করছিলেন এমন সময় রহমৎএর ভাই হবিব ছুটে এসে একজন শুশ্রূষাকারীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন উক্ত শুশ্রূষাকারী ভদ্রলোক ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মপরিষদের জনৈক সভ্য ছিলেন তিনি তখন বুঝলেন যে হবিব তার চিরাচরিত স্বভাববশতঃই এরূপ কাণ্ড করলেন। তা ছাড়া তখন মাঠের মধ্যেও মোহামেডানের সমর্থকবৃন্দ ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে নানারকম অবৈধ আচরণ দ্বারা দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে তুলেছিলেন। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই কারণ এরকম বিপর্যয়ও তাদের মধ্যে এর পূর্বে আর হয় নাই।

তার পরক্ষণেই মুর্গেশ একটি বল পেয়ে তীব্র সটের সাহায্যে পুনরায় ওসমানকে পরাভূত করলেন। খেলা শেষ হতে আর কয়েক মিনিট বাকী মোহামেডান তখন আক্রমণ চালালেন রহিমের নিকট বল গেল তিনি শেষ সময়ে আর একটি গোল শোধ করলেন কিন্তু বলটি যখন রহিম ধরেন তখন তিনি সম্পূর্ণ অফসাইডে ছিলেন। রেফারী অনবধান বশতঃ গোলের নির্দ্দেশ দিলেন। ৪—২ গোলে খেলা শেষ হয়ে গেল।

খেলায় যিনি রেফারী ছিলেন তিনি ডালহৌসীর ভূতপূর্ব বিখ্যাত ব্যাক চার্লস্ ডানকান সাহেব। খেলা তিনি ভালভাবেই পরিচালনা করেছিলেন। তবে শেষ গোলটি যে অফসাইড থেকেই হয়েছিল তিনি তা' বুঝেই গোলের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন কিনা এটা বুঝা যায়নি তা'ছাড়া তিনি মোহামেডানের কয়েকজন খেলোয়াড় ও তাদের সমর্থকগণেব মনের গতি অর্থাৎ আবহাওয়া খুব সুবিধার ছিল না এই সব ভেবেই হয়ত তিনি কিছুটা ধামাচাপা দেওয়া গোছ করেই খেলার ইতি করলেন। সাবু ইষ্টবেঙ্গলের গোলকীপার পদ্ম ব্যানার্জিকে যেরূপভাবে আঘাত করে তাঁব হাত জখম করে দিয়েছিলেন তাতে তাকে মাঠ থেকে বহিষ্কার করাই উচিত ছিল কিন্তু রেফারী কেবল সতর্কববেই তাকে রেহাই দিয়েছিলেন পদ্ম ব্যানার্জী যদি হাতে আঘাত না পেতেন তা'হলে রহমৎ যে গোল করেছিলেন তা' তিনি অনায়াসেই প্রতিবোধ করতে পারতেন একথা তিনি নিজেই বলেছিলেন। একটা খেলার কথাতেই অনেক লেখা হযে গেল কিন্তু এটি একটি স্মরণীয় খেলা। যাঁরা এই খেলাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরা জীবনে কখনও ভুলতে পারবেন না এই খেলাব কথা। যাঁরা প্রত্যক্ষ দেখেন নি অথচ ক্রীড়ামোদী তাঁরাও এর কথা ভুলতে পাববেন না বা পারেননি। এ কথা সত্য।

তারপর ইষ্টবেঙ্গল টিম উপর্যুপরি আরও কয়েকটা গেম জিতবার পর মোহনবাগানেব সঙ্গে ২য় খেলায় অপ্রত্যাশিতভাবে ১—০ গোলে হেরে যায়। খেলার তারতম্যের বিচারে ইষ্টবেঙ্গল যথেষ্ট ভালই খেলেছিল কিন্তু গোল করতে পারেনি। মোহনবাগাম টীমের গোল-কীপার কে. দত্ত সেদিন অস্বাভাবিক গেম খেলে মুর্গেশ, লক্ষ্মীনারায়ণের সট প্রতিরোধ করেছিলেন। ইষ্টবেঙ্গলের বিপক্ষে যে গোলটি হয়েছিল তার জন্য গোলকীপার ছিল সম্পূর্ণ দায়ী কারণ মোহনবাগানে সেদিন যে সেণ্টার ফরোয়ার্ড খেলেছিল সেই খেলোয়ড়টা অখ্যাত খেলোয়াড় কিন্তু তার দুর্বল হেড

ইষ্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক থামাবার চেষ্টাই করেন নি। ইষ্টবেঙ্গলের নিয়মিত গোলরক্ষক পদ্ম ব্যানার্জি ও মণি তালুকদার অসুস্থতার জন্য খেলায় অংশ গ্রহণ করেনি তাঁদের পরিবর্তে অখ্যাত গোলকীপার ডি, দাস ( ধীরাজ দাস ) গোলে খেলেছিলেন। খেলার মধ্যে তাকে বল বিশেষ ধরতেই হয়নি তথাপি যে বলটী এসেছিল তিনি সেই বলটী অবহেলা করে ধরবার চেষ্টাই করেন নি। পরে অবশ্য তাকে আর নামানো হয়নি। পরের বৎসর তিনি ক্লাব পরিত্যাগ করেন। উক্ত ধীরাজ দাস বর্তমানে একজন চিত্রাভিনেতা। অনেকে তখন সন্দেহ করেছে যে এই গোলটী খাওয়ার ব্যাপারে গোলকীপার কোন চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। পরের গেম ডালহৌসী টীমের সঙ্গে। সেদিন ইষ্টবেঙ্গল প্রথমেই একটি গোল করে এগিয়ে ছিলেন। হাফ টাইমের পর ডালহৌসী একটি কর্ণার পায়। কর্ণার সট করার পূর্ব মুহুর্তে ইষ্টবেঙ্গলের গোলকীপার পদ্ম ব্যানার্জী গোলপোষ্ট ছেড়ে হাতের দস্তানা পরবার জন্যে নেটের বাইরে ছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে কর্ণার কিক্ করবার পূর্বেই পোষ্টে এসে দাঁড়াবেন কিন্তু সে সুযোগ আর হলোনা অতর্কিতে কর্ণার কিক্ হয়ে গেছে এবং বল ও গোলে ঢুকে পড়েছে রেফারীর বাঁশী ও তখন তীব্রস্বরে বেজে উঠেছে। ঘটনাটি ঘটতে বোধ হয় ২।৩ সেকেণ্ড সময় যায়নি। ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়গণ সকলেই হতভম্ব, দর্শকগণও ততোধিক। রেফারী অবশ্য আইনের চক্ষে দোষী সাব্যস্ত হল না কিন্তু দুই এক সেকেণ্ড সময় তিনি দিতে পারতেন অনায়াসেই, গোলকীপারকে তার নিজস্থানে ফিরে আসার জন্য। খেলা ১—১ গোলে ড্র হয়ে গেল। এই খেলাটির ব্যাপারে পরদিন সংবাদপত্রে রেফারী সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা হয়েছিল কিন্তু সমালোচনায় চোখ কাণ দেয় কে? উক্ত রেফারী তখন এইরূপ প্রথম শ্রেণীর খেলা পরিচালনার যোগ্য ছিলেন না এইরূপ মন্তব্য সংবাদপত্রে হয়েছিল একথা সত্য কিন্তু রেফারী এসোসিয়েশনের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন তাঁর ভ্রাতা। উক্ত রেফারীটি বর্তমানে একটি

বিশিষ্ট ক্লাবের সহকারী প্রধান কর্মকর্তা। নামটা আর দিলাম না যেহেতু অতদিনের কথা লোকেও হয়ত ভুলে গিয়েছে কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকের এখনও স্মরণ পথে জাগরুক আছে। উক্ত রেফারীকে দিয়ে আরও একটি বিখ্যাত গেম খেলানো হয়েছিল, তাতেও পরদিন কাগজে যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছিল কিন্তু তাতে কি আসে যায়। এক দল লোক আছে যারা লোকের গালমন্দকে থোড়াই কেয়ার করে।

লীগ খেলা শেষ হলো কিন্তু এত ভাল খেলা দেখিয়েও শেষপর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল রানার্স আপ হলো। শীল্ডের খেলাতেও বিশেষ সুবিধা হয়নি। সে বৎসর সিক্‌থ ফিল্ড ব্রিগেড ( 6th Field Brigade ) নামক রেজিমেণ্ট টিম শীল্ড বিজয়ী হন। বহুদিন পর একটা প্রকৃত উচ্চাঙ্গের খেলোয়াড় সমন্বিত শক্তিশালী টিম শীল্ড জয় করে। তাদের অধিনায়ক ব্যাক জোনস অতি উচ্চাঙ্গের খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁর মত ব্যাক খুব কমই দেখা গেছে। সেই বৎসর ইষ্টবেঙ্গল টীম বর্মা টুরে রেঙ্গুনে খেলতে যায়। এর পূর্বে ১৯৩২ সালেও টিম বর্মা টুরে গিয়েছিল। বর্মা ফুটবল এসোসিয়েসন বাইরে থেকে কোন ফুটবল টিমকে আনবার ইচ্ছা করলে সর্বাগ্রে ইষ্টবেঙ্গল টিমের নামই তাঁদের স্মরণ পথে আসতো। যাই হউক অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি টিম রেঙ্গুন রওনা হলো। অন্য টিম থেকেও কয়েকজন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করে নেওয়া হলো। টিম এইরূপ হলো যথা—গোল—পদ্ম ব্যানার্জী, বি, মিত্র ( এরিয়ান )

ব্যাক—প্রমোদ দাশগুপ্ত, রাখাল মজুমদার ও বসন্ত বাগচী—

হাফ—অজিত নন্দী, বীরেন সেন, সুবোধ মিত্র, সুরেশ ব্যানার্জী ( ই, বি, আর )

ফরোয়ার্ড—সামাদ ( ই, বি, আর ) দুলাল, জন ও জোসেফ ( কালীঘাট ) নিধু মজুমদার, মুর্গেশ, পাখী সেন, কে, প্রসাদ, ডি ব্যানার্জি, আখতার হোসেন।

উক্ত টুরে লক্ষীনারায়ণ যোগদান করতে পারেন নি। মুর্গেশ

ও দুটী গেম হয়ে যাওয়ার পর গিয়ে হাজির হন। খেলায় দুটী জয় দুটী পরাজয় ও একটী গেম ড্র হয়। সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটী গেম খেলা হয়। শেষ খেলাটী অল বর্মা একাদশের সঙ্গে হয়েছিল সেদিন ইষ্ট বেঙ্গল ৩—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করে। তখন বর্মা টীম সত্যিই উচ্চাঙ্গের খেলোয়াড় দ্বারা পুষ্ট ছিল। শেষ খেলায় টীম ছিল এইরূপ যথা—

ইষ্টবেঙ্গল :— পদ্ম ব্যানার্জী, প্রমোদ দাশগুপ্ত, রাখাল মজুমদার, অজিত নন্দী, বীরেন সেন, সুরেশ ব্যানর্জী, সামাদ, জন, মুর্গেশ, জোসেফ, পাখী সেন।

১৯৩৮ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে কিছু সংখ্যক খেলোয়াড়েব অদল বদল হয়। যথা—খ্যাতনামা গোলরক্ষক কে, দত্ত (হাবাধন) ইষ্টবেঙ্গল টীমে যোগদান কবে। তৎপরিবর্ত্তে পদ্ম ব্যানার্জী ক্লাব পরিত্যাগ কবেন। পদ্ম ব্যানার্জি অবশ্য খেলা থেকে অবসব গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়েই ক্লাব ছেড়ে দেন, তাছাড়া অন্য কোন কারণ ছিল না। চরিত্রবান খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর খুবই সুনাম ছিল, বাস্তবিক পদ্ম ব্যানার্জীর মত এমন সরল অমায়িক ও নির্ম্মল চবিত্র খেলোয়াড় খুব কমই দেখা যায়। বাঙ্গালোর থেকে লক্ষ্মীনারায়ণ আসবার সময় কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে এলেন তন্মধ্যে রোভার্স কাপ বিজয়ী বাঙ্গলোর মুসলিম টীমের গোলবক্ষক কাদের ভেলু ও সোমানা নামে একটি সুদর্শন বালকও ছিল। উক্ত সোমানার কলকাতা আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পড়াশুনা কবা এবং খেলাটা ছিল গৌণ। পরে অবশ্য খেলাটাই মুখ্য, পড়াটা গৌণ হয়ে দাঁড়ায় পরে তিনি বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছিলেন বটে কিন্তু তার পূর্ব্বেই বিখ্যাত সেণ্টার ফরোয়ার্ডরূপে তিনি সু-প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন, যাক্ সে কথা অবশ্য পরে বলা হবে। আরও কযেকটি নবাগত খেলোয়াড়ও টীমে যোগদান করে যথা— গণেশ ঘোষ; সুবোধ দত্ত (রাইট আউট) সুহাস চ্যাটার্জি (ইনসাইড)

প্রভৃতি --। এদিকে লেফটইন মজিদ ও পাখী সেন ক্লাব পরিত্যাগ করেন। মজিদ ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্ত এই ক্লাবে অত্যন্ত দরদ দিয়ে খেলে আসছিল হঠাৎ কি কারণে যে সে দল পরিত্যাগ করলো, অনেকেরই, তা হৃদয়ঙ্গম হলো না। যাবার সময় আখতার হোসেনকেও সঙ্গে নিয়ে গেল।

এতাবৎকাল আমরা যে কয়জন লেফট ইন খেলোয়াড়কে খেলতে দেখেছি কুমার, মজিদ, রহমৎ, সুনীল ঘোষ, জোসেফ, লেংচা মিত্র, আমেদ খাঁ, সত্তার, বলরাম, তন্মধ্যে মজিদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্য যে কয়জনের নাম করলাম তারাও অতি উচ্চাঙ্গের খেলা দেখিয়েছেন সত্য। আমেদ খাঁ সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, বলরাম গোলদাতা হিসাবে ও কার্য্যকরী খেলোয়াড় হিসাবে যথেষ্ট নাম করেছেন। কিন্তু খেলার উৎকর্ষতার দিক দিয়ে বিচার করলে মজিদের তুল্য কেউ নয় একথা অনস্বীকার্য্য। মজিদ যে সময় খেলেছে তখন ইউরোপীয়ানদের প্রাধান্য ছিল একথা মনে রেখে বিচার করতে হবে।

পাখী সেন ই. বি. রেলে চাকুরী পেয়ে দল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। লেফট আউট কে, প্রসাদ ও সেণ্টার ফরোয়ার্ড ডি. ব্যানার্জি এরিয়ান টীমে যোগ দেয়। লক্ষ্মীনারায়ণ যদিও দলবল নিয়ে এলেন বটে কিন্তু টীম সেট করতে তাঁকে বিষম বেগ পেতে হয়। লেফট ইনে নিধু মজুমদার সোমানা, সুহাস চ্যাটার্জীকে দিয়ে চেষ্টা করানো হলো, শেষ পর্য্যন্ত নিধু মজুমদারই টিকে গেল। নিধু মজুমদার সাধারণতঃ সেণ্টার ফরোয়ার্ড রূপেই খেলে এসেছেন, সবদিন অবশ্য তাঁকে নামানো হতো না। বৃষ্টিকাদার মাঠে তাঁর খেলা বেশ কার্য্যকরী হতো। শুকনো মাঠে তিনি সুবিধা করতে পারতেন না। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ ঠিক করলেন যে একে দিয়েই রীতিমত লেফ্‌ট ইন খেলানো হবে সেইভাবে তাকে শিক্ষিত করে তুললেন। বাস্তবিক লক্ষ্মীনারায়নের সংস্পর্শে এসে এবং তাঁরই

শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিধু মজুমদার আশ্চর্য্য রকম উন্নতি করে, যার ফলে লীগ খেলার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ই. বি. রেল দল তাঁকে দলভুক্ত করে, অবশ্য ভাল চাকুরা দিয়ে। সোমানা ১৯৩৮—৩৯ সাল পর্য্যন্ত বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারেন নি যেহেতু তাকে তখন লেফট ইন, লেফট আউট পজিসনে মাঝে মাঝে খেলতে দেওয়া হতো। পরবর্ত্তী ১৯৪০ সালে তাকে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলতে দিয়ে আশ্চর্য্য রকম ফল পাওয়া যায়। তার পরেই তিনি অতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন। সে বৎসর লেফট আউটের সমস্যা রয়েই গেল কারণ হীরা দাসের খেলাও তখন পড়তির মুখে। তবুও হীরা দাশ, সুহাস চাটার্জিকে দিয়েই কাজ চালানো হতে লাগলো। কিন্তু বাকী টিমটি বেশ শক্তিশালী ছিল। যথা গোলে কে, দত্ত, ব্যাকে প্রমোদ ও রাখাল, হাফে—অজিত নন্দী, বীরেন সেন, কমল গাঙ্গুলী, রূপ। ভট্টাচার্য্য এদের খেলা খুবই সুন্দর ও চমকপ্রদ হতে লাগলো। ফরোয়ার্ড লক্ষ্মীনারায়ণ, মুর্গেশ, নিধু মজুমদার খুবই ভাল খেলতে লাগলো। মহামেডান টিমের সঙ্গে প্রথম খেলায় ২—০ গোলে জয়লাভ করলো। সেদিন লক্ষ্মীনারায়ণ এবং মুর্গেশ গোল দেয়। খেলাটি হয়েছিল মহামেডান স্পোর্টিংয়ের নিজ মাঠে। তখন তাদের নিজ মাঠ তৈরী হয়েছিল। কিন্তু সেই খেলায় মুর্গেশ আহত হয়ে পড়ে। লীগের শেষ দিকে পুলিশ ও মহামেডানের কাছে হেরে গিয়ে চাম্পিয়ানশিপের আশা নষ্ট হয়ে যায়। ৪র্থ স্থান অধিকার করে। শেষ পর্য্যন্ত লীগ খেলায় মহামেডান ও কাষ্টমস টিম সমান সমান পয়েন্টে প্রথম হয় কিন্তু মীমাংসার জন্য পুনরায় খেলা হয়, সেই খেলায় মোহামেডান ১—০ গোলে কাষ্টমস্‌কে হারিয়ে দিয়ে মহামেডানই চ্যাম্পিয়ানশিপ দখল করে। শীল্ডে ইস্টবেঙ্গল সুবিধা করতে পারেন নি শীল্ড পায় ইষ্ট ইয়র্কসায়ার রেজিমেণ্ট টিম। মোহামেডানকে ২—০ গোলে ফাইনালে পরাজিত করে। ইষ্ট ইয়র্ক টিমের গোলরক্ষক পটার সাহেবের জন্যই তারা শীল্ড জয় করে, এ কথা অত্যুক্তি নয়

যেহেতু পটারের মত গোলরক্ষক কলকাতার মাঠে খুব কমই দেখা গেছে। যাঁরা তাঁর খেলা দেখেছেন তাঁর জীবনে কোনদিন ভুলতে পারবেন—না, একথা ঠিক।

১৯৩৮ সালে অষ্ট্রেলিয়া ফুটবল এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে আই. এফ. এ. কর্তৃক একটি বাছাই ফুটবল টিম অষ্ট্রেলিয়া খেলতে যায়। সেই বাছাই টিমে ইস্টবেঙ্গল টিমের পক্ষ থেকে কে, দত্ত (গোলকীপার) পি, দাশগুপ্ত ( ব্যাক ) অজিত নন্দী ( রাইট হাফ ) বীরেন সেন ( সেণ্টার হাফ ) এই চারজন যোগদান করেন এবং যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন।

১৯৩৮ সালে টিমে যাঁরা খেলেছিলেন—

গোলে--কে, দত্ত, কাদের ভলু।

ব্যাকে—প্রমোদ দাশগুপ্ত ( অধিনায়ক ), রাখাল মজুমদার, বসন্ত বাগচী।

হাফব্যাক—অজিত নন্দী, বীরেন সেন, কমল গাঙ্গুলী, রূপা ভট্টাচার্য, রমেন সেন, খগেন সেন, যামিনী ব্যানার্জি।

ফরোয়ার্ড—গণেশ ঘোষ, সুবোধ দত্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ, মুর্গেশ, সোমানা, করিম, নিধু মজুমদার, সুহাস চ্যাটার্জী, হীরাদাস প্রভৃতি।

১৯৩৯ সালে ইস্টবেঙ্গল টিমে আবার কতক অদল বদল হলো। গোলরক্ষক কে, দত্ত, পুনরায় মোহনবাগানে চলে গেল। দুজন নবাগত গোলরক্ষক আমদানী হলো। একজন কুমারটুলীর গোল-রক্ষক ডি, সেন, ( ধনদারঞ্জন সেন ) অপর ভবানীপুর টীমের টি, দত্ত। টি, দত্তকেই সিনিয়র গোলরক্ষক হিসাবে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু ডি, সেন-কে প্রথম কয়েকটি গেমে সুযোগ দিয়ে পরে আর তাকে বসানো গেল না, ক্রমাগতই খেলতে লাগলো। টি, দত্ত- বসে রইল। ডি, সেন দেখতে খুব সুন্দর চেহারা ছিল অনেকে মনে করতো যে বোধ হয় খৃষ্টান ফিরিঙ্গী সাহেবদের ছেলে হবে কিন্তু তা নয়। এর বাবা ছিলেন

ফরিদপুর জেলার অধিবাসী এবং একজন খ্যাতনামা কবিরাজ। তিনি শোভাবাজারেই থাকতেন। উক্ত ডি, সেন বা ধনদারঞ্জন তাঁর মধ্যন-পুত্র পরবর্ত্তীকালে ডি, সেন খ্যাতিমান গোলরক্ষক হয়েছিলেন। আরও কয়েকজন খেলোয়াড় টীমে যোগদিল, যথাক্রমে, ভবানীপুরের খ্যাত-নামা হাফব্যাক এন, গুহ (বেবী), গিয়াসুদ্দিন, রাইট আউট সাজাহান, কাদের, হাওড়া ইউনিয়ন থেকে আমিন (ব্যাক, হাফব্যাক খেলোয়াড়) রবার্ট হাডসন টীমের ফরোয়ার্ড নায়ার। জলপাইগুড়ী থেকে মোজাম্মেল নামে একটি সুদর্শন অল্প বয়স্ক ব্যাকও খেলতে এলো। এই মোজাম্মেল জলপাইগুড়িতে বেশ খ্যাতিমান খেলোয়াড় ছিল এবং ইস্টবেঙ্গলে খেলেও বেশ সুনাম অর্জন কবে গেছে। রবার্ট হাডসন টীমেব নায়ার খুবই কার্যকরি খেলোয়াড় ছিল, তার একটা মস্ত গুণ ছিল এই যে সমস্ত পজিসনেই সে খেলতে পাবতো এবং উত্তম রূপেই খেলতো। তবে ফরোয়ার্ড পজিসনেই সে বেশীর ভাগ খেলতো। সে বৎসর তাকে লেফট আউট পজিসনে খেলবার জন্যেই নেওয়া হয়ে-ছিল। যাই হউক লীগের খেলা আরম্ভ হলো, মোহামেডান, ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান এই তিন টীমই লীগ প্রতিযোগিতায় সমানতালে এগিয়ে চললো তন্মধ্যে মোহনবাগান সমধিক উৎকর্ষতা দেখাতে লাগলো, কিন্তু দেখা গেল যে রেফারীদের অনুগ্রহটা বেশীর ভাগ মোহনবাগান টীমের উপর বর্ষিত হচ্ছে। রেফারীদের ব্যবহারে দর্শক সাধাবণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়লো। সে সব কথা এখন আর বিস্তারিতভাবে লিখে কি হবে, তখনকার সাময়িক পত্রিকাগুলিই তাব সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। খারাপ রেফারিংয়ের জন্য প্রায় সব টীমই ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগলো কিন্তু মোহনবাগান টীম বেশ লাভবান হতে থাকলো। তা'ছাড়া আই.এফ.এ. কমিটি ও তৎকালীন আই.এফ এ.র প্রেসিডেণ্ট নিকলস্ সাহেব ( ইনি ক্যালকাটা টীমের একজন খেলোয়াড় ছিলেন ) আই. এফ. এ.র পরিচালনা সম্বন্ধে নানারূপ ত্রুটিবিচ্যুতি দেখাতে লাগলেন। এইসব নানাকারণে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে লীগের অন্তর্গত ৪টি টীম এক-

যোগে আই. এফ. এ.কে বয়কট করলো, অর্থাৎ খেলা ছেড়ে দিলোও আই, এফ. এ থেকে নাম প্রত্যাহার করলেন। উক্ত ৪টি টীম যথা-ক্রমে মোহামেডান স্পোর্টিং, ইস্টবেঙ্গল, কালীঘাট এবং এরিয়ান। এরিয়ান টিম আবার কয়েক দিন বাদে পুনরায় আই. এফ. এ.র সঙ্গে যোগ দেয়, বাকী তিনটি টিম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আই. এফ. এ.কে বর্জন করে। উপরোক্ত তিনটি টিম খেলা ছেড়ে দেওয়ায় মাঠ একরকম ফাঁকা হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান লীগ চাম্পিয়ান শিপ লাভ করে। শীল্ডের খেলাও কোনরকমে নিয়মরক্ষা গোছের হল। ফাইনালে পুলিশ টীম কাস্টমস টীমকে ২—১ গোলে হারিয়ে আই. এফ. এ. শীল্ড জয় করে। কোন রকমে আই.এফ. এ.র বাকী টুর্নামেণ্টগুলিও শেষ হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে লীগের প্রথম খেলায় ইষ্টবেঙ্গল মোহামেডান টীমকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। নায়ার লেফট আউটে খেলে উক্ত দুইটি গোল করে। সেইদিন খেলায় মুর্গেশ গুরুতর ভাবে আহত হয়। মোহা-মেডান টীমের রাইট হাফ রসিদ খাঁ মুর্গেশকে মারাত্মকভাবে পায়ে আঘাত করে। এদিকে উক্ত তিনটি ক্লাবের চেষ্টা ও উদ্যোগে নূতন একটি ফুটবল এসোসিয়েসন গড়ে উঠে। উহার নাম হয় বি. এফ. এ. বা বেঙ্গল ফুটবল এসোসিয়েসন। ইহা একটি বেশ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠে এবং বাংলার তদানীন্তন অতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ উক্ত এসোসিয়েসন পরিচালনার ভার নেন। প্রথম সভাপতি হলেন মাননীয় নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় ( তৎকালীন অর্থমন্ত্রী), যুগ্ম সম্পাদক হলেন কে. নূরউদ্দিন ( ব্যারিষ্টার ) ও পি. কে. সেন ( ব্যারিষ্টার )। কার্য্যকরী সমিতিতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা মনস্থ করলেন যে একটি বড় রকম নক আউট টুর্নামেণ্ট খেলার ব্যবস্থা করবেন। পরিকল্পনা রচিত হল এবং পরিকল্পনা মত কাজও বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললো। নূতন টুর্ণামেণ্টের নাম দেওয়া হলো ব্রেবোর্ণ কাপ। ৫৮টি টীম টুর্ণামেণ্টে খেলবার জন্য আবেদন করে।

ছাড়বাদ দিয়ে ৪৬টি টীম নিয়ে খেলা আরম্ভ হয়। সুদূর সিংহল থেকে একটি শক্তিশালী টীম উক্ত টুর্ণামেণ্টে যোগ দেয়। বেশ সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনা হতে থাকে। সেমিফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গল টীমের সঙ্গে সিংহল একাদশের খেলা পড়ে। সিংহল ইস্টবেঙ্গল টীমের কাছে পরাজিত হয়, কিন্তু খেলার তীব্র প্রতিতোগিতা হয় এবং ভাল খেলা হয়। খেলাটি দুইদিন হয়েছিল। প্রথম দিন ৪- ১ গোলে সিংহল দল পরাজয় বরণ করে, কিন্তু কি একটা বিষয়ে তারা প্রতিবাদ জানায়। পরেরদিনে পুনরায় খেলা হয়। সেদিনও তারা ৪—০ গোলে পরাজিত হয়। ফাইনালে মোহামেডান ও ইস্টবেঙ্গল একটি সন্দেহ-জনক পেনাল্টী গোলে মোহামেডানের কাছে পরাজিত হতে বাধ্য হয়। দর্শক সাধারণের ধারণা ছিল যে ইস্টবেঙ্গল টীমই সমধিক শক্তিশালী সুতরাং তারাই জয়লাভ করবে, কিন্তু খেলার অপ্রত্যাশিত পরিণতি ঘটে। মোহামেডানের সেণ্টারহাফ বড় নূর মহম্মদ উক্ত পেনাল্টী গোল করেন। বি. এফ. এ. গঠিত হওরার পর মোহন-বাগানের তরুণ উদীয়মান ব্যাক পরিতোষ চক্রবর্ত্তী ইস্টবেঙ্গল টিমে খেলতে আসেন। কালীঘাট টিমের জোসেফ, ‘রিয়ান টীম থেকে সেণ্টার ফরোয়ার্ড ডি. ব্যানার্জি ও লেফট আউট কে. প্রসাদও ইস্টবেঙ্গলে যোগদেন, সুতরাং ইস্টবেঙ্গল খুবই শক্তিশালী হয়েছিল। একথা ঠিক, কিন্তু ভাগ্যদেবীর অকৃপায় ফাইনালে তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেদিন লক্ষ্মীনারায়ণ খেলায় সুবিধা করতে পারেন নি, যেহেতু সিংহলের সঙ্গে খেলায় তিনি পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন; সেই আঘাত নিয়েই তিনি খেলায় যোগ দেন, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারেন নি। তাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়েছিল শক্তিশালী সিংহল একাদশের সঙ্গে খেলাতেই। ফাইনালে টিম ছিল এইরূপ—

ইষ্টবেঙ্গল—ডি. সেন, প্রমোদ দাশগুপ্ত ( অধিনায়ক ), পি. চক্রবর্ত্তী, অজিত নন্দী, এন. গুহ. গিয়াসুদ্দিন, সাজাহান, লক্ষ্মীনারায়ণ, ডি, ব্যানার্জি, জোসেফ, কে. প্রসাদ।

মোহামেডান—ওসমান, সিরাজুদ্দিন, জুম্মা খাঁ, বাচ্চি খাঁ, নূর মহম্মদ ( বড় ), মাসুম, নূর মহম্মদ ( ছোট ), রহিম. মহীউদ্দিন, সাবু, আব্বাস, ( অধিনায়ক )।

যাই হউক খেলা এভাবেই শেষ হলো। ত্রেবোর্ণ কাপ মোহামেডানের হস্তগত হল। উক্ত সুদৃশ্য ও বিরাট কাপটি হ্যামিল্টন কোং থেকে কিনে দিয়ে ছিলেন রায় বাহাদুর গুনেন্দ্রকৃষ্ণ রায়। ইনি ভাগ্যকুলের বিখ্যাত ধণী ও জমীদাব বংশীয়। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ইনি ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন বহুদিন।

১৯৩৯ সালের টিমে যাঁরা খেলেছেন।

গোলে—ডি, সেন, টি, দত্ত. পি দাশ

ব্যাক—পি, দাশগুপ্ত, আর, মজুমদার, মোজাম্মেল, বসন্ত বাকচী ( পি, চক্রবর্ত্তি )

হাফ—অজিত নন্দী, এস, গুহ, গিযাসুদ্দিন, খগেনসেন, আমিন

ফরোয়াড—সাজাহান, লক্ষীনারায়ন, মুর্গেশ, সুহাস চাটার্জি, নায়ার, করিম, কাদের, সোমানা, পরেশ মুখার্জি মহম্মদ জং, হীরাদাস ( ডি, ব্যানার্জি, জোসেফ, কে, প্রসাদ, )

১৯৪০ সালে আই. এফ. এ. কর্ত্তৃপক্ষ বি. এফ. এ. কমিটীর সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত আপোষ করতে বাধ্য হয় এবং নানা রকম আইন রদ বদল হয়। বি. এফ. এ. কমিটীর মাননীয় সভাপতি নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় আই. এফ. এ.র কর্ম্মকর্ত্তাদের অনমনীয় মনোভাবকে একেবারে ধূলিসাৎ করে ছেড়ে দিলেন। নিকলস্ সাহেব পদত্যাগ করে রেহাই পেলেন। তারপর পুনরায় আই. এফ. এ. মহমেডান, ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাট টীমকে সসম্মানে গ্রহণ করে। বি. এফ. এ. কমিটী ভেঙ্গে দেওয়া হয়। আই. এফ. এ.র খেলা পুনরারম্ভ হয়। সে বৎসর ইষ্টবেঙ্গল টীমে কয়েকজন নবাগত খেলোয়াড় যোগদান করে;

তাদের মধ্যে কেহই খ্যাতনামা ছিল না। সুনীল ঘোষ, আবু গাঙ্গুলী, আলি হোসেন, আবুল হাসান, আলাউদ্দিন, নরেশ বসু প্রভৃতি। সুনীল ঘোষ পরবর্ত্তীকালে খুবই সুনাম অর্জন করে। গত বৎসরের বি. এফ. এ.র খেলায় যোগদানকারী পি. চক্রবর্ত্তী, জোসেফ, ডি. ব্যানার্জী, কে. প্রসাদ এঁরা সকলেই পূর্ব্বটীমে ফিরে যান।

এই বৎসর ফুটবল সেকসনের ভার নিলেন পূর্ব্বতন প্রখ্যাত খেলোয়াড় হারান সাহা। তাঁর চেষ্টায় টীমের অনেকটা সুপরিবর্ত্তন দেখা দেয়।

লীগ খেলা আরম্ভ হলো। লক্ষ্মীনারায়ণ বাঙ্গালোর থেকে নান জুপ্পা নামক একটী সেণ্টার ফরোয়ার্ড খেলোয়াড় নিয়ে লীগের কয়েকটী গেম হয়ে যাওয়ার পর এলেন। মুর্গেশ আর খেলতে এলেন না। করিম মোহামেডানে যোগ দিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ যেদিন এসে পৌঁছালেন তার পর দিন মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা। টীম হলো এইরূপ, গোলে—ডি. সেন, ব্যাকে - প্রমোদ দাসগুপ্ত ও রাখাল মজুমদার, হাফব্যাকে—অজিত নন্দী, এন. গুহ, গিয়াসউদ্দিন, ফরয়ার্ডে--সাজাহান, লক্ষ্মীনারারণ, সোমানা; আবুল হাসান ও আবু গাঙ্গুলী। মোহনবাগান :—গোলে—কে. দত্ত, ব্যাকে—তারক চৌধুরী, পরিতোষ চক্রবর্ত্তী, হাফ ব্যাকে অনিল দে, এস. পরামাণিক, নিলু মুখার্জি, ফরওয়ার্ডে—মানা দুই, জিতেন ঘোষ, নন্দ রায় চৌধুরী, লেংচা মিত্র ও সতু চৌধুরী। তুলনায় মোহনবাগান টিম খুবই শক্তিশালী ছিল, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ফল হলো অন্যরূপ। লক্ষ্মী-নারায়ণ দূর থেকে লম্বা এক সট করে কে. দত্তকে পরাভূত করলেন। শেষ পর্যন্ত ঐ এক গোলেই খেলার পরিসমাপ্তি ঘটলো। লীগের শেষ দিকে লক্ষ্মীনারায়ণকে আইনের প্যাঁচে ফেলে খেলতে দিলেন না। তাতে টিম দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, লীগে আর সুবিধা করতে পারেনি—তৃতীয় স্থানাধিকারী হয়। মোহামেডান টিম লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়, মোহনবাগান হয় 'রানার্স'। সে বৎসর আই.এফ.এ. শীল্ডের ইতিহাসে

ইহাই প্রথম যে দুইটি ভারতীয় টীম শীল্ড ফাইনাল খেলে। মোহন-বাগানের চাইতে অপেক্ষাকৃত পুরাতন টীম এরিয়ান কিন্তু সে খেলায় তারা অভূত পূর্ব্ব সাফল্য লাভ করে। সমধিক শক্তিশালী মোহন-বাগানকে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ৪—১ গোলে। এরিয়ান টীমের শক্তির উৎস ছিল তাদের রাইট আউট এবং অধিনায়ক নির্ম্মল ঘোষ। তাঁর চেষ্টাতেই এরূপ অঘটন সম্ভব হয়েছিল। যাই হক খেলা শেষে মোহনবাগানের সমর্থকবৃন্দ তাদের গোল রক্ষক কে. দত্ত এবং ব্যাক পি. চক্রবর্ত্তীকে অপবাদ ও অপযশের ভাগী করে নিরর্থক লাঞ্ছিত করেন। উগ্র সমর্থক যারা তাদের কথা না হয় বাদই দেওয়া যায়, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যেও উক্ত মনোভাব প্রবলভাবে আলোড়িত হয়। সেই কারণ উক্ত দুইজন খেলোয়াড় চিরদিনের জন্য উক্ত ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

১৯৪০ সালে ইষ্টবেঙ্গল টিম দুইটি জুনিয়ার ট্রফি জয় করে। ইতিপূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯২৪ সালের পর আর কোন জুনিয়ার ট্রফি লাভ করতে পারেনি তার কারণ ইষ্টবেঙ্গল টিমের জুনিয়ার খেলোয়াড়গণ তেমন শক্তিশালী ছিল না—তা'ছাড়া ভাগ্যবিপর্য্যয়েও কতকটা নিরাশ হতে হয়েছে। ১৯৩৬ সালে কমপক্ষে ৬।৭টি জুনিয়র ট্রফির ফাইনাল পর্য্যন্ত খেলেছে, কিন্তু একটিও জয় করতে পারেনি অন্যান্য বৎসরেও প্রায় কাছাকাছি এগিয়েও যার তার কাছে হেরে যেতে হয়েছে। যাই হউক ১৯৪০ সালে ট্রফি লাভের আনন্দ কিছুটা পাওয়া গেল। প্রথমে পাওয়ার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়। তারপর লেডী হার্ডিঞ্জ শীল্ডও জয় করে।

পাওয়ার লীগে সর্বসাকুল্যে ১৮টি টিম খেলেছিল। প্রত্যেক টিমের ১৭টি খেলা হয়। ইষ্টবেঙ্গল ১৫টি জয় ১টি ড্র ১টি পরাজয়ে ৩১ পয়েন্টে চ্যাম্পিয়ানশিপ পায় ও রানার্স হয় ই. বি. আর ২৬ পয়েন্ট পেয়ে। মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার উক্ত পাওয়ার লীগ-বিজয়ে ইষ্টবেঙ্গলের পক্ষে যথেষ্ট কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়েছিলেন।

লেডী হার্ডিঞ্জ শীল্ড খেলার ফাইনালে রবার্ট হাডসন টিমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। তখন রবার্ট হাডসন টিমের নাম জুনিয়ার মহলে ভীতি উৎপাদন করতো। কারণ রবার্ট হাডসন জুনিয়াব টিম হলেও বেশ শক্তিশালী ছিল এবং খেলাতেও তাদের বেশ উৎকর্ষতা ছিল। প্রায় জুনিয়াব ট্রফিই তারা করায়ত্ত্ব করতো। এই প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালেও রবার্ট হার্টসন মোহনবাগান টিমকে ২—০ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল সেইজন্য ইষ্টবেঙ্গল ফাইনালে যথাসম্ভব ভাল টিম দিয়েছিল।

ইষ্টবেঙ্গল—এস. বোস, পি. দাশগুপ্ত, নরেশ বসু, অজিত নন্দী, খগেন সেন গিয়াসুদ্দিন, ডুলাল, সুনাল ঘোষ, আলী হোসেন, সোমানা ও আবু গাঙ্গুলী।

রবার্ট হাডসন—ছোটেলাল (ছোট), মথুরা প্রসাদ, এন. দাশগুপ্ত, কালু, সোলেমান ও মহাবীর, হোসেনী, ছোটেলাল (বড়), সেলিম, নায়ার, এন. সরকার।

৩—১ গোলে রবার্ট হাডসনকে হারিয়ে ইষ্টবেঙ্গল ট্রাফ লাভ করে। ইষ্টবেঙ্গল পক্ষে গোল দিয়েছিল আলী হোসেন ২টী ও সোমানা ১টী। ববার্ট হাডসন পক্ষে নায়ার গোল করেছিল। রেফারী ছিলেন সি. এস. এম টেলর সাহেব যিনি আই. এফ. এ. শীল্ড ফাইনালেও রেফারী ছিলেন।

১৯৪০ সালের টিমের খেলোয়াড়গণ

গোলে—ডি, সেন, সুধীর বসু

ব্যাক - পি, দাশগুপ্ত, (অধিনায়ক) আর, মজুমদার, বি, বাকচী, নরেশ বসু, মোজাম্মেল

হাফ—অজিত নন্দী, এন, গুহ, গিয়াসুদ্দিন, খগেন সেন, জে, সাহা, বি, ব্যানার্জি

ফরোয়ার্ড- সাজাহান, লক্ষীনারায়ন, কাদের, সোমানা, সুনীল ঘোষ, নানজুণ্ডা, আলী হোসেন, আবুল হাসন, আবু গাঙ্গুলী, এস, মুখার্জি, আলাউদ্দিন, ডুলাল

এবার লক্ষ্মীনারায়ণের সম্বন্ধে কিছু লেখা যাক। ১৯৪০ সালে লীগের শেষ দিকে আই. এফ. এ. কমিটী আইনের প্যাঁচে ফেলে লক্ষ্মীনারায়ণকে আর খেলতে দিলেন না, তিনি ক্লাব থেকে চিরবিদায় নিলেন। অবশ্য পরের বৎসর ১৯৪১ সালে তিনি ও মুর্গেশ কলকাতায় এসেছিলেন বটে, কিন্তু আই. এফ. এ. সংশ্লিষ্ট কোন খেলায় যোগ দেননি। বিদায় নেওয়ার পূর্ব্বে লক্ষ্মীনারায়ণ একটী খেলোয়াড়কে তৈরী করে দিয়ে গিয়েছিলেন—সেই খেলোয়াড়টী হচ্ছে সুনীল ঘোষ। সুনীল প্রথমে রাইট ইন পর্য্যায়ে খেলতো, কিন্তু ইষ্টবেঙ্গলে যোগদান করে রাইট ইন খেলার সুবিধা পেলনা যেহেতু লক্ষ্মীনারায়ণ তখন রাইটইন খেলছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ সুনীলকে লেফটইনে খেলবার সুযোগ দিলেন এবং উক্ত পজিসনেই তাকে পাকা-পোক্ত ভাবে তৈরী করলেন। পরবর্ত্তীকালে সুনীল লেফট ইন পজিসনেই তার খেলার উৎকর্ষতা দেখিয়ে জনসাধারণ ও ক্রীড়ামোদীদিগকে মুগ্ধ করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ নিজে যেমন উৎকৃষ্ট মনোমুগ্ধকর খেলা খেলতেন, তেমনি খেলোয়াড় তৈরী করাও তাঁর একটি বিশেষত্ব ছিল। তিনি বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের মধ্যেও কয়েকজনকে রীতিমত উৎকৃষ্ট পর্য্যয়ের খেলা শিখিয়ে তৈরী করে দিয়ে গিয়েছিলেন—তন্মধ্যে নিধু মজুমদার, ডি. ব্যানার্জি, সুনীল ঘোষ, সাজাহান প্রভৃতির নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তা ছাড়া বাঙ্গালোরেও তিনি অনেক ছাত্র তৈরী করেছেন তন্মধ্যে বিখ্যাত হয়েছেন যাঁরা, কলকাতায় বা সারা ভারতেও যথেষ্ট নাম করেছেন। তাঁরা হলেন ভেঙ্কটেশ, রমন, বজ্রভেলু, সাম্পাঙ্গী, স্বামীনাথন, সোমানা প্রভৃতি। লক্ষ্মীনারায়ণের গুণের কথা বর্ণনাতীত। কেবল এইটুকু জানাচ্ছি যে লক্ষ্মীনারায়ণ আই. এফ. এ.র সুনাম রক্ষার জন্য আফ্রিকাতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি যথেষ্ট করেছেন। তা'ছাড়া কলকাতায়ও আই.এফ.এ. টীমের হয়ে বহু প্রতিতোগিতায় খেলেছেন এবং প্রাণপণ চেষ্টায় সুনাম রক্ষা করেছেন, তথাপি আই. এফ. এ. কর্ত্তৃপক্ষ এমন একজন খেলোয়াড়কে নির্য্যাতন করতে কসুর করেন নি,

অথচ লক্ষ্মীনারায়ণের এমন কোন দোষ ছিল না। এক্ষেত্রে লক্ষ্মী-নারায়ণের বিশেষ কিছুই হয় নি, তিনিও খেলা থেকে অবসর নিতেনই, কিন্তু মাঝখান থেকে আই. এফ. এ. কর্ত্তৃপক্ষেরই বদনাম হলো চির-দিনের জন্য। লক্ষ্মীনরায়ণের মত এমন আদর্শ চরিত্রবান উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের খেলোয়াড় সারা ভারতে দুর্লভ। তিনি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে মনে প্রাণে ভালবাসতেন, এখনও তিনি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড় বলেই নিজের পরিচয় দিযে থাকেন।

১৯৪০ সলের লীগ ও শীল্ড খেলা হয়ে যাওয়ার পর চন্দননগরে একটী প্রদর্শনী খেলায় ইস্টবেঙ্গল ও ক্যালকাটা টীমের মধ্যে প্রতি-যোগিতা হয়। সেই খেলায় লক্ষ্মীনারায়ণ যোগদান করেন। উক্ত খেলায় ৩—১ গোলে ইষ্টবেঙ্গল জয়ী হয়; লক্ষ্মীনারায়ণ, নানজুণ্ডা ও আবু গাঙ্গুলী ইষ্টবেঙ্গল পক্ষে গোল করেন। লক্ষ্মীনারায়ণের ইহাই এখানকার শেষ খেলা।

১৯৪১ সাল থেকেই ইষ্টবেঙ্গল টীমের গৌরব-অধ্যায়ের সূচনা হয়, যদিও সেই বৎসরই চ্যাম্পিয়ানশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু প্রথম দিকের খেলায় টীমটি পুরোপুরি সেট হয় নি, সেইজন্যে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সে বৎসর টীমে খেলেছিলেন গোলে কে. দত্ত, ব্যাকে—প্রমোদ, রাখাল, মোজাম্মেল, বসন্ত বাগচী, নিলু গুহ; হাফে—অজিত নন্দী ( অধিনায়ক ), আমিন, গিয়াসুদ্দিন, এন. গুহ, খগেন সেন, ধীরেন দাস; ফরোয়ার্ডে—আলীহোসেন, আপ্পারাও, উষা দাশগুপ্ত, সুহাস চ্যাটার্জি আবু গাঙ্গুলী, রামালু, টবি বসু, সোমানা, সুনীল ঘোষ।

সে বৎসর কে. দত্ত পুনরায় মোহনবাগান থেকে ইষ্টবেঙ্গলে এসে যোগ দেয়—কালীঘাট টীম থেকে আপ্পারাও ও রামালু এসে যোগ দেয়। এই আপ্পারাওয়ের যোগদান এই ক্লাবের একটা বিশিষ্ট সম্পদ-লাভ বলতে হবে। যদিও এই ক্লাবে সূর্য চক্রবর্ত্তী ও লক্ষ্মীনারায়ণ ( সমগ্র ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাইট ইন পর্যায়ের খেলোয়াড় ছিলেন )

এই ক্লাবেই খেলেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা কোন ট্রফি জয় করতে পারেন-নি, কারণ টীমের মধ্যে তখন কিছু কিছু ত্রুটী ছিল অর্থাৎ সমস্ত খেলোয়াড় উচ্চাঙ্গের ছিল না। আপ্পারাওয়ের যোগদানের পরও যে নিখুঁত টীম ছিল, একথা বলা চলে না. তথাপি টীমওয়ার্ক অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে টীমটি সুষ্ঠু পরিচালনার ফলে জয়ের পথ সুগম হয়ে উঠে। সেই জয়ের পথের সুচনা ১৯৪১ সাল থেকেই হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নাই। সে বৎসরও লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ পায় মোহামেডান এবং রানার্স হয় ইষ্টবেঙ্গল কিন্তু তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা হয়। সে বৎসরও মোহনবাগান লীগে ২ বার ইষ্টবেঙ্গলের কাছে পরাজয় বরণ করে। লীগের শেষ খেলায় মোহামেডান ৩—২ গোলে ইষ্টবেঙ্গলের কাছে হার স্বীকার করে এবং ইহাই তাহাদের লীগের একমাত্র পরাজয়। শীল্ডে ইষ্টবেঙ্গল ৪র্থ রাউণ্ডে এরিয়ান টীমের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে ১—০ গোলে হেরে যায়। সেই খেলায় বিখ্যাত ওসমান ছিল এরিয়ানের গোলরক্ষক। সুনীল, সোমানা ও আপ্পারাওয়ের আক্রমণ ও গোলে অজস্র পরিমাণে সটের উপর সট মারা কোনটাই কার্যকরী হয়নি। ওসমান অতিকষ্টে সমস্ত সট প্রতিহত করেছিল। কতকটা ভাগ্যের পরিহাসও বলা চলে। যাহোক সে বৎসর থেকেই আপ্পারাও, সোমানা ও সুনীল ঘোষ এই ত্রয়ীর ক্রীড়াধারা সুচারুরূপে সংঘবদ্ধ হয়। অজিত নন্দী সে বৎসর টীমের অধিনায়ক ছিলেন। সে বৎসর আই. এফ. এ. শীল্ড পেয়েছিল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। লীগ ও শীল্ড বিজয়ী হয়ে তারা ২য় বার ডাবলস্ বিজয়ী আখ্যা লাভ করে এবং শীল্ডের ফাইন্যালে কে. ও. এস. বি. ( কিংস ওন সাউথ ওয়েলস্ বর্ডারার্স ) গোরা রেজিমেণ্ট টীমকে ২ ০ গোলে পরাজিত করে। তারপর আর কোন গোরা রেজিমেণ্টাল টীম আই.এফ.এ. শীল্ড প্রতি-যোগিতার ফাইন্যালে খেলবার সুযোগ পায়নি। এমন কি তারপর আর তেমন কোন শক্তিশালী মিলিটারী টীম আই. এফ. এ. শীল্ডে যোগদানও করেনি। তাছাড়া এর পর কয়েক বৎসর মধ্যে তাদের

এখানকার পাটই উঠে গেল। ১৯৪৩ সালে পুলিশ টীম আই.এফ.এ. শীল্ড ফাইনাল খেলেছিল এবং তারা ইয়োরোপীয়ান বলে দাবীও করে থাকে এ কথা ঠিক, এর পর আর সাহেব টীম কেউই আই. এফ এ. শীল্ড খেলায় সুবিধা করে উঠতে পারেনি।

১৯৪২ সাল। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। ১৯৪২ সালেই ক্লাব আই. এফ. এ.র প্রথম বিভাগীয় লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে এবং আই. এফ. এ. শীল্ডের 'রানার্স আপ'ও পায়। আই. এফ. এ. শীল্ডও পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রায় ষোলআনা রকম, কিন্তু ভাগ্যদেবীর অকৃপায় সে আশা পূর্ণ হয় নি। তবে কোচবিহার কাপ ও কাঁচরাপাড়া গিরিজা শীল্ড লাভ করেছিল। খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষ ক্লাব সদস্য বা সাধারণ ক্রীড়ামোদী দর্শকদের মনে এরূপ আশা ছিল না। সে বৎসর ইষ্টবেঙ্গল টীম যে খুব শক্তিশালী হবে এরূপ ধারণা খেলার পূর্ব্বে কেহই করতে পারেনি।

সেই বৎসর খেলোয়াড় অদল বদলের দিন দেখা গেল যে গত বৎসবের চারজন সেরা খেলোয়াড় ক্লাব থেকে বিদায় নিয়েছে এবং ভবানীপুর টীমে তারা যোগদান করেছে। সেই চারজন খেলোয়াড় হল গোল রক্ষক--কে. দত্ত, রাইট হাফ—অজিত নন্দী, সেণ্টার হাফ—এন. গুহ, (বেবী) ও লেফট আউট—আবু গাঙ্গুলী। এই চারজন খেলোয়াড়ের একসঙ্গে ক্লাব ছেড়ে দেওয়ার একটা কারণ ঘটেছিল। মূল কারণ ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী পরিবর্ত্তন। দীর্ঘ ১৫ বৎসর একাদিক্রমে ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন বনোয়ারী লাল রায়। এ বৎসব তিনি বাতিল। এই কারণেই উক্ত চারজন খেলোয়াড় ক্লাব ছেড়ে দিয়ে গেলেন। ১৯৪২ সালে ক্লাবের কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট সদস্যের মনে হলো যে একজন নূতন সেক্রেটারী করে দেখা যাক কি রকম ফল হয়। সেই উদ্দেশ্যেই একজন বিশিষ্ট লোককে নূতন সেক্রেটারী নিয়োগ করা হয়।

তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল ব্যারিষ্টার এ. কে. বসু। (শ্রী অমিয় কুমার বসু), খেলাধুলায় তিনি বিশেষ উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি আই, এফ. এ.র লীগ কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। অবশ্য এই পরিবর্ত্তনে ক্লাব লাভবান হয়েছিল একথা বলা চলে, যেহেতু সেই বৎসর ক্লাব লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ ও শীল্ডের রানার্সআপ হয়। কিন্তু নূতন সেক্রেটারী ক্লাবে যোগদান করে বিশেষ কোন কার্যকরী শক্তি প্রয়োগ করেন নি একথাও ঠিক। তবে তাঁর ভাগ্যের জোরেই হোক আর খেলোয়াড়দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়ই হোক ক্লাব যে লাভবান হলো তাতে আর কোন কথা নাই। ক্লাবের অধিকাংশ সদস্য ও সমর্থকবৃন্দের মধ্যে আবার অন্য রকম জল্পনা হয়েছিল—যথা অধিনায়ক নির্ব্বাচন নিয়ে। নূতন অধিনায়ক সোমানাই যে এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের মূল কারণ ইহাই অধিকাংশ লোকের ধারণা ছিল। তবে কর্ম্মকর্ত্তাগণের মধ্যে এসিস্টেণ্ট সেক্রেটারী শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র গুহ, কোষাধ্যক্ষ শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সেনগুপ্ত, ফুটবল সেক্রেটারী সুধীর সেন, গ্রাউণ্ড সেক্রেটারী শ্রীরমণীরঞ্জন ঘোষ ওরফে শ্যামদা ও কর্ম্মকারক শ্রীমাখনলাল গোস্বামীর অক্লান্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয় হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তৎসঙ্গে এই কয়জনের নামও করা যায়, যথা—শ্রীঅমিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত, স্বর্গীয় জিতু মুখার্জি, শ্রীগিরীন ঘোষ দস্তিদার, কে. ডি. ব্যানার্জি ও শ্রীপরেশ দাশগুপ্ত। এঁরাও তখন ক্লাবের জন্য মাথা ঘামিয়েছেন যথেষ্ট।

যে সকল খেলোয়াড় নূতন আমদানী হলো তাঁরা যথাক্রমে পরিতোষ চক্রবর্ত্তী, (ব্যাক) নীহার মিত্র ও অমিতাভ মুখার্জি, (গোলকীপার) নগেন রায়, (হাফব্যাক) কৃষ্ণ রাও, ফটিক সিংহ, অসীম ব্যানার্জী (বিরলা), রবি দে, সন্তোষ দত্ত (সানু) (ফরোয়ার্ড)। আর একজন খেলোয়াড় সেই বৎসরেই ক্লাবে যোগ

দান করেছিলেন তাঁর নাম অবিস্মরণীয়। তিনি হচ্ছেন বর্ম্মার সুবিখ্যাত ফরোয়ার্ড ফ্রেড পাগস্‌লী (F. Pugsly) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হিড়িকে পড়ে বর্ম্মা থেকে বহুলোক ভারত অভিমুখে পালিয়ে এসেছিল। পাগসলীও রেঙ্গুন থেকে সস্ত্রীক পালিয়েছিলেন। সঙ্গে শিশুপুত্র ও একটি বোঝা। পাগস্‌লী শিশুটিকে কাঁধে নিয়ে পিঠে বোঝা নিয়ে—পাহাড পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে ৫০০ মাইল হেঁটে ভারতে এসে হাজির হন। তারপর কলকাতায় এসেই ইষ্টবেঙ্গল তাঁবুতে একদিন সকলের সঙ্গে দেখা করেতে যান। পাগস্‌লীকে প্রায় সবাই চিনতো, কিন্তু এই বিপর্য্যয়ে তাঁর শারীরিক স্বাস্থ্য ও চেহারা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, আভ্যন্তরীণ শক্তি খুবই ব্যাহত হয়েছিল, তথাপি তাঁকে অনেকেই চিনে ফেললো ইষ্টবেঙ্গল টিম রেঙ্গুন সফবে গিয়েছে একাধিকবার বর্ম্মা টিমও কলকাতায় খেলতে এসেছে, সুতরাং পাগস্‌লী ইষ্টবেঙ্গল টিমকে খুব ভাল রকমই চিনতো। সেই পাগস্‌লী কলকাতায় এসেই ইষ্টবেঙ্গল তাবুতে দেখা-সাক্ষাতের অভিপ্রায়েই গিয়েছিল। তাছাড়া খেলা-অন্ত প্রাণ যে খেলোয়াড় সেকি চুপ করে থাকতে পারে? তার ইচ্ছা হলো যে এই খানেই খেলবো। তার সেই ইচ্ছা ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রকাশ করলো। ক্লাবকর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটু সমস্যায় পড়ে গেলেন, যেহেতু এতাবৎকাল ইষ্টবেঙ্গল টীমে কোন এংলো খেলোয়াড়দেব নেওয়া হয়নি, এখন পাগস্‌লীকে নেওয়া হবে কিনা এই সমস্যা। তা' ছাড়া এমন একজন বিখ্যাত খেলোয়াড় নিজে যেচে এসেছে অথচ তাকে অন্যটিমে ছেড়ে দেওয়াও কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত নয়। শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাকে গ্রহণ করলেন। অবশ্য সে বছর তিনি মোটেই সুবিধা করেতে পারেন নি কারণ বর্ম্মা থেকে আসবার সময় তার দেহের উপর দিয়ে যেরূপ বিপর্য্যয় গিয়েছে তাতে তার খেলার মাঠে নামাই সমীচীন হয়নি তথাপি তিনটী দিন তিনি খেলতে নেমেছিলেন। কিছুক্ষণ খেলার পর তিনি মাঠে রক্তবমি করে

ফেলেছিলেন তারপর আর তাকে নামানো হয়নি। ১৯৪২ সালে আর তিনি মাঠে নামেন নি। ডাক্তারের নিষেধে খেলা বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। তারপর বার্ণপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টিল ফ্যাক্টরীতে চাকরী পেয়ে বার্ণপুরে চলে যান। অবশ্য পরবর্ত্তী বৎসর তিনি খেলতে এসেছেন এবং প্রায়ই খেলায় যোগদানও করেছেন।

১৯৪২ সালের টীম যা হলো তাকে নিতান্ত জোড়াতালি টীমই বলা চলে, কারণ টীমে না ছিল কোন ভাল নামজাদা গোল-কীপার না ছিল ভাল উইং-ফরোয়ার্ড; হাফব্যাক সম্বন্ধেও খুব একটা ভরসা করা যায়নি, কিন্তু খেলা আরম্ভ হলে দেখা গেল যে এইরূপ কমজোর টীমই বেশ ভাল খেলে যাচ্ছে। গত সিজনের শ্রেষ্ঠ গোলদাতা সোমানা এবৎসর টীমের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হলো, তাতে অবশ্য বাস্তবিকই খুব ভাল ফল দেখা গেল—যদিও এই অধিনায়ক নির্ব্বাচন নিয়ে একটু মতান্তর বা মনান্তর হয়েছিল, যেহেতু রাখাল মজুমদার ছিল গত সিজনের সহকারী অধিনায়ক এ বছর অধিনায়কের পদ তাঁরই প্রাপ্য ছিল, কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তারা তা' না করে সোমনাকেই অধিনায়ক নির্ব্বাচন করেন আর সহকারী অধিনায়ক করেন স্নুনীল ঘোষকে। খেলায় দেখা গেল এই দুইজন খেলোয়াড়ই প্রাণপণ খেলে প্রত্যেক খেলাতেই গোল করছে এবং খেলায় জিতেও যাচ্ছে। অবশ্য পেছনদিকে প্রমোদ দাশগুপ্ত ও পরিতোষ চক্রবর্ত্তী দুইটী স্তম্ভের মত পেছন দিক আগলাচ্ছে। মাঝারি গোছের খেলোয়াড় হলেও নগেন রায়, আমিন, গিয়াসুদ্দিন তাদের নিজেদের যথাযথ কর্ত্তব্য পালন করতে কোনত্রুটীই দেখাচ্ছে না। লীগের প্রথমার্দ্ধে রাইটইনে সুহাস চ্যাটার্জি ভালই খেলে যাচ্ছিল, তারপর একটী খেলায় তিনি আহত হয়ে পড়েন, তারপর আপ্পারাও এসে হাজির হন। তখন আপ্পারাও, সোমানা ও সুনীল ঘোষ এই ত্রয়ীর খেলা সুন্দর ভাবে ও কার্য্যকরী হিসাবে চলতে লাগলো। শেষ পর্য্যন্ত বেশ যশের সঙ্গেই লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ হলো। ২৪টী গেম খেলে ২০টি জয়, ৩টী ড্র

ও ১টী পরাজয়, সর্বশুদ্ধ ৪৩ পয়েন্ট হলো। স্বপক্ষে ৬৪টী গোল, বিপক্ষে ৯টী, অধিনায়ক সোমানা গতবারের ন্যায় এবারেও সর্ব্বোচ্চ গোলদাতা হলেন ২৬টী গোল দিয়ে। ১৯৪২ সালের পূর্বে এত বেশী গোল লীগ খেলায় কেউই দিতে পারেন নি। ব্যাক খেলোয়াড় পরিতোষ চক্রবর্তী সম্বন্ধে এইটুকু বলবার আছে যে তিনি এই ক্লাবে যোগদান করে অতি সুন্দর খেলা খেলে দর্শকচিত্ত জয় করেছিলেন এবং তার পূর্ণ পরিণতি হয় ১৯৪৫ সালে, সে কথা অবশ্য পরে বলা হবে। এবৎসর তাঁর এই ক্লাবে যোগ দেওয়ার কারণ ১৯৪০ সালে তিনি মোহনবাগানে খেলতেন। আই. এফ. এ. শীল্ড ফাইনালে (১৯৪০) এরিয়ান টীম ৪—১ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করে আই, এফ, এ, শীল্ড পায়। সেই খেলায় ব্যাক পরিতোষ চক্রবর্তী ও গোলকীপার কে. দত্তকে মোহনবাগান ক্লাবের সমর্থকবৃন্দ অযথা বদনাম দিয়ে লাঞ্ছিত করে। তারপর কে. দত্ত ইষ্টবেঙ্গলে এবং পরিতোষ চক্রবর্তী কালীঘাট টীমে গিয়ে যোগদান করেন। কিন্তু পরিতোষ চক্রবর্তী কালীঘাট টীমে খেলে খুব তৃপ্তি পাননি, সেইজন্য এবৎসর ইষ্টবেঙ্গল টীমে এসে যোগদান করেন।

১৯৪৮ সাল থেকে আমি কলকাতার মাঠে খেলা দেখে আসছি। ভারতীয় ব্যাক সাইড খেলোয়াড়দের মধ্যে বহু নামজাদা খেলোয়াড় খেলেছেন বটে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে জুম্মা খাঁ ও পরিতোষ চক্রবর্তী ব্যাক পর্য্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে দেখলে আমার এই মতকে কেহই ঠেলতে পারবেন না ইহাই আমার বিশ্বাস। উগ্র সমর্থক বা সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধিহীন ক্রীড়ামোদীরা হয়ত আমার এই মতকে অগ্রাহ্য করতেও পারেন, তারজন্য আমার কোন কিছু বলবার নাই।

আই. এফ. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতায়ও ইষ্টবেঙ্গল টীম ফাইনাল পর্য্যন্ত উঠলো, কিন্তু লীগ রানার্স-আপ মোহামেডান টীমের কাছে

একটি পেনাল্টি গোলে পরাজয় স্বীকার করে রানার্স-আপ আখ্যা লাভ করতে হয়। এর পূর্বে দীর্ঘ ২০ বৎসর পর্য্যন্ত শীল্ড প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনাল পর্য্যন্তও অগ্রসব হতে পারে নি। ক্রীড়ামোদীদের ধারণা ছিল যে আই. এফ. এ. শীল্ড এবছর ইষ্টবেঙ্গলই পাবে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা' হয় নাই। লীগ খেলাতেও প্রথম গেমটীতে ২—১ গোলে মোহামেডানের নিকটেই পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। ১৯৪২ সালে একমাত্র মোহামেডান টীমেব নিকট লীগ ও শীল্ডে ২টী গেম হার হয় নতুবা সারা সিজনে আব কোন হার হয় নি।

শীল্ড খেলার সময় নজর মোহম্মদ নামক একটী খেলোয়াড়কে রাইট আউট পজিসনে খেলতে নেওয়া হয় নজব মোহম্মদ খেলোয়াড় হিসাবে মন্দ ছিল না, সে পূর্বে ভবানীপুব টীমে খেলেছে। শীল্ড ফাইনাল খেলায় ইষ্টবেঙ্গল টীম মোটেই ভাল খেলতে পারে নাই, অবশ্য তার কতকগুলি কারণও ছিল। প্রধান কারণ শীল্ডের খেলার তারিখ পিছিয়ে যাওয়া। শীল্ডের সেমি-ফাইনালে রেঞ্জার্স টীমের সঙ্গে খেলা পড়ে। ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে উক্ত খেলাটী অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন খেলা পরিচালনা করতে আসেন এস. লাব্বান নামক একটি নবাগত ইউরোপীয়ান রেফারী। কিন্তু এই রেফারী এই খেলাটিকে একেবারে নষ্ট করে দেন যেহেতু হাফ-টাইমের পূর্বেই আপ্‌পারাও একটী গোল দিয়ে অগ্রগামী হন, তার পরেই রেঞ্জার্সের খেলোয়াড়েরা অযথা মার ধোর করে খেলতে থাকে, রেফারী তাতে দৃকপাতই করেন না, বরং উল্টো রায় দিতে থাকেন। হাফ-টাইমের পর অন্যায়ভাবে একটা পেনাল্টীর নির্দ্দেশ দেন রেঞ্জার্সের পক্ষে। রেঞ্জার্স টীম পেনাল্টী সট করে গোল পরিশোধ করেন, খেলা কোনাক্রমে ড্র হয়ে যায়। উক্ত রেফারীর পরিচালনায় দর্শকগণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। যাইহোক খেলা শেষ হলে পুনরায় এই খেল টি কবে কোথায় দেওয়া যায় এই নিয়ে আই. এফ.

এ.র কর্ম্ম কর্ত্তারা একটু মুস্কিলে পড়ে যায়। ক্যালকাটা মাঠ রাগবী খেলার জন্য আর পাওয়া যায় না। বাধ্য হয়ে ২ সপ্তাহ পরে মোহামেডান মাঠেই ফাইনাল খেলার বন্দোবস্ত হয়। অবশ্য ফাইনালের পূর্ব্বদিন রেঞ্জার্স টীমের সঙ্গে অমীমাংসিত খেলার পুনরনুষ্ঠান হয়, তাতে ২—০ গোলে ইষ্টবেঙ্গল জয়ী হয়।

শীল্ডের ফাইনালে যারা খেলেছিলেন তাঁরা যথাক্রমে-গোলে—অমিতাভ মুখার্জী, ব্যাকে—প্রমোদ দাশগুপ্ত ও পরিতোষ চক্রবর্ত্তী, হাফে—নগেন রায়, অমিন ও গিয়াসুদ্দিন, ফরওয়ার্ডে—নজর মোহাম্মদ, আপ্পারাও, সোমানা, সুনীল ঘোষ, সুশীল চ্যাটার্জি।

মোহামেডানে—ওসমান, তাজ মহম্মদ, জুম্মা খাঁ, নুর মোহাম্মদ (বড়), মাসুম, নুর মোহাম্মদ (ছোট), তাহের, হাফেজ রসিদ, সাবু, সাজাহান।

রেফারী সার্জেন্ট ম্যাক ব্রাইড

ফাইনাল খেলায় হাফব্যাক লাইন খুবই খারাপ খেলেছিল, ফরোয়ার্ড ও প্রায় তথৈবচ। কেবল দুইজন ব্যাক প্রমোদ ও পরিতোষ অপূর্ব দর্শনীয় গেম খেলে দর্শকের প্রশংসা অর্জ্জন করেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। প্রমোদ দাশগুপ্তের হ্যাণ্ডবলের অজুহাতে একটি পেনাল্টী হয়। বড় নুরমম্মদ পেনাল্টী সট করে খেলার মীমাংসা করেন। এই খেলা পরিচালনা করেন রেফারী সার্জেন্ট ম্যাক ব্রাইড। তিনি খুব বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ রেফারী ছিলেন। ক্যালকাটার মাঠে অর্থাৎ আই. এফ. এ.র যে সব রেফারী খুব সুনাম অর্জ্জন করেছেন, সার্জেন্ট ম্যাক ব্রাইড তাঁদের অন্যতম।

১৯৪২ সালে কোচবিহার কাপও ইষ্টবেঙ্গল টীম পায় মোহন-বাগানকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। কাঁচরাপাড়া রেল কলোনীতে গিরিজা শীল্ড নামক এক ফুটবল প্রতিযোগিতাও জয় করে ফাইনালে ভবানীপুর টীমকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে।

১৯৪২ সালে টীমের কৃতিত্বে আর একজন অংশীদার ছিলেন ধরা

যায়, কারণ তিনি খেলোয়াড়দের অবৈতনিক ফিজিকেল ইনষ্ট্রাকটার ছিলেন। তিনি মুষ্টিযোদ্ধা জে. কে. শীল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই যে ১৯৪২ সালে মোহনবাগান টীমের সঙ্গে ইষ্টবেঙ্গলের অন্ততঃ ৫ বার সাক্ষাৎ হয়েছে (লীগ ও প্রদর্শনী খেলায়) কিন্তু সবকটি সাক্ষাতেই মোহনবাগানকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। ১৯৪১ সালেও এইরূপ ফলাফল হয়েছিল।

এই ইতিহাস প্রসঙ্গে আর একটী কথা না লিখে পারলাম না—এই ক্লাবের বিদায়ী সেক্রেটারী বনোয়ারী বাবু সম্বন্ধে। পূর্ব্বেও তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখেছি। বনোয়ারী বাবু যে খুব কাজের মানুষ ছিলেন একথা অবশ্য বলা চলে না কিন্তু ক্লাবের উন্নতিকল্পে তিনি প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেছেন। সেকালে তিনি এই ক্লাবের প্রাণ ছিলেন একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। ১৯৪২ সালে লীগ খেলা হয়ে যাবার পর খেলোয়াড়দের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে তিনি তাঁর নিজ ভবনে এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেন। সেই সম্বর্দ্ধনা ও ভোজ উপলক্ষে প্রায় আড়াই হাজার লোকের সমাবেশ হয়। নূতন ও পুরাতন খেলোয়াড়, বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ, অন্যান্য ক্লাবের বিশিষ্ট সদস্য, কয়েকজন নামজাদা খেলোয়াড়, বহু বন্ধু-বান্ধব উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করে-ছিলেন। বনোয়ারী বাবুর সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহারে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ সকলেই পরম অপ্যায়িত ও তৃপ্ত হন। ভারত বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ কুমার শচীন দেব বর্ম্মন গান গেয়ে সকলকে আনন্দিত ও মুগ্ধ করেছিলেন।

## ১৯৪২ সালের খেলোয়াড়গণ

**গোলে**—নীহার মিত্র, অমিতাভ মুখার্জি

**ব্যাকে**—প্রমোদ দাশগুপ্ত, পরিতোষ চক্রবর্ত্তী, রাখাল মজুমদার, অনিল নাগ।

**হাফব্যাক**—নগেন রায়, আমিন, গিয়াসুদ্দিন, খগেন সেন, প্রশান্ত দাস, শিশির ঘোষ।

**ফরোয়ার্ডে**—কৃষ্ণা রাও, আপ্পা রাও, সোমানা ( অধিনায়ক ), সুনীল ঘোষ, সুশীল চাটার্জি. সুহাস চাটার্জি, অসীম বানার্জি ( বিরলা ). রবি দে, সন্তোষ দত্ত (সান্নু), ফটিক সিং, টবি বোস, পাগসলী, নজর মোহম্মদ।

১৯৪২ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীম রোভার্স কাপ ( বোম্বাই ) প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। কলকাতাব বাটা স্পোর্টস ক্লাব যোগদান করেছিল। বাটা দল কলকাতার বিখ্যাত খেলোয়ড়ে নিয়ে দল গঠন করে এবং সে দল খুবই শক্তিশালী হয়। শেষ পর্য্যন্ত খুবই যশের সঙ্গে কাপ জয় করে নিয়ে আসে। উক্ত দলে ইষ্টবেঙ্গলের অধিনায়ক সোমানাও খেলতে গিয়েছিল, সুতরাং সোমানা রোভার্স কাপ বিজয়ী খেলোয়াড়ও বটে। বাটা স্পোর্টস ক্লাব ফাইনালে ডবলিউ. আই. এ. এ. টীমকে (Western India Athletic Association ) ৩—১ গোলে পরাজিত করে কাপ বিজয়ী হয়।

১৯৪২ সালের রোভার্স কাপ ফাইনাল খেলা হয় ১ ই অক্টোবর। টীম ছিল এইরূপ :—

**বাটা দল**—রঞ্জিত বসু ( কালীঘাট ), নরেশ বসু, ( ভবানীপুর ), সিরাজুদ্দিন (মোহামেডান) অধিনায়ক। তাহের (মোহামেডান), মোহিনী ব্যানার্জি ( কালীঘাট ), এ, চক্রবর্ত্তী ( কালীঘাট ), ছোট নুর মহম্মদ, ( মোহামেডান ), সোমানা ( ইষ্টবেঙ্গল ), হাফেজ রসিদ ( মোহামেডান ), সাবু ( মোহামেডান ), এস. ঘোষ ( মোহনবাগান )।

**ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া**—কাদের ভেলু, সোলেমান, রত্নম্. নারায়ণ, চন্দর, গোবিন্দ, স্বামী, ভীম রাও, টমাস (অধিনায়ক), মুপ্পি, ঢাকুরাম।

বাটা দলের পক্ষে গোল করেন সোমানা ২, হাফেজ রসিদ ১। ওয়েষ্টার্ণ দলের পক্ষে ভীম রাও ১টি গোল শোধ করেছিল মাত্র। রেফারী ছিলেন কলকাতার সুশীল ঘোষ।

১৯৪৩ সালে ইষ্টবেঙ্গল টিমে খেলোয়াড় অদল বদল হলো। গোলকীপার ডি. সেন ১৯৪১ সালে মোহনবাগান টিমে চলে গিয়েছিল এবছর পুনরায় এসে ইষ্টবেঙ্গলে যোগদান করলো। তা'ছাড়া পূর্বতন বিখ্যাত হাফব্যাক অজিত নন্দীও ভবানীপুর থেকে ফিরে এল। এরিয়ান থেকে হাফ ব্যাক এস. তালুকদার (রতু) এসে যোগদান করলো। বাঙ্গালোর থেকে আসবার সময় সোমানা একজন খেলোয়াড়কে সঙ্গে নিয়ে এল—বয়স খুব কম, অথচ দেখতে বেশ সুদর্শন। ছেলেটির নাম অরোকরাজ। উক্ত অরোকরাজ বাঙ্গালোরে ইনসাইড ফরোয়ার্ডে খেলতো এবং বেশ চৌকস খেলোয়াড়। শ্যামবর্ণ দোহারা গড়নের সুন্দর মুখশ্রী যুক্ত চেহারা বয়স তখন ২০ বৎসর মাত্র। এই বালকটি শেষ পর্য্যন্ত যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে খেলে গেছে। মাত্র এক বৎসরই এখানে খেলে গেল আর কলকাতায় এলনা, কিন্তু তাঁর খেলা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা কোন দিনই তাকে ভুলতে পারবেন না। প্রথমে তাকে ফরোয়ার্ড লাইনে খেলানো হলো, তারপর কয়েকদিন বাদে তাকে সেণ্টার হাফ পজিসনে খেলতে দেওয়া হয়। উক্ত পজিসনে সে এত সুন্দর খেলতে লাগলো যে সে বৎসর বাছাই করা ভারতীয় টিমেও সে স্থান পেয়ে গেল। বাছাই ভারতীয় ও ইউরোপীয় টিমের খেলায় তার খেলা দেখে ক্যালকাটা মাঠে বিশিষ্ট ইউরোপীয় দর্শকও তদানীন্তন গভর্ণর হারবার্ট সাহেব পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সে বছর আর একটি কাণ্ড হয় অধিনায়ক নির্ব্বাচন ব্যাপার নিয়ে। গত বৎসরের অধিনায়ক সোমানাকে বাতিল করে রাখাল মজুমদারকে অধিনায়কপদ দেওয়া হয়। রাখাল মজুমদারের অধিনায়ক হওয়ার দাবী অবশ্য পূর্বেই ছিল, একথা সত্য, কিন্তু এই ব্যাপারে সোমানা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে, আর সেই কারণে লীগের খেলায় সোমানার কৃতিত্বও ম্লান হয়ে যায়।

লীগের খেলার শেষ দিকে সোমানার খেলা খুবই খারাপ পর্য্যায়ে চলে যায়, সেই কারণে লীগ হাতছাড়া হয়ে যায় নতুবা ৫।৬ পয়েণ্ট

এগিয়ে থেকেও শেষ পর্য্যন্ত ২ পয়েন্ট নীচে নেমে রানার্স আপ হতে হয়। মোহনবাগান কতকটা অনিশ্চয়তার মধ্যদিয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে যায়। অবশ্য শীল্ডের খেলায় সোমানা হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করেছিল এবং খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। সে বৎসর ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী পুনরায় পরিবর্ত্তন হয়। গত বৎসরের সেক্রেটারী ব্যারিষ্টার এ. কে. বাসু আর সেক্রেটারী থাকতে রাজী হলেন না। তখন বিখ্যাত নেতা ও কংগ্রেসসেবী ব্যারিষ্টার জে.সি. গুপ্ত মহাশয়কে নূতন সেক্রেটারী পদে নিয়োগ করা হলো। তিনি অবশ্য পূর্ব্বথেকেই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবারে সেক্রেটারী হয়ে তিনি তাঁর কর্ম্ম-শক্তি ক্লাবের জন্য বেশ ভাল ভাবেই প্রয়োগ করেন। তিনি ক্লাবের জন্য যথা সাধ্য করেছেন। তার কর্ম্ম প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে। সে বৎসর ফুটবল সেক্রেটারী হিসাবে একজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদীকে নেওয়া হয়। তিনি হলেন সুবিখ্যাত রাণী রাসমণি বংশীয় শ্রীগোপী-নাথ দাস গোপীবাবু এর পূর্ব্বে কালীঘাট টিমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সেখানেও তিনি ফুটবল টিম পরিচালনা করে এসেছেন। এরকম একজন অভিজ্ঞ লোককে পেয়ে ক্লাব লাভবানই হলো যেহেতু এই বৎসর টিম ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টুর্ণামেন্ট আই. এফ. এ. শীল্ড জয়লাভ করে। লীগে যদিও পূর্ণমনোরথ হতে পারেনি কিন্তু শীল্ড খেলায় পরিপূর্ণ কৃতিত্ব দেখিয়ে জয়লাভ করে ক্লাবের সদস্য ও সমর্থকদের পূর্ণানন্দ দিয়েছিল।

আই, এফ, এ, শীল্ডের খেলার প্রথম থেকেই খুব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে আরম্ভ করে। প্রথম খেলায় কুষ্টিয়ার শিবকালী স্পোর্টিংকে ৮—১ গোলে পরাজিত করে। তারপর ইংরেজ গোরাটিম বি, আই, ব্যাটেলিয়ানকে ৩—০ গোলে, কোয়ার্টার ফাইনালে ভবানীপুর টিমকে ১—০ গোলে এবং সেমিফাইনালে শক্তিশালী টিম বি, এণ্ড এ, আর-কে ৭—১ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে উঠে। বর্ত্তমান ইষ্টার্ণ রেল ও পূর্ব্বতন ই, বি, আর, টিমের নাম ঐ সময়ে ছিল বি, এণ্ড এ, আর,

অর্থাৎ বেঙ্গল্ এণ্ড আসাম রেলওয়ে। ফাইনালে অপর পক্ষে ক্যালকাটা পুলিশ টীম উঠেছিল মোহনবাগানকে সেমি-ফাইনালে হারিয়ে। ফাইনাল খেলা হয় ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে। সেদিন মাঠ ছিল কিছুটা কর্দ্দমাক্ত, কিন্তু ইষ্টবেঙ্গল যথেষ্ট দাপটের সঙ্গে খেলে পুলিশ টিমকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে। অনেকের ধারণা যে ইচ্ছা করলে পুলিশ টিমকে আরও বেশী গোলের ব্যবধানে হারাতে পারতো, কিন্তু কিছুটা অনুগ্রহ করে পুলিশকে ছেড়ে দেওয়া হলো। ফাইনালে টিম ছিল এইরূপ, যথা—

ইষ্টবেঙ্গল—ডি, সেন, রাখাল মজুমদার ( অধিনায়ক ), পরিতোষ চক্রবর্ত্তী, অজিত নন্দী, অয়োক রাজ, নগেন রায়, ফটিক সিং, আপ্পা রাও, সোমানা, সুনীল ঘোষ, সুশীল চ্যাটার্জি।

পুলিশ—উইদাস (অধিনায়ক), ওয়াট, মায়াস, মিলস্, রবিনসন্, এভেটুম, হে, টেম্পলটন, ফল্‌স, পি. ডিমেলো, এলেন। ( ithers, Watt, Myers, Mills, Robinson, Evetoom, Hay, Templeton, Fawls, P. D'emello. Allen )

রেফারী ছিলেন পি, মিশ্র বা কালো মিশ্র। তিনি বেশ সুষ্ঠু-ভাবেই খেলা পরিচালনা করেন। বিখ্যাত পঙ্কজ গুপ্তের পর তখন পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় রেফারী শীল্ড ফাইনালে আর বাঁশী বাজান নাই। এ বৎসর আই, এফ, এ, শীল্ডের জুবিলী ইয়ার ছিল। সেই জুবিলী ফাইনালে কালো মিশ্রকে রেফারী দেওয়া হয় এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব শীল্ড বিজয়ী হয়। খেলায় প্রথম গোল করেন আপ্পারাও, তারপর ফটিক সিংহ, তৃতীয় বা শেষ গোল করেন সোমানা। স্বয়ং গভর্ণর হারবার্ট সাহেব পুরস্কার বিতরণ করেন। সে বৎসর কোচবিহার কাপও ইষ্টবেঙ্গল টিম পায়। ফাইনালে রবার্ট হাডসন টীমকে ২-০ গোলে পরাজিত করে।

ফাইনালে টীম ছিল ইষ্টবেঙ্গল— অমিতাভ মুখার্জি, প্রমোদ দাশগুপ্ত পি চক্রবর্ত্তী, অজিত নন্দী, এস, তালুকদার, জে, দাশগুপ্ত, ফটিক সিংহ, অয়োকরাজ, সোমানা, সুনীল ঘোষ, আবু গাঙ্গুলী।

রবার্ট হাডসন—ছোটেলাল ( ছোট ), জব্বর, এন. দাস, কাল্লু, ছোটেলাল ( বড় ), সোলেমান, বি. ঘোষ, চাঁদ খাঁ, এ. মুখার্জি, আখতার হোসেন, এস. এন. দত্ত।

রেফারী—টি. সোম (বাঘা), কাশিম বাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর পুরস্কার বিতরন করেন।

১৯৪৩ সালের খেলোয়াড়দের নাম যথাক্রমে—

গোল—ডি. সেন, অমিতাভ মুখার্জি, নীহার মিত্র।

ব্যাক—রাখাল মজুমদার ( অধিনায়ক ), প্রমোদ দাশগুপ্ত, পরিতোষ চক্রবর্ত্তী, অনিল নাগ।

হাফব্যাক—অজিত নন্দী, আলোক রাজ, নগেন রায়, এস, তালুকদার, গিয়াসুদ্দিন, জে, দাশগুপ্ত, শিশির ঘোষ।

ফরোয়ার্ড—ফটিক সিংহ, আপ্পারাও, সোমানা, সুনীল ঘোষ, সুশীল চ্যাটার্জি, পাগসলা, কৃষ্ণ রাও, টবি বোস, সুহাস চ্যাটার্জি, আবু গাঙ্গুলী

১৯৪৪ সাল ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে খুবই তুর্বৎসর গিয়েছে বলা চলে। প্রথমেই ক্লাবের খেলোয়াড় পরিবর্ত্তন। বিখ্যাত সেণ্টার ফরোয়ার্ড সোমানা ও রাইট ইন আপ্পারাও এই তুজনেই ক্লাব ছেড়ে দিয়ে ভবানীপুর ক্লাবের পক্ষে ছাড়পত্রে সই করলেন। অবশ্য নাম সই ছাড়া আর কিছুই করেন নি। এক দিনের জন্যেও ভবানীপুরের জার্সী গায়ে চড়ান নি। ক্লাবের উপর অভিমান করে সোমানা এই কাজ করেছিলেন। সঙ্গে আপ্পারাওকেও সাথী করে নিয়েছিলেন। অন্য ক্লাবে খেলার উদ্দেশ্য তার মোটেই ছিল না। যা হ'ক এই বৎসরই আই, এফ, এ, শীল্ডের খেলার সময় ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষ সোমানাকে নানাপ্রকারে বলে কয়ে সন্তুষ্ট করে নিয়েছিলেন। আপ্‌পারাওকে আই, এফ, এ, খেলবার অনুমতিও দিলেন, কিন্তু সোমানার বেলায় তা' হলো না। আইনের প্যাঁচে সোমানাকে

খেলতে দেওয়া হলোনা, তা' ছাড়া ভবানীপুরের কর্ত্তৃপক্ষও সোমানাকে ছেড়ে দিলেন না। সুতরাং সে বছর সোমানা কোথাও বল পায়ে দিতে পারেন নি। এদিকে কর্ম্মস্থান থেকে রীতিমত ছুটী না পাওয়ায় পাগস্লীরও খেলায় যোগদান করা সম্ভব হয় নি। এবার গোলরক্ষক কে, দত্ত পুনরায় ভবানীপুর থেকে এখানে চলে আসেন। আবার ডি সেন পুনরায় মোহনবাগানে চলে যান। ভবানীপুর থেকে হাফ ব্যাক কাইসার পুনরায় ক্লাবে এসে যোগদান করেন। কাইসার তখন ভবানীপুরে সেণ্টার হাফ পজিসনে খেলছিলেন, এখানেও তাকে সেণ্টার হাফে খেলাবার উদ্দেশ্যেই নিয়ে আসা হয়। যা হ'ক লীগের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল মোটেই সুবিধা করতে পারে নি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এ বৎসর মোহনবাগান টীমের সঙ্গে লীগের দুটী খেলাতেই পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল যা গত ১৬ বৎসর যাবৎ কোনদিন হয়নি। সে বৎসর চ্যাম্পিয়ানশীপ পায় মোহনবাগান বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই।

তারপর আই, এফ, এ, শীল্ড খেলা আরম্ভ হলো। কোনক্রমে ইষ্টবেঙ্গল সেমিফাইনাল পর্য্যন্ত উঠ্লো, বিপরীতে মোহনবাগানও সেমি-ফাইনালে সামনা সামনি হলো। এতাবৎ যা হয়নি এখন তাই হতে চললো অর্থাৎ আই, এফ, এ, শীল্ডে এই দু'টিমের প্রথম সাক্ষাৎ। তাও আবার সেমি-ফাইনালে। লীগে ইষ্টবেঙ্গল দুবার হেরেছে এখন শীল্ডে কি করবে এই নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে আলোচনা চললো। সকলেরই ধারণা যে এবার নির্ঘাৎ হারতেই হবে। ফরোয়ার্ড লাইন কমজোরী, সেণ্টার ফরোয়ার্ড নাই বললেই হয়। একে তাকে দিয়ে এতদিন কাজ চালানো হয়েছে, এখন কি করা যায়? ইত্যাদি ভাবনা। সোমনা নাই, পাস্গলী নাই তদুপরি সুনীল ঘোষ (অধিনায়ক) আঘাত পেয়ে খেলতে পারছে না, সুতরাং টিমের উপরে ভরসা কি? তথাপি টিম ত' নামাতেই হবে। কর্ম্মকর্ত্তারা ভাবনায় পড়ে গেলেন। ১৯৩৩ সালে স্পোর্টিং ইউনিয়ন টিমে বিশ্বেশ্বর রাও বা ভি, রাও

নামে একজন ইন সাইড ফরোয়ার্ড খেলতেন। তখনকার দিনে তিনি ভাল খেলোয়াড় বলেই পরিচিত ছিলেন। তারপর এতদিন তিনি তাঁর স্বদেশ মাদ্রাজেই কাটিয়েছেন, এ বৎসর তিনি কলকাতায় এসেছেন কর্ম্মোপলক্ষে। এক দিন ইষ্টবেঙ্গল তাঁবুতে এসে বললেন যে "আমি ১০ বৎসর পূর্বে এখানে খেলে গিয়েছি, কেউ কেউ হয়ত আমাকে চিনতেও পারেন। এখন আমার বয়েস হয়ে গিয়েছে কিন্তু খেলার নেশাটা এখনো কাটেনি। আমি এ বৎসর কলকাতায়ই থাকব, ইচ্ছে যে আপনাদের টিম থেকেই খেলি। অবশ্য প্রথম বিভাগে আমি খেলতে চাইনা, আমাকে আপনারা পাওয়ার লীগ বা অন্যান্য জুনিয়ার গেমে খেলবার সুযোগ দিন। সখ রয়েছে খেলবার তাই এখনও বিদায় করিনি। যা হ'ক তারপর তাকে জুনিয়ার গেমে খেলতে দেওয়া হতো। কিন্তু বাস্তবিক তার পূর্ব্বের খেলার কিছুই ছিল না, তবে অভিজ্ঞতালব্ধ খেলোয়াড় ত' বটে। এইবার সেমি-ফাইনালের এই সমস্যায় তার কথা কয়েকজনের মনে পড়লো, সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত ভি, রাওকেই সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে টিমে নামানো হলো। ১৯৪৪ সালের আই, এফ, এ, শীল্ডের সেমিফাইনালের স্মরণীয় খেলা। ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের শীল্ডে প্রথম সাক্ষাৎ। সেই প্রথম সাক্ষাতে কমজোরী ইষ্টবেঙ্গল টিম শক্তিশালী মোহনবাগানকে ১—০ গোলে হারিয়ে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর ফাইনাল খেলার সুযোগ পেল। বয়স্ক ও বহুদিন খেলা পরিত্যক্ত, বর্ত্তমানে অখ্যাত ভি, রাও ইষ্টবেঙ্গলের মান রক্ষা করেন।

খেলার সময় দেখা গেল যে শক্তিশালী মোহনবাগান কমজোরী ইষ্টবেঙ্গলের কাছে কাবু হয়ে পড়েছে। প্রথম থেকেই ইষ্টবেঙ্গল খুব দাপট নিয়ে খেলছিল—মোহনবাগান কেবল আত্মরক্ষা করতেই ব্যস্ত ছিল, তারপর খেলার শেষ দিকে ইষ্টবেঙ্গল একটি ফ্রি কিক্ পায়, ব্যাক পরিতোষ চক্রবর্ত্তী ফ্রি কিকের সট করেন, ঐ বলে হেড

করে ভি, রাও গোল করেন। ঐ খেলায় টিম ছিল : ইষ্টবেঙ্গল :—

কে, দত্ত, প্রমোদ দাশগুপ্ত, পি, চক্রবর্ত্তী, এস তালুকদার, কাইসার গিয়াসুদ্দিন. কৃষ্ণ রাও, আপ্পারাও, ভি, রাও, টবি বসু, ফটিক সিংহ।

মোহনবাগান :—রাম ভট্টাচার্য, শরৎ দাস, শৈলেন মান্না, অনিল দে, টি. আও, দ্বিপেন সেন, ডি, রায়, কে, রায়, বিজন বসু, নিমু বসু, অমল ভৌমিক।

রেফারী ছিলেন ক্যাপ্টেন হলওয়ে (Holloway), রেফারীং ভালই হয়েছিল।

তারপর বি, এণ্ড, এ, রেল দলের সঙ্গে ফাইনাল খেলা হয়। গত বৎসর (১৯৪৩) সেমি-ফাইনালে যে টিমকে ৭ ১ গোলে হারিয়ে (রেকর্ড সৃষ্টি করে) ফাইনালে উঠে শীল্ড পেয়েছিল। এই বৎসর ফাইনালে সেই টীমের কাছে ২—০ গোলে পরাজয় বরণ করতে হয়। বি, এণ্ড এ, রেল দল যোগ্যতর দল হিসাবেই শীল্ড জয় করেছিল। ফাইনালে টিম ছিল এইরূপ—

বি, এণ্ড এ, রেল :—পি, ঘোষ, ইউসুফ, নীরেশ মজুমদার, কে চ্যাটার্জি, মোহিনী ব্যানার্জি. নীলু মুখার্জী, এস, নন্দী. এস, বসু, বিমল কর (অধিনায়ক). নিধু মজুমদার, আলাউদ্দিন।

ইষ্টবেঙ্গল :—কে. দত্ত, পি, দাসগুপ্ত (অধিনায়ক), পি, চক্রবর্ত্তী, এস, তালুকদার, কাইসার, গিয়াসুদ্দিন, ফটিক সিংহ, আপ্পারাও, ভি, রাও, টবি বসু, এস, দেব রায়।

রেফারী—ক্যাপ্টেন হলওয়ে।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা না লিখে পারলাম না। এ বৎসর মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল টিমের লীগের প্রথম খেলায় (চ্যারিটী ম্যাচ) মোহনবাগান ১—০ গোলে জয়লাভ করে। ঐ খেলায় একমাত্র গোলটি করেন নিমু বোস। ঐ গোলটি হয়েছিল সম্পূর্ণ অফসাইড থেকে। রেফারী এ, সি, উইলসন ভুলবশতঃ ঐ অফসাইড গোল ডিক্লেয়ার দেন। খেলার পর উইলসন সাহেব ভুল স্বীকার করেছিলেন।

সংবাদ পত্রে একথার উল্লেখ আছে। কিন্তু খেলার মাঠে দাঁড়িয়ে রেফারী যদি ভুলবশতঃ গোল ডিক্লেয়ার করেন তাহলে তাই বজায় থাকবে, একটুও নড়চড় হবে না, ইহাই আইন। ভুলই হ'ক আর ঠিকই হ'ক রেফারী একবার বাঁশী বাজিয়ে ডিক্লেয়ার করলে তার আর সংশোধন হবার উপায় থাকে না। এরকম দৃষ্টান্ত অনেক আছে। যা হ'ক আইনানুসারে যখন নিমু বোসের গোল পাকাপোক্ত হয়ে গেছে তখন আর কথা কি? সেইজন্য মোহনবাগানের একজন সমর্থক কিম্বা সদস্য নিমু বোসকে একটি সোনার মেডেল উপহার দেয়। তারপর শীল্ডের সেমিফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে হারিয়ে দেবার পর দার্জিলিং ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার বীরেশ্বর মুখার্জী ঐ খেলায় জয়ী প্রত্যেকটি খেলোয়াড় ও অনুপস্থিত অধিনায়ক ঘোষকে একটি করে সর্বশুদ্ধ বারোটি সোনার মেডেল উপহার দেন এবং এই উপলক্ষে ছোট খাট একটি উৎসবেরও অনুষ্ঠান করেন।

১৯৪৪ সালের আই, এফ, এ, শীল্ড প্রতিযোগিতায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের পুরাতন ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে কয়েকজন উৎসাহী মিলে একটা দল গঠন করে। টিমের নাম করা হয় ইষ্টবেঙ্গল হিরোজ ( East Bengal Heroes )। এই টিম প্রথম রাউণ্ডের খেলায় খুলনার ইউনিয়ন স্পোর্টিং টিমকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। দ্বিতীয় রাউণ্ডে মোহনবাগান টিমের সঙ্গে খেলে। মোহন-বাগান ৩-০ গোলে এদেরকে হারিয়ে দেয়। মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের পুরাতন খেলোয়াড়দের হারিয়ে সেমি-ফাইনালে আধুনিক ইষ্টবেঙ্গলের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ঐ হিরোজ টিমে ভানুদত্ত রায় (অধিনায়ক), প্রফুল্ল চাটার্জি, দুলাল, মজিদ, সূর্য্য চক্রবর্তী প্রমুখ বিখ্যাত খেলোয়াড়গণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ঐ বৎসরের খেলোয়াড়গণ—

গোল—কে, দত্ত, অমিতাভ মুখার্জি, নীহার মিত্র

ব্যাক—প্রমোদ দাশগুপ্ত, পরিতোষ চক্রবর্ত্তি, রাখাল মজুমদার

হাফ  এস, তালুকদার, কাইসার, গিয়াসুদ্দিন, জে, দাশগুপ্ত,
নগেন রায়, খগেন সেন

ফরোয়াড—কৃষ্ণ রাও, ফটিক সিংহ, আপ্পারাও, বিশ্বেশ্বর রাও,
সুনীল ঘোষ (অধিনায়ক), টবি বসু, সরোজ দেব রায়,
সুশীল, চাটার্জি, পাগস্লী।

১৯৪৫ সাল। এবৎসর টিমে কয়েকজন নতন খেলোয়াড় যোগ দেন। তমধ্যে হাফ ব্যাক ২ জন। একজন রাইট হাফ ডি, চন্দ (জগা), তিনি এর পূর্ব্বে কালীঘাট টিমে সেণ্টার হাফ পাজসনে খেলে এসেছেন। এখানে রাইট হাফ পাজসনেই খেলতে লাগলেন, তাঁর খেলা খুবই কার্য্যকরী ছিল। আর একজন লেফট হাফ ব্যাক খেলোয়াড় মহাবীর প্রসাদ। ইনি বিহার প্রদেশের লোক ইষ্টবেঙ্গলে যোগদান করে ইনি খুব যশের সঙ্গেই খেলেছেন, কিন্তু তার পরের বৎসর ইনি মোহনবাগান ক্লাবে চলেযান। কয়েক বৎসর মোহন-বাগানে খেলে তারপর রাজস্থান টিমে খেলেছেন অনেক দিন. মহাবীর একজন উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের খেলোয়াড় ছিলেন। ফরোয়ার্ড খেলোয়াড় নায়ার ১৯৩৯ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে খেলেছিলেন এবং ভালই খেলেছিলেন, কিন্তু আবার পর বৎসর পুনরায় রবার্ট হাডসন টীমেই ফিরে যান। এবার ইষ্টবেঙ্গলের কর্ম্ম কর্ত্তাদের আহ্বানে পুনরায় এসে যোগদান করেন। ত্রিবাঙ্কুর থেকে সালে নামক একজন বালক খেলোয়াড় আসে। সে লেফট আউটে খেলে থাকে। মূখ্য উদ্দেশ্য পড়াশোনা, গৌন উদ্দেশ্য খেলা। এই সালে পরবর্ত্তী কালে একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় বলে পরিগণিত হয়। এবার টিমে অনেকগুলি খেলোয়াড়ের সমাবেশ হয়, পূর্ব্বেই তাদের নামের তালিকা দিয়ে দিচ্ছি। যথা—

গোলে—কে. দত্ত, অমিতাভ মুখার্জি. এন. মিত্র, এস. চক্রবর্ত্তি

ব্যাক—প্রমোদ দাশগুপ্ত, পরিতোষ চক্রবর্ত্তি, (অধিনায়ক) রাখাল মজুমদার, এন গুহ, আর গাঙ্গুলী

হাফ—ডি, চন্দ, কাইসার, মহাবীর, নগেন রায়, এস. তালুকদার, খগেন সেন, শিশির ঘোষ, জে, দাশগুপ্ত।

ফরোয়ার্ড—টিটুকর, আপ্পারাও, পাগস্‌লী, সোমানা, সুনীল ঘোষ, নায়ার, সুশীল চাটার্জি, ফটিক সিংহ, সালে, এস, গড়গড়ি স্বরাজ ঘোষ, এস, তালুকদার (ছোট

১৯৪৫ সাল। এবৎসর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের বিশেষ স্মরণীয় বৎসর কারণ এ বৎসরই ক্লাব একসঙ্গে লীগ ও শীল্ড প্রথম পায়। উপরন্তু কোচবিহার কাপও জয় করে। এবৎসর যে কয়জন নূতন খেলোয়াড় যোগদান করেন তাঁরা এখানে নূতন হলেও অভিজ্ঞ এবং শক্তিমান খেলোয়াড়। এদের সমবায়ে টীম সত্যই খুব শক্তি-শালী হয়েছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এবার পাগস্‌লী তাঁর কর্ম্মস্থান থেকে ছুটীর ব্যবস্থা করেছিলেন। অবশ্য সে ছুটি কেবল খেলার দিনের জন্যই। তিনি খেলার দিন সকালে বার্ণপুর থেকে কল-কাতায় এসে খেলা শেষ করে আবার সেই দিনই ফিরে যেতেন। সোমানা গত বৎসর ভবানীপুরে সই করেছিলেন। কিন্তু খেলেননি, তথাপি এবৎসর ছাড়পত্রে সই করার শেষ দিন পর্য্যন্ত কলকাতায় না আসায় তাঁকে অনেক বিভ্রাটে পড়তে হয়েছিল। তিনি অনেক দেরী করে কলকাতায় এসে আই, এফ, এ,র নিকট দরখাস্ত করে দেরী হওয়ার কারণ বিবৃত করে জানালেন কিন্তু আই, এফ, এ, কমিটি তাঁকে ছাড় দিতে খুবই বেগ দিয়েছিলেন। অনেক তর্ক-বিতর্ক বাদ বিতণ্ডার পর তাঁকে ছাড় দেওয়া হয়। তখন লীগের খেলা প্রায় শেষ। যাই হউক অনেক কষ্টে সোমানা ক্লাবে পুনরায় ফিরে এলেন বটে, কিন্তু একটা বৎসর না খেলার দরুন তাঁর সেই মনোমুগ্ধকর খেলা এবং গোল দেওয়ার ক্ষমতা অনেকটা ক্ষুন্ন হয়ে যায়। ১৯৪৫ সালের পর সোমানা আর কলকাতায় খেলতে আসেনি

অসময়ে তাঁকে খেলা পরিত্যাগ করতে হয়। বিশেষ কারণ নিজের পৈত্রিক ব্যবসায় পরিচালনায় যোগদান করার জন্য তাঁর পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় আর খেলায় যোগ দান করতে সমর্থ হননি। যদিও কলকাতায় আরও কয়েকবার তিনি এসেছেন বটে, তা' নিছক বেড়াবার উদ্দেশ্য নিয়ে—খেলবার জন্য নয়। '১৯৪৩ সালে সোমানা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি, এ, পাস করেছিলেন। দেশে গিয়ে মহীশূর আদালতের চীফ জাস্টিস মিঃ মেডপ্পার পরমা সুন্দরী ও বিদুষী কন্যাকে বিবাহ করেন। বর্ত্তমানে সোমানা বাঙ্গালোরে নিজ বাড়ীতে বাস করছেন এবং বাঙ্গালোরে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। সোমানার ন্যায় অভিজাত বংশীয় বিশিষ্ট খেলোয়াড় আই, এফ, এ,র আণ্ডারে কেউ খেলেছে বলে মনে হয় না।

১৯৪৫ সালে ইষ্টবেঙ্গল টিমের লীগ খেলা খুব ভাল ভাবেই সম্পন্ন হয়। বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই লীগ চ্যাম্পিয়ান শিপ লাভ করে। লীগের ২৫টা খেলায় ১৬টা জয় ৭টা ড্র ও ১টা মাত্র পরাজয়—স্বপক্ষে ৫৬ গোল বিপক্ষে মাত্র ৭টা গোল—মোট পয়েণ্ট ৩৯ পেয়ে ইষ্টবেঙ্গল লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়। লীগ রানার্স হয় মোহনবাগান ৩৭ পয়েণ্ট পেয়ে। ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে মোহনবাগান লীগের ১ম খেলায় ২-০ গোলে পরাজিত হয় ২য় খেলায় গোলশূন্য ড্র করে। একমাত্র ভবানীপুর টিম লীগের ১ম খেলায় ইষ্টবেঙ্গলকে হরিয়ে দেয়। ভবানীপুর টিমের ইন সাইড ফরোয়ার্ড কে, রায় (সামু) দূর থেকে লক্ষ্য করে বল মেরেছিল. গোল রক্ষক অমিতাভ মনে করেছিল যে বলটা বাইরে দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু বলটা বাতাসের সাহায্যে সাৎ করে কোণ দিয়ে পোষ্টের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এই অপ্রত্যাশিত গোল খাওয়ার পর ইষ্টবেঙ্গল টিম একটানা আক্রমণ ও সটের উপর সট নিয়েও কোন গোল করতে পারে না। গোল পরিশোধ করতেই পারলনা—জেতা ত দূরের কথা। ইহাই কলকাতার মাঠে ১৯৪৫ সালের খেলায় একমাত্র

পরাজয়। লীগ খেলায় সর্ব্বোচ্চ গোল দাতার সম্মান সে বছর লাভ করেন পাগস্‌লী।

তারপর আসে আই.এফ.এ. শীল্ডের খেলা। ২য় রাউণ্ডে বরিশাল টাউন ক্লাবকে ২—০ গোলে হারিয়ে ৩য় রাউণ্ডে হায়দরাবাদ পুলিশ টীমের সঙ্গে খেলা পড়ে। হায়দরাবাদ পুলিশ টীমের সঙ্গে ইষ্টবেঙ্গলের ইহাই প্রথম সাক্ষাৎ। হায়দরাবাদ পুলিস টীমও এর পূর্ব্বে কলকাতায় খেলতে আসেনি। গোরা সৈনিক টীম ছাড়া এ রকম শক্তিশালী টীম এর আগে কলকাতায় খেলতে আসেনি। এদের টীমে গোল-রক্ষক 'এরাইয়া' একজন উৎকৃষ্ট গোলরক্ষক। ব্যাকদ্বয় শের খাঁ ও ফ্রুয়েল। দুজনেই চিত্তাকর্ষক ও নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। চমকপ্রদ খেলা দেখিযে এঁরা দর্শকদের খুবই তৃপ্তি দিয়েছেন। তা ছাড়া হাফ-ব্যাক তিন জনও ভাল খেলোয়াড়, তন্মধ্যে লেফট হাফ নূর মহাম্মদ খুবই উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের খেলোয়াড় ছিলেন। ফরোয়ার্ড লাইনও খেলে ভাল, কিন্তু গোলেব মুখে তাল রাখতে পারেনি। একটু থতমত খেয়েছে ঠিক সময় মত সট নিতে পারেনি। যাই হোক ইষ্টবেঙ্গল এদেব সঙ্গে দুইদিন ড্র করার পর তৃতীয় দিনে খেলার মীমাংসা করেন। শেষদিনে লেফট ইন সুনীল ঘোষ ২টী গোল দিয়ে হায়দরাবাদ টিমকে বিদায় নিতে বাধ্য করে। ১ম গোলটী হয় ফ্রিকিক থেকে. সুনীল ঘোষ ফ্রিকিক করেন. তাঁর তীব্র সট বন্দুকের গুলীর মত রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের বেষ্টনীর ভেতর দিয়ে গোলে প্রবেশ করে। আবার ২।৩ মিনিট পরেই সুনীল বল ধরে এগিয়ে গিয়ে এরাইয়াকে পরাস্ত করেন ২—০ গোলে খেলার পরিসমাপ্তি হয়। ১৯৪৫ সালের শীল্ডের সমস্ত খেলার মধ্যে এ রকম তীব্র প্রতিযোগিতামূলক খেলা আর একটীও হয়নি। ক্রীড়ামোদী মহলের আলোচনা ছিল এই যে ফাইনালে এই খেলাটী হলে বেশ মানান হতো।

হায়দরাবাদের বিপক্ষে ইষ্টবেঙ্গলের টিম ছিল এইরূপ :—কে. দত্ত,

পি. দাশগুপ্ত, পি. চক্রবর্ত্তি, ডি. চন্দ, কাইসার, মহাবীর, টিটু কর, আপ্পারাও, পাগস্‌লী, সুনীল ঘোষ ও সালে।

হায়দরাবাদ পুলিস :— এরাইয়া, শের খাঁ, ফ্রুয়েল, মহম্মদ হাদী, সেক জামাল, নূর মহম্মদ, মইনুদ্দিন, সুশে, সমশের খাঁ, ধনরাজ ও মহম্মদ আলী। রেফারী ছিলেন ক্যাপ্টেন হলওয়ে।

ইষ্টবেঙ্গল কোয়ার্টার ফাইনালে বগুড়া জেলা একাদশকে, সেমি-ফাইন্যালে কালীঘাট টিমকে হারিয়ে ফাইনালে উঠলো। অপরদিকে মোহনবাগান টিমও ফাইনালে উঠে ইষ্টবেঙ্গলের সম্মুখীন হলো। ৯ই আগস্ট ফাইনাল খেলার দিন ধার্য্য হয়। খেলাব দিন গোলরক্ষক কে. দত্ত ও ব্যাক প্রমোদ দাশগুপ্ত খেলতে অপারগ হয়ে পড়ে। প্রমোদ দাশগুপ্ত সেমি-ফাইনাল খেলার দিন রাত্রে বাড়ী ফেরার সময় মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন। কে বা কাহারা তাঁর মাথায় আঘাত করে। ঘটনাটা ঘটেছিল গড়ের মাঠের রাস্তাব উপর। অতর্কিত আঘাত লাগায় লোক চিনতে পারা যায়নি। নিতান্ত পরমায়ুর জোরে বেঁচে যায়, কিন্তু গুরুতর আহত হয়। এদিকে কে. দত্ত-ও পায়ের পাতায় হঠাৎ বেদনা অনুভব করেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে তাকে খেলতে নিষেধ করে। এমতাবস্থায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

গোলরক্ষক অমিতাভ মুখার্জী যদিও আছে বটে, কিন্তু সে কিছুতেই খেলতে রাজী নয়। যেহেতু লীগের একমাত্র পরাজয়ের দিন সে-ই গোলে খেলেছিল। তারপর আর তাকে কোন দিন নামানো হয়নি, সে নিজেও আর কোন দিন খেলবার আগ্রহও প্রকাশ করেনি। এই ফাইনাল খেলায় তাকে খেলতে হবে এটা সে ধারণাও করেনি, সুতরাং তাকে খেলায় কথা বলায় সে দস্তুরমত ভীত হয়ে পড়লো। বিশেষ কারণ এবারের ফাইনাল খেলার বিপক্ষটিম মোহনবাগান। আই. এফ. এ. শীল্ডে এই প্রথম ফাইনাল যার দুই টিম হচ্ছে চির প্রতিদ্বন্দ্বী টিম ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। এই সম্মিলন এর

আগে কোন দিন হয়নি যদিও গত বৎসর শীল্ডে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল বটে। সেটা ছিল সেমি-ফাইনাল খেলা, কিন্তু এবার একেবারে ফাইনালে সাক্ষাৎ। এই খেলা দেখবার জন্যে বহু দূর দূর থেকে দর্শক এসেছে কলকাতায় এবং সত্যই অভূতপূর্ব্ব দর্শকসমাগম হয়েছিল যা এতাবৎকাল কোনদিনই হয়নি। অদ্যাবধি কোন খেলায় এত টাকাও সংগ্রহ হয়নি। উক্ত ফাইনাল খেলায় ৪৪,৫০০৲ টাকা সংগৃহীত হয়। যাই হোক ক্রীড়ামোদী দর্শক সাধারণ আশা করেছিলেন যে এ একটা দেখবার মত খেলা হবে, তা ছাড়া দুই টীমই শক্তিশালী ও তুল্যমূল্য। অনেকেই জানতে পারেনি যে ইষ্টবেঙ্গলের দুইটি বিশিষ্ট খেলোয়াড় এই খেলায় যোগদান করতে পারবে না। মোহনবাগান টিম সত্যিই শক্তিশালী টীম। ইষ্টবেঙ্গলও শক্তিশালী ছিল কিন্তু উপস্থিত রক্ষণভাগে দুইজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় খেলতে পাচ্ছে না সেইজন্য আর ততটা শক্তিশালী বলা যাচ্ছে না। যাই হোক এবারেও জোড়াতালি দিয়ে টীম নামাবাব বন্দোবস্ত করতে হয়। ব্যাক রাখাল মজুমদার অবশ্য খেলতে পারতো, কিন্তু তারও কি কারণ বশতঃ খেলায় যোগদান করা সম্ভব হলো না। তখন প্রায় খেলা ছেড়ে দেওয়া খেলোয়াড় এন. গুহ (বেবী)-কে ব্যাক পজিসনে নেওয়া হলো আর গোলরক্ষক অমিতাভ-কেই দাঁড় করানো হলো। বেবী গুহ সাইড হাফ, সেণ্টার হাফ পজিসনেই এতাবৎ খেলে এসেছেন—সেদিন শূন্যস্থান পূরণ করার দায়িত্বে তাঁকেই ব্যাক পজিসনে নামামো হলো। এদিকে খেলতে যাওয়ার পূর্ব্বক্ষণে সকলেই জার্সী গায়ে দিয়ে তৈরী হয়েছে এমন সময়ে পাগসলী এসে উপস্থিত। পাগসলী খেলার উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন নি, তিনি খেলা দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে বার্ণপুর থেকে এসেছেন, যদিও তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা খেলে গিয়েছেন বটে, কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমি-ফাইনাল খেলায় উপস্থিত ছিলেন না। ফাইনালে সোমানাকেই সেণ্টার ফরওয়ার্ড নির্ব্বাচন করা

হয়েছে এবং সোমানা জামা গায়ে চড়িয়ে খেলতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেই সময়েই পাগসলী এসে হাজির। তখন পাগসলীকে দেখে সোমানা নিজের গায়ের জার্সী খুলে পাগসলীর সামনে গিয়ে বললে যে, "দ্যাখ, মিঃ পাগসলী, আজ ফরোয়ার্ড রূপে তুমিই খেল। তুমি যদি না আসতে তবে আমিই খেলতাম এটা ঠিক. কিন্তু তুমি যখন এসে পড়েছ, তখন তুমিই খেলতে যাও। তুমি আমাদের অনেক সিনিয়র, তা ছাড়া খেলোয়াড় হিসাবে তুমি আমাদের চাইতে অনেক অভিজ্ঞ, অনেক বড়। এ ক্লাবে যোগদান করার পর এ রকম সুযোগ তুমি আর পাওনি। আমি দুবার ফাইন্যাল খেলেছি, একবার জিতেছিও সুতরাং আজকে তুমি খেল। এবার লীগ খেলাতেও তুমিই সর্বোচ্চ গোলদাতা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকে আমরা জিতবো যদিও রক্ষণভাগ আমাদের কিছুটা দুর্ব্বল, কিন্তু তার জন্য ভাবনা নাই—আমাদের ফরোয়ার্ড লাইন যথেষ্ট শক্তি শালী. এ আমি জোরের সঙ্গেই বলছি।" পাগসলী কিছুটা ওজর আপত্তি করলো বটে, কিন্তু সোমানার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে অগত্যা জার্সী গায়ে দিয়ে খেলতে গেল।

১৯৪৫ সাল ৯ই আগস্ট—সেদিন ক্যালকাটা গ্রাউণ্ড লোকে লোকারণ্য। অগণিত দর্শকে মাঠ ছেয়ে গেছে। আকাশও পরিষ্কার, মাঠের আবহাওয়া অতি চমৎকার। খেলার মাঠও শুক্নো খট্‌খটে। উভয় দলের খেলোয়াড়গণ যখন মাঠে নামলো তখন দর্শকদের মধ্যে নানাভাবের উদয় হলো। ইষ্টবেঙ্গলের সমর্থকদের মানসিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেল যেহেতু তারা দেখছে যে টীমের রক্ষণভাগ দুর্ব্বল, তা'ছাড়া ফাইনালে সেণ্টার ফরোয়ার্ড ছিল সোমানা,কিন্তু আজ সেও অনুপস্থিত, তার বদলে পাগসলী। যদিও পাগসলীর উপর দর্শক সাধারণের আস্থা ছিল বটে, তথাপি এই রূপ দুর্ধর্ষ গেমে পাগসলী কি কিছু করতে পারবে? এই রকম মনোভাব। সকলেরই মনে দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল। আর অন্যদিকে মোহনবাগানের সমর্থকগণ

মাঠে খেলোয়াড়গণের প্রবেশ মাত্রই খুব উল্লসিত হয়ে উঠলো। যেহেতু তারা দেখছে যে ইষ্টবেঙ্গলের চাইতে মোহনবাগাদের টীম যথেষ্ট বেশী শক্তিশালী। ইষ্টবেঙ্গলে কে. দত্ত নেই, পি. দাসগুপ্ত নেই তা'ছাড়া সোমানাও নেই। ব্যাকে এক বুড়ো খেলোয়াড়, ততোধিক পাগস্‌লী, ও আব কি করবে? দ্বিতীয়তঃ মোহনবাগানের রক্ষণভাগ, আক্রমণ ভাগ দুই-ই পুষ্ট সুতরাং মোহনবাগানের জয় অবশ্যম্ভাবী, এ আর আটকায় কে? ইত্যাদি জল্পনা হতে হতেই খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল যে উল্টো ফল দেখা যাচ্ছে, ক্রমশঃ ইষ্টবেঙ্গল দলের আক্রমণের চাপে পড়ে মোহনবাগান দল কোনঠাসা হয়ে পড়ছে, ইষ্টবেঙ্গলেব দিকে বল মোটেই আসছে না। ইষ্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক অমিতাভ মুখার্জি মাঠে নামার আগে ও পবে খুবই দুর্ব্বল মনোভাব দেখিয়েছিল, কিন্তু মাঠে নেমে তার বল ধরবার প্রয়োজনই হয়নি। অধিনায়ক ব্যাক পরিতোষ চক্রবর্ত্তী সেদিন অসম্ভব মনোবল নিয়ে খেলছিল। বিপক্ষের বল হাফ লাইন পাব হবার পূর্ব্বেই এগিয়ে গিয়ে বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে বলকে ওধারে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। মনে হয়েছে যে মাঠের মধ্যে ওই একটী খেলোয়াড়ই যেন দৈত্যের মত খেলছে। বাস্তবিক পরিতোষ চক্রবর্তীব সেদিনেব খেলা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জীবনে কোনদিন ভুলতে পারবে না বলেই আমার বিশ্বাস। ক্যালকাটা ক্লাবের অবিস্মরণীয় ব্যাক পিটার কলভিন সাহেবের খেলার কথা তখন মনে করিয়ে দিচ্ছিল। এদিকে ইষ্ট-বেঙ্গলের হাফ-ব্যাকত্রয়ও মরিয়া হয়ে খেলছিল। জগা চন্দ, কাইসার, মহাবীর, বিপক্ষ ফরোয়র্ডকে বল ধরবার সুযোগই দিচ্ছিল না। মোহনবাগানের ফরোয়ার্ড লাইনে বিখ্যাত খেলোয়াড় বুচি, রাইট আউট নির্মল চাটার্জি প্রাণপণ চেষ্টা কবেও আক্রমণধারা রচনা করতে পারছিল না। বিজন, নিমু ও নির্মল মুখার্জি যেন অবশ হয়ে পড়ছিল। মোহনবাগানের রক্ষণভাগে অধিনায়ক অনিল দে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ইষ্টবেঙ্গলের আক্রমণ ধারাকে প্রতিহত করতে সক্ষম

হয়নি। কোথায় গেল সেদিন শরৎ দাস ও শৈলেন মান্নার চমৎকার খেলা। কোথায় গেল টি. আও-এর রক্ষণকার্য্যে অপূর্ব দৃঢ়তা? সব যেন ভেঙ্গে তছনচ হয়ে গেল। আপ্পারাও, সুনীল ঘোষ যেন মরিয়া হয়ে খেলতে লাগলো। লেফট আউট নায়ার কেবল সুযোগ খুঁজছিল কখন তার কাছে বল আসে। বল অবশ্য আসছিল বটে, কিন্তু অনিল দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নায়ার প্রকৃত সুযোগ করে উঠতে পারছিল না। পাগস্লীও দর্শনীয় পাস দিচ্ছিলেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষ দিকে সুনীল ঘোষ একটী তীব্র সট গোল লক্ষ্য করে মারলো, বলটী গোলরক্ষক ডি. সেন থাবা দিয়ে আটকালো বটে কিন্তু ধরতে পারলোনা। বলটী গড়িয়ে দশ বারো হাত দূরে গিয়ে পড়লো, সামনেই ছিল পাগস্লী, তিনি অতর্কিতে বলটী ধরে ফেললেন এবং ডান পায়ের সাহায্যেই বলটী গোলের মুখে দ্রুত ঠেলে দিলেন। বলটী বিনা বাধায় গোলে প্রবেশ করলো। সাধারণতঃ পাগস্লী গোলে সট মারতেন বাঁ পায়ের সাহায্যে কিন্তু এখানে তিনি তা করেন নি। দেখলেন যে ডান পা থেকে বাঁ পায়ে বল নিতে যে সময় টুকুর দরকার সেই সময়ের মধ্যে ডান পায়ের ঠেলাতেই বল গোলে ঢুকে পড়বে। কার্যতঃ হলোও তাই। তারপর আর যায় কোথা? ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়বা এব পর যেন হাওয়ায় উড়তে লাগলো। মোহনবাগানের খেলোয়াড়গণ গোল হওয়ার পর এক দম স্তিমিত হয়ে পড়লো। মিনিট দশেক পর সমাপ্তির বাঁশী বেজে উঠলো। ১—০ গোলে ইষ্টবেঙ্গলের জয় হলো। খেলা পরিচালনা অতি উত্তম হয়েছিল। তা'ছাড়া ঐ খেলায় কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনাও দৃষ্ট হয়নি। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এই প্রথম ডাবল বিজয়ী আখ্যা পেল। ফাইনাল খেলার টীম ছিল এইরূপ :—

ইষ্টবেঙ্গল—এ. মুখার্জি, এন. গুহ, পি. চক্রবর্ত্তী (অধিনায়ক), ডি. চন্দ, কাইসার, মহাবীর, টীটু কর, আপ্পারাও, পাগস্লী, সুনীল ঘোষ, নায়ার।

মোহনবাগান—ডি. সেন, শরৎ দাশ, শৈলেন মান্না, অনিল দে,

( অধিনায়ক ), টী. আও, দ্বিপেন সেন, নির্ম্মল চাটার্জ্জি, বুচি, বিজন বসু, নিমু বসু, নির্ম্মল মুখার্জ্জি।

রেফারী—সার্জেন্ট ম্যাকব্রাইড।

খেলাব শেষে অবিভক্ত বাংলার চীফ মিনিষ্টার ও আই. এফ. এ.র তদানীন্তন সভাপতি খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের উপস্থিতিতে লেডী রানু মুখার্জি পুরস্কার বিতরণ করেন। ইষ্টবেঙ্গল টীম সে বৎসর কোচবিহার-কাপ বিজয়ীও হয়। সে বৎসর ইষ্টবেঙ্গল টীম বোম্বাই রোভার্স কাপ খেলতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারেনি। প্রথম খেলায় ১১—০ গোলে জয়লাভ করেও দ্বিতীয় খেলায় কাপ-হোল্ডার মিলিটারী পুলিশ টীমের কাছে ১—০ গোলে হেরে আসে। সে বৎসর সন্তোষ ট্রফির খেলা বোম্বাইতে হয়েছিল। বাংলা দল সন্তোষ ট্রফি জয় করে। বাংলা দলে খেলোয়াড় ছিল—

গোল—ডি সেন, ( মোহনবাগান ), ইসমাইল ( ভবানীপুর )

ব্যাক—পি. চক্রবর্ত্তী ( ইষ্টবেঙ্গল ), অধিনায়ক, তাজ মোহাম্মদ ( ভবানীপুর ), শরৎ দাস ( মোহনবাগান )

হাফব্যাক—কাইসাব ( ইষ্টবেঙ্গল ), টি. আও ( মোহনবাগান ), মহাবীব ( ইষ্টবেঙ্গল )

ফবোয়ার্ড—রবি দাস ( ভবানীপুর ), আপ্পারাও, পাগসলী, সুনীল ঘোষ ( ইষ্টবেঙ্গল ) সন্তোষ নন্দী ( বি. এণ্ড. এ. আর. ) সহঃ অধিনায়ক।

ম্যানেজার এল. আর. পেণ্টনী ( কাষ্টমস্ )—আই. এফ. এ.র সেক্রেটারী।

সন্তোষ ট্রফির একটী খেলায় বাংলা দল রাজপুতনা একাদশ দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। সেণ্টার ফবোয়ার্ডরূপে পাগসলী একাই উক্ত ৭টী গোল দেন। ইহা বিশ্ব রেকর্ড। ভারতবর্ষে এ রকম রেকর্ড এর আগেও নাই পরেও নাই। ইষ্টবেঙ্গলের পক্ষে

রোভার্স কাপের খেলায় ১১--০ গোলের মধ্যে পাগস্‌লী ৮টী গোল একাই দেন।

এইবার পাগস্‌লী সম্বন্ধে কিছু লেখা যাক। ১৯২৫ থেকে ১৯৪০ পর্য্যন্ত পাগস্‌লী সমগ্র প্রাচ্য দেশের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অনন্য-সাধারণ খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৪১ সালের শেষ দিকে তিনি বর্মা থেকে পালিয়ে ভারতে চলে আসেন। সে কথা পূর্বেই বলেছি। ১৯৪২ সালে ইষ্টবেঙ্গলে যোগদান করে মাত্র ৩টী খেলায় নেমেছিলেন শারিরীক অপুটতার জন্য সে বছর আর কিছু করতে পারেন নি। ১৯৪৩ সালেও রীতিমত খেলায় যোগ দিতে পারেননি। মাঝে মাঝে খেলেছেন। ১৯৪৪ সালে প্রায় না খেলার মতই বলা চলে কারণ চাকুরীর জন্য তিনি খেলায় যোগ দিতে পারেন নি কিন্তু ১৯৪৫ সালে ছুটীর ব্যবস্থা অনেকটা সুবিধা করে নিয়েছিলেন বলেই প্রায় খেলাতেই তিনি যোগ দিয়াছেন এবং তাঁর পুর্বের সেই মন মাতানো খেলা আর ছিলনা বটে, কিন্তু যে-টুকুই খেলেছেন তাতেই দর্শক সাধা-রণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছেন। শেষ দিকের খেলায় তাঁর কার্যকরী শক্তিই প্রকাশ পেতো বেশী। গোলের সামনে বল পেয়ে সট নিতে পারলে আটকায় কার সাধ্যি। কামানের গোলার মতন বল গোলে ঢুকতো। গোলকিপার সভয়ে বল ছেড়ে দিতো। সন্তোষ ট্রফির এক খেলায় ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে মাদ্রাজের গোলকীপার পাগস্‌লীর সট আটকাতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে মাঠে পড়ে যায়। মেডিক্যাল এগজামিনে জানা যায় যে তার বুকের তিনটি হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে। তাঁর খেলা যারা প্রত্যক্ষ দেখেছেন তারাই বুঝতে পারেন তিনি কত বড় খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু অত বড় খেলোয়াড় হয়েও তাঁর কোনরূপ অহমিকা ছিলনা—তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল, অমায়িক ও হাসি-খুসী মাখা লোক। তাঁর চেয়ে কমবয়স্ক খেলোয়াড়দের সঙ্গেও তিনি অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার করেছেন। এরকম মধুর-চরিত্র খেলোয়াড় খুব কম দেখা যায়। ১৯৪৬ সালে

তিনি খেলায় যোগ দিতে পারেননি। ১৯৪৭ সালেও তিনি আই. এফ. এ. শীল্ডের সেমিফাইনালে খেলে ১গোল দিয়ে বি, এণ্ড এ. আর. টীমকে হারিয়ে দেন। তারপর তিনি বর্মা চলে যান। যদিও এরপর তিনি আর একবার কলকাতা এসেছিলেন ১৯৪৮ সালে বর্মা টীমকে নিয়ে। তারপর আর তাঁর কলকাতা আসা হয়নি। ১৯৫৮ সালে তিনি অকালে পরলোক গমন করেন। খেলোয়াড় হিসাবে শুধু নয় মানুষ হিসাবেও তিনি অবিস্মরণীয়।

১৯৪৬ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে আবার জেনারেল সেক্রেটারী পরিবর্ত্তন হলো। গত সিজন অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৫ সাল পর্যন্ত ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন স্বনামখ্যাত ব্যারিষ্টার জে. সি. গুপ্ত মহাশয়। তাঁর কর্ম্মপ্রচেষ্টা কোন অংশে নিন্দনীয় ছিল না, কিন্তু ক্লাবের আভ্যন্তরীণ কূট চক্রান্তে তিনি উক্তপদ থেকে অপসারিত হলেন। তাঁর অপসারণে ক্লাবের সত্যিকার দরদী সভ্যগণ নিতান্ত দুঃখিত হয়েছিলেন, এ কথা অবিসম্বাদী সত্য। এর পর উক্তপদ যিনি গ্রহণ করলেন তিনি এতদিন কার এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র গুহ।

সে বৎসর ইষ্টবেঙ্গল টীমের খেলোয়াড়দের ও কিছু রদ-বদল হয়। প্রথমেই গোল রক্ষক কে. দত্ত ক্লাব ছেড়ে চলে যান। নূতন একজন গোলরক্ষক আনা হয় কালীঘাট টীম থেকে, তার নাম প্রভাত মুস্তফী উক্ত প্রভাত মুস্তফী অল্পবয়সে "বয়েজ ইষ্ট বেঙ্গল" নামক ছেলেদের টীমে খেলতো। ১৯৩৪-৩৫ সালে বিডন স্কোয়ারে চৌদ্দ বৎসরের নিম্নবয়সী ছেলেদের নিয়ে গঠিত কয়েকটি টীম সিক্স্‌-এ-সাইড গেম ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রচলন করেছিল। কিছুসংখ্যক উৎসাহী ক্রীড়ামোদী ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে এইরূপ খেলায় প্রবর্ত্তন করেছিলেন। বিডন স্কোয়ারে 'বেঙ্গল বয়েজ ফুটবল এসোসিয়েসন' নাম দিয়ে একটি ক্রীড়া-সংস্থা স্থাপিত হয়। এবং কয়েকটি প্রতিযোগিতাও পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে

"বয়েজ ইষ্টবেঙ্গল" টীমটি ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। এই টীমটি ছেলেদের এই সব প্রতিযোগিতার অধিকাংশগুলিতেই জয়লাভ করতো। ১৫।১৬ টা টীমের মধ্যে এই বয়েজ ইষ্টবেঙ্গল টীমটিই ছিল বিশেষ শক্তিশালী। উক্ত বয়েজ ইষ্টবেঙ্গল টীমের প্রভাত মুস্তফী, সুধা দত্ত রায়, সুশান্ত মুখার্জি; গৌর ঘোষ, জীবন পাল ও সেলিম প্রভৃতি বালকেরা পরবর্ত্তী কালে বড় বড় টিমে খেলেছে। প্রভাত মুস্তফী (গোলরক্ষক) কালীঘাট ও ইষ্টবেঙ্গলে, সুশান্ত মুখার্জী এরিয়ান ও ইষ্টবেঙ্গলে, জীবন পাল, গৌর ঘোষ কুমারটুলী টীমে সেলিম মোহনবাগানে খেলে বেশ নাম করেছিল।

যাই হউক প্রভাত মুস্তফী (গোলরক্ষক) ইষ্টবেঙ্গলে সেই বৎসর যোগদান করে। ব্যাক যারা ছিল তারাই রইল, হাফ ব্যাকও প্রায় তথৈবচ, কেবল মহাবীর মোহনবাগানে চলে গেল। ফরোয়ার্ড লাইনে একটু রকমফের হলো। সোমানা সে বৎসর আর কলকাতায় এলো না পাগসলীও প্রায় তাই। সেণ্টার ফরোয়ার্ডের নিতান্ত অভাব অনুভূত হলো। লীগ খেলা আরম্ভ হওয়ার পর একে তাকে দিয়ে কাজ চালানো হতে লাগলো। অন্যান্য দিকে টিম শক্তিশালী ছিল, সেইজন্য টিম প্রায় জিতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিনা সেণ্টার ফরোয়ার্ডে কদিন চালানো যায়? ক্লাবকর্ত্তৃপক্ষ অনেক চিন্তা করে নায়ারকে সেণ্টার ফরোয়ার্ড খেলানো যায় কিনা? সে বিষয়ে মতামত নেওয়ার জন্য তাকেই জিজ্ঞাসা করা হয়। তাতে নায়ার উত্তর করে যে,"আমাকে দিয়ে যে কোন পজিসনে খেলাতে পারেন, আমার তাতে কোনও আপত্তি নাই তবে ফরোয়ার্ডে রাখলেই ভাল ফল পাবেন আশা করি।" তারপর নায়ারকেই সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে নামান হলো। লীগের প্রথম সাতটি গেম হয়ে যাবার পর নায়ার সেণ্টার ফরোয়ার্ডরূপে খেলতে থাকে। নায়ার প্রথম খেলাতেই ৪টি গোল করে বসে। তারপর প্রায় দিনই ২টি, ৩টি, ৪টি করে গোল করতে থাকে। নায়ার ১৭টি গেম খেলে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫টি গোল করে। ভারতবর্ষে সর্ব্বোচ্চ

গোলদাতা হিসাবে আর কেউ এত বড় রেকর্ড করতে পারেনি অদ্যাবধি। মোহনবাগানের সঙ্গে নায়ার সে বছর কোন গোল করতে পারেনি বটে, তবে গোল করার সুবিধা করে দিয়েছিল। মোহন-বাগানের সঙ্গে ১ম খেলায় প্রথমার্দ্ধে মেওয়ালাল (সেই বৎসর মেওয়া লাল মোহনবাগানে খেলছিল) হাত দিয়ে ১টি গোল করে, অবশ্য রেফারীর দৃষ্টির আড়ালে। রেফারী সত্য সত্যিই দেখতে পায়নি, তিনি গোল ডিক্লেয়ার করেন, কিন্তু বহু দর্শক এটা দেখতে পেয়েছিল যাই হউক মিনিট দশেক পর নায়ার একটি বল নিয়ে গোলে সট নিতে যাবেন এমন সময় সামনে বাধা পেয়ে বলটী ঠেলে সালেকে পাস করেন। সালে প্রাপ্ত সুযোগের সৎব্যবহার করেন অর্থাৎ গোল করেন ১—১ গোলে খেলা ড্র হয়ে যায়।

২য় গেমে ইষ্টবেঙ্গল ড্র করলেও চ্যাম্পিয়ানশিপ পেয়ে যায়, আর মোহনবাগান জিতলে তারাই চ্যাম্পিয়ানশিপ পায়। খেলা শেষ পর্য্যন্ত গোল শূন্য ড্র হয়। ইষ্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান শিপ লাভ করে। মোহনবাগান খুবই চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইষ্টবেঙ্গল ২৪টী গেম খেলে ২০টী জয়, ৩টী ড্র ও একটি পরাজয়। স্বপক্ষে ৭০ টি গোল, বিপক্ষে ১১ গোল মোট পয়েন্ট ৪৩। একমাত্র পরাজয় হয়েছিল মোহামেডানের সঙ্গে লীগের প্রথমার্দ্ধে ১—০ গোলে। সে বৎসর টিমের অধিনায়ক ছিলেন আপ্পারাও। লীগখেলার শেষে আপ্পারাও বলেছিলেন যে এ বৎসর লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের অর্দ্ধেক কৃতিত্ব নায়ারের প্রাপ্য। লীগের শেষ খেলা হয়েছিল মোহনবাগানের সঙ্গে সেই খেলায় রেফারী ছিলেন সার্জেন্ট ম্যাক ব্রাইড। তিনি অনবধানতাবশতঃ ৪ মিনিট কম খেলিয়েছিলেন। এর পর অবশ্য সার্জেন্ট ম্যাক ব্রাইড আর রেফারী-গিরি করেননি। ইহাই তাঁর শেষ খেলা এই খেলার শেষে উভয় দলের কিছু সংখ্যক সমর্থক ক্লাব তাঁবুতে এক অবাঞ্ছিত অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত করে। সেই ঘটনার বিবরণ এখন আর উল্লেখ না করাই ভাল।

তারপর আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলা আরম্ভ হয়। বেশ ভালভাবেই আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলা চলছিল, তৃতীয় রাউণ্ডের খেলা প্রায় শেষ, একটি মাত্র খেলা বাকী। সেই খেলাটি চ্যারিটি ম্যাচ বলে গণ্য ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী টীম দুইটির একটি ছিল দিল্লীর মোগল ক্লাব অপরটি ট্রেডস্ ক্লাব অব বোম্বাই কিন্তু উক্ত খেলাটি ও পরবর্ত্তী অন্যান্য সমস্ত খেলাই বরবাদ হয়ে যায় কুখ্যাত হিন্দু মুস্‌লিম দাঙ্গার জন্য। ইষ্টবেঙ্গল টীম তৃতীয় রাউণ্ডে আজমীর (রাজপুতনা) খাজানা ক্লাবকে ১—০ গোলে হারিয়ে চতুর্থ রাউণ্ড বা কোয়ার্টার ফাইনালে জর্জ টেলিগ্রাফ টীমের বিপক্ষে উপস্থিত হয়েছিল। তা ছাড়া চতুর্থ রাউণ্ডে মোহামেডান বনাম বি. এণ্ড এ. আর., মোহনবাগান বনাম ত্রিপুরা পুলিশ, ভবানীপুর বনাম ট্রেডসক্লাব ও মোগল ক্লাব বিজয়ী এই অবস্থাছিল।

১৫ই আগস্ট মাঠে একটি মাত্র খেলছিল, গ্রীফিথ শীল্ডের ফাইনাল—ইষ্টবেঙ্গল বনাম মোহানেডান স্পোর্টিং। খেলায় ইষ্টবেঙ্গল মোহামেডানকে ২—০ গোলে পরাজিত করে গ্রীফিথ শীল্ড বিজয়ী হয়। তারপর দিন ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ সাল। মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস। সেই দিন থেকেই ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা আরম্ভ হয়। আর কোথায় তখন খেলা-ধুলা! কলকাতার জনসাধারণ প্রাণভয়ে ভীত—দরজা-জানালা বন্ধ করেও থাকা যাচ্ছিল না, বাইরে বেড়োনোত দূরের কথা। সুতরাং খেলা-ধুলা একে কারে নস্যাৎ হয়ে যায়। এই দাঙ্গার হুজ্জতে পড়ে খেলা-ধুলাত দূরের কথা, জীবন ধারণ করে থাকাই কলকাতার লোকের পক্ষে দায় হয়ে পড়েছিল। একথা অবশ্য কলকাতাবাসী নরনারী কারো অজনা নয়। দাঙ্গা হাঙ্গামা যখন চুকলো তখন প্রায় বছর খানেক গড়িয়ে গেছে। অবশ্য মাঠ একেবারে ফাঁকা যায়নি। ক্রিকেট খেলা কিছু কিছু হয়েছে বটে, তবে রীতিমত হয়নি—এই ভাবেই ১৯৪৬ সাল শেষ হয়ে যায়।

১৯৪৬ সালে যারা টীমে খেলেছিল—

গোলে—প্রভাত মুস্তফী, এস. চক্রবর্ত্তী, এন. মিত্র, এ. মুখার্জি
ব্যাক—রাখাল মজুমদার, পি. চক্রবর্ত্তি, পি দাশগুপ্ত, আর. গাঙ্গুলী।
হাফ ব্যাক—ডি. চন্দ, কাইসার. এন. রায়, কে. সেন, শিশির ঘোষ, জে দাশগুপ্ত
ফরোয়ার্ড—টিটুকর, আপ্পারাও ( অধিনায়ক ), নায়ার, সুনীল ঘোষ, সালে, এস গড়গড়ি, এস. তালুকদার ( ছোট ) আর. চৌধুরী।

১৯৪৭ সাল। কলকাতার দাঙ্গার হাঙ্গামা তখনও শেষ হয়নি—চোরাগোপ্তা মার চলছিল, বিশেষ ছুরী চালানো। তাতে করে অনেক পথিক ঘায়েল হয়েছে, আর সেই কারণে মাঠের খেলা ধুলাও পুরোপুরি ভাবে আরম্ভ করতে কেউ সাহস পাচ্ছিলনা। ক্রিকেট, হকি এসব খেলা কিছুটা হয়েছিল বটে, কিন্তু ফুটবল লীগ খেলতে কারোর উৎসাহ ছিল না। বিশেষ করে দর্শকগণ বড় একটা মাঠে যেতোই না। যদিও কিছুসংখ্যক লোক মাঠের মায়া পরিত্যাগ করতে না পেরে মাঠে যেতো বটে, তবে তাদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য। এইসব কারণে লীগ খেলা স্থগিত থাকে। এদিকে ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাসে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিবেন্দ্রম থেকে ইষ্টবেঙ্গল টীমের কাছে এক আমন্ত্রণ পত্র আসে, তাদের ওখানে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল টুর্ণামেণ্টে খেলবার জন্য। ইষ্টবেঙ্গল সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং খেলতেও যায়। সে বৎসর কয়েকজন নূতন খেলোয়াড় টীমে যোগদান করেছিল তাদের নিয়েই টীম পাঠানো হয়। উক্ত টুর্ণামেণ্টে ভাল ভাবে খেলে ফাইনালে দিল্লী ইউনিয়ন টীমকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে উক্ত ট্রফি জয় করে নিয়ে আসে। ত্রিবেন্দ্রামে ১১ই মার্চ্চ ১৯৪৭ তারিখে উক্ত ফাইনাল খেলাটি হয়। ফাইনালে টীম ছিল এইরূপ।

ইষ্টবেঙ্গল—পি. মুস্তফী, পি. চক্রবর্ত্তী, ডি. পাল, নগেন রায়,
কাইসার, ডি. গুহ, টিটু কর, আপ্পারাও (অধিনায়ক),
বিকাশ দাশগুপ্ত, সুনীল ঘোষ, সালে।

দিল্লী ইউনিয়ন—এফ. মোহাম্মদ, মহম্মদ আলী, কামারুদ্দিন,
এরফিন, সৈয়দ, বি. দত্ত, এম. হোসেন, এ. আলী,
মহবুব, এম. আমেদ, সামশেদ আলী।

সুনীল ঘোষ ১, বিকাশ দাশগুপ্ত ১ গোল দিয়েছিল।

*   *   *   *

সে বৎসরের প্রথম ভাগে টীমের খেলোয়াড় রদ-বদল হয়েছিল। ইষ্টবেঙ্গল টীমে খেলতে আসে ভবানীপুর থেকে ব্যাক দেবু পাল, হাফব্যাক ডি, গুহ, কালীঘাট থেকে ফরোয়ার্ড বিকাশ দাসগুপ্ত ও সুশান্ত মুখার্জি। আর বিখ্যাত ফরোয়ার্ড নায়ার অনৈক কর্ম্মকর্ত্তার দুর্ব্ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে ক্লাব পরিত্যাগ করে মোহনবাগান ক্লাবে গিয়ে যোগদান করে।

ক্রমে ক্রমে আগস্ট মাস এসে গেল। ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ সাল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার নূতন সূর্য্যোদয়। সেইদিন থেকে দেশ শান্ত হল। মাঠেও লোক সমাগম হতে লাগলো। আই. এফ. এ.র কর্ম্ম-কর্ত্তারা খেলা সম্বন্ধে পুনরায় তৎপর হলেন। লীগ খেলানো ত সম্ভব হয়নি. এখন শীল্ড খেলাটা আরম্ভ করা যায় কিনা। যাই হউক চেষ্টা করে শীল্ড খেলার বন্দোবস্ত হলো। বাইরে থেকে কোন টিম এলোনা বটে, তবে জলপাইগুড়ি জেলা একাদশ টীম যোগদান করেছিল মাত্র। আর বাদ বাকী কলকাতার স্থানীয় টীম নিয়েই খেলার তালিকা প্রস্তুত হলো। সর্ব্বশুদ্ধ ২১টি টীম নিয়ে খেলা আরম্ভ হলো। শেষ পর্য্যন্ত থোববড়ি খাড়া আর খাড়া-বড়ি থোর-ই-হলো অর্থাৎ পুনরায় ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ফাইনালে উপনীত হলো। ইষ্টবেঙ্গল সেমিফাইনালে বি. এণ্ড এ. আর. দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। উক্ত খেলায় পাগস্‌লী যোগদান করেছিলেন এবং

তিনিই গোল দিয়ে খেলা জিতেছিলেন। ইষ্টবেঙ্গল টীমে ইহাই তাঁর শেষ খেলা। উক্ত খেলার একদিন পর ফাইনাল খেলার তারিখ পড়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেইদিন ফাইনাল খেলা হলো না। যেহেতু কিছুসংখ্যক দর্শক ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের বেষ্টনীর বেড়া ভেঙ্গে মাঠে ঢুকে পড়েছিল সেইকারণে কর্তৃপক্ষ খেলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তারপর প্রায় ছয় সপ্তাহ (দেড় মাস) বাদ দিয়ে খেলার তারিখ পড়ে। ১৫ই নবেম্বর উক্ত ফাইনাল খেলা হয়। ইষ্টবেঙ্গল টিমে পাগস্‌লী ও আপ্পারাও সেদিন অনুপস্থিত ছিল। কি কারণে তাঁরা খেলতে পারেন তার সদুত্তর ক্লাবকর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। খেলার দিন পর্য্যন্ত দর্শক ও সদস্যদের বলা হয়েছে যে পাগস্‌লী ও আপ্পারাও নিশ্চয়ই খেলবে। অথচ তারা সেদিন কলকাতায় ছিল না। প্রথম তারিখের দিন পাগস্‌লী কলকাতায় ছিলেন, তারপর তিনি বর্মায় চলে যান। কথা ছিল খেলার তারিখ স্থির হলে তাঁকে সংবাদ দেওয়া হবে এবং তিনি এসে খেলবেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁকে সংবাদই দেওয়া হয়নি। আপ্পারাওয়ের বেলায়ও তাই। যাই হউক শেষ পর্য্যন্ত খেলা হলো বটে, ইষ্টবেঙ্গল টিম সেদিন পরাজয়ের গ্লানি বহন করে মাঠ থেকে ফিরে এলো। আর মোহনবাগান ১৯৪৫ সালের ফাইনালের প্রতিশোধ গ্রহণ করলো ১—০ গোলে জয়লাভ করে। দীর্ঘ ২৬ বৎসর পর মোহনবাগান পুনরায় অথবা ২য় বার শীল্ডে নাম খোদাই করে। শীল্ডের ফাইনালে টীম ছিল এইরূপ:—

মোহনবাগান—ডি. সেন, শরৎদাস (অধিনায়ক), শৈলেন মান্না, অনিল দে, টি. আও, মহাবীর প্রসাদ, ডি. রায়, বিজন বসু, সেলিম, নায়ার, এ. দাশগুপ্ত (ঝণ্টু)।

ইষ্টবেঙ্গল—পি. মুস্তফী, রাখাল মজুমদার, পি. চক্রবর্ত্তী, ডি. চন্দ, কাইসার, নগেন রায় (অধিনায়ক), সুশান্ত মুখার্জি, এস. ভট্টাচার্য্য, বি. দাশগুপ্ত, এস. ঘোষ, সালে।

রেফারী—সুশীল ঘোষ।

মোহনবাগানের সেণ্টার ফরোয়ার্ড সেলিম গোল করে। কোন দলের খেলাতেই তেমন কোন দর্শনীয় কিছুই ছিল না। যেন তেন প্রকারেণ করে খেলা শেষ হলো। মোহনবাগান কোনরকমে একটি সুযোগ পেয়েছিল তারই সদ্‌ব্যবহার তারা করে নিয়েছিল। ইষ্টবেঙ্গলের হাফব্যাক লাইন ও ফরোয়ার্ড লাইনের খেলা খুবই খারাপ পর্য্যায়ের হয়েছিল, তবু সুযোগ পেয়েছিল গোল করার, কিন্তু কার্য্যকরী করতে পারেনি। খেলার মাঠের দর্শকসংখ্যাও তথৈবচ অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের অফসিজনের খেলায় আর কতলোক হবে! সেদিন পুরস্কার বিতরণ করেছিলেন মোহনবাগানের পৃষ্ঠপোষক ও তৎকালীন অস্থায়ী গভর্ণর স্যার বি. এল. মিত্র।

১৯৪৮ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমের বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নাই। প্রথমে টীমের খেলোয়াড় অদল-বদল হলো, যথা গত বৎসরের খেলোয়াড় বিকাশ দাশগুপ্ত, দেবুপাল, ডি. গুহ ও সুশান্ত মুখার্জি এঁরা তাদের পূরানো ক্লাবে চলে গেল। আর নূতন কয়েকজন খেলোয়াড় ক্লাবে এসে যোগদান করল। তন্মধ্যে ব্যোমকেশ বসু (ব্যাক), এস. মুখার্জি (গোলরক্ষক), কাশীমিত্র (হাফ), এস. মুস্তফী খ্যাতিমান। তা ছাড়া দিল্লী থেকে আজিজ নামে একজন সেণ্টার হাফ খেলোয়াড় এলো। উক্ত আজিজ খুব উচ্চাঙ্গের খেলোয়াড় ছিল না, কোন রকম কাজ চালানো গোছের খেলোয়াড়। হায়দরাবাদ পুলিশ টীমের রাইট আউট মইনুদ্দিন ও বাঙ্গালোর থেকে সেণ্টার ফরোয়ার্ড সাম্পাঙ্গী, ফরোয়ার্ড ভেঙ্কটেশ এসে যোগদান করলো। উক্ত ভেঙ্কটেশ ও সাম্পাঙ্গাকে লক্ষ্মীনারায়ণ পাঠিয়েছিল। সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে সাম্পাঙ্গী কিছুটা ভালই খেলা দেখিয়েছিল, কিন্তু ইনসাইড ফরোয়ার্ড হিসাবে ভেঙ্কটেশ কিছুই করতে পারেনি। শেষ দিকে ভেঙ্গটেশকে রাইট আউটে খেলতে দেওয়া হয় এবং তখনই সে উক্ত পজিসনে পাকাপোক্ত হয়ে যায়। পরবর্ত্তী কালে রাইট আউট

হিসাবে ভেঙ্কটেশ যে খেলা দেখিয়েছে তা' অতুলনীয়। এতাবৎকাল ভারতীয় সাইডে যে সকল রাইট আউট নাম করে গেছে ভেঙ্কটেশ সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। যাক্, ক্রমে এ সকল কথা বলা হবে। সে বৎসর লীগ খেলায় ইষ্ট বেঙ্গল মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। মোহনবাগানের সঙ্গে প্রথম লীগের খেলায় ড্র হয় দ্বিতীয় খেলায় মোহনবাগান জয়লাভ করে। লীগ চ্যাম্পিয়ান হলো মোহামেডান স্পোর্টিং টীম এবং অপরাজিত থেকে। ৩৪ সাল থেকে মোহামেডান খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে সাত বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে কিন্তু কোন বারেই অপরাজিত আখ্যা নিতে পারেনি। এ বৎসর অষ্টমবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হলো অপরাজিত থেকেই। তারপর শীল্ড খেলা আরম্ভ হলো। ইষ্ট বেঙ্গল সেমিফাইনাল পর্য্যন্ত উঠলো। সেই সেমিফাইনালের প্রতিদ্বন্দ্বী টীম ছিল ভবানীপুর টীম। সেদিন ভবানীপুর যে খুব একটা চমৎকার খেলা খেলেছিল এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু রেফারী সন্মথ দত্ত ইষ্টবেঙ্গল টীমকে আর বেশী অগ্রসর হতে দিতে একান্ত নারাজ ছিলেন, সেই কারণে যেন তেন প্রকারেন জবরদস্তি ইষ্ট বেঙ্গলকে দমিয়েদিলেন। ইষ্ট বেঙ্গল ২—১ গোলে উক্ত খেলায় পরাজিত হলো। মাঠের দর্শকগণ এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সকলেই আশা করেছিল যে ইষ্ট বেঙ্গলই জিতবে, কিন্তু কার্য্যকালে হয়ে গেল অন্যরূপ এবং তার জন্য রেফারীই যে সম্পূর্ণ দায়ী মাঠের দর্শকবৃন্দ এটা ভালভাবেই উপলব্ধি করেন।

সে বৎসর ইংলণ্ডে নূতন পর্য্যায়ে অলিম্পিক গেম হয়েছিল, সেই-জন্য ভারতবর্ষের হকি ও ফুটবল টিমকে তারা আমন্ত্রণ জানায়। ভারতীয় উভয় দলই সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং খেলবার জন্য টীম পাঠায়। চীন দেশ থেকে তাদের এক ফুটবল টীম উক্ত অলিম্পিক গেমে খেলবার জন্য যাওয়ার পথে কলকাতায় আসে এবং এইখানে ২।৩টি গেম খেলে তন্মধ্যে ইষ্ট বেঙ্গল টীমের সঙ্গেও তাদের একটা গেম হয়। উক্ত গেমে চীনা অলিম্পিক টীম ইষ্টবেঙ্গলের নিকট

২—০ গোলে পরাজিত হয়। ইষ্ট বেঙ্গল টীম সেদিন খুবই অনুপ্রাণিত হয়ে খেলেছিল এবং টীমের সুনাম রক্ষাও করেছিল। ১৯৪৮ সালে ইষ্ট বেঙ্গল টীমের এইটাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য খেলা বলা চলে। উক্ত খেলায় টীম ছিল এইরূপ। যথা—

ইষ্ট বেঙ্গল—গোলে—এস. মুখার্জি (ফ্যান্সী), ব্যাকে—ব্যোমকেশ বসু ও রাখাল মজুমদার; হাফে—ডি. চন্দ (অধিনায়ক), আজিজ, কাশী মিত্র; ফরোয়ার্ডে—ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, এস, মুস্তফী, সুনীল ঘোষ, সালে।

চীনা অলিম্পিক একাদশ—চ্যং পু লিং, হাও ইয়াং স্যাং, ইয়েন সি স্যান, চিয়াং কান হং, কাউ প চিং. সেং লি সিং, লো চেং স্যাং, হো ই ফ্যান, চু উইং কিয়াং, লী চাই কাই, চৌ মেন চী ( অধিনায়ক )

রেফারী—নৃপেন সেন।

এই খেলায় আপ্পারাও ও সালে গোল দিয়াছিলেন। ১৭ই জুলাই ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে খেলা হয়। চৈনিক টীমের ম্যানেজার হয়ে এসেছিলেন তাদের ভূত পূর্ব্ব সেঃ ফঃ—লি ওয়াই টং।

১৯৪৮ সালের ইষ্ট বেঙ্গল টীমের খেলোয়াড়গণ—

গোলে—সত্যেন মুখার্জি ( ফ্যান্সী ), প্রভাত মুস্তফী।

ব্যাকে—ব্যোমকেশ বসু, মোজাম্মেল, রাখাল মজুমদার, পি. চক্রবর্ত্তী

হাফে—ডি. চন্দ ( অধিনায়ক ), কাইসার, আজিজ, কাশী মিত্র।

ফরোয়ার্ডে—ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, সাম্পাঙ্গী, এস. মুস্তফী, সুনীল ঘোষ, সালে।

১৯৪৯ সাল ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের বিশেষ স্মরণীয় বৎসর, যেহেতু এই বৎসর ক্লাব ফুটবলে 'ত্রিমুকুট বিজয়ী'—আখ্যা লাভ করে। আই. এফ. এ. শীল্ড, রোভার্স কাপ ও ডুরাণ্ড কাপ এই তিনটি প্রতিযোগিতায় অর্জিত জয়স্মারক বস্তুই 'ভারতীয় ফুটবলে ত্রিমুকুট'। কিন্তু ১৯৪৯ সালে ডুরাণ্ড খেলা বন্ধ ছিল। ১৯৪০ সালে দিল্লীতে ডুরাণ্ড কাপ খেলা হয় তাবপব উক্ত ডুরাণ্ড কপের খেলা বন্ধ থাকে। কারণ তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছিল। বিশেষ করে এই ডুরাণ্ড কাপ খেলা শুধু মিলিটারী গোরাটীমগুলার জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল তারপর সিভিল টীমকেও খেলবার অধিকার দেওয়া হয় ১৯২৬ সাল থেকে। তারপর ১৯৪০ সালে দিল্লীতে নিয়ে আসা হয় উক্ত প্রতিযোগিতা। তার-পূর্ব্বে উহা সিমলাতেই খেলা হতো। যাহা হউক ১৯৪০ সালের পর ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। ১৯৫০ সাল থেকে পুনরায় দিল্লী সহরেই ডুরাণ্ড কাপ খেলা চলছে।

১৯৪৯ সালে ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব ভারতের সেরা ট্রফি আই. এফ. এ. লীগ ও শীল্ড, রোভার্স কাপ একসঙ্গে পাওয়ায় ক্রীড়ামোদীমহল 'ত্রিমুকুট' বিজয়ী বলে আখ্যা দেন। সে বৎসর অন্য কোন বড় ট্রফি আর ছিল না। অনেকের ধারণা মোহামেডান স্পোর্টিং টীম ১৯৪০ সালে 'ত্রিমুকুট' বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু তা' নয়। যেহেতু সে বৎসর মোহামেডান বোম্বাই রোভার্স কাপ ও দিল্লী ডুরাণ্ড কাপ পেয়েছিল কিন্তু আই. এফ. এ. শীল্ড পায়নি। সে বৎসর আই, এফ, এ, শীল্ড পেয়েছিল এরিয়ান টীম। আই, এফ. এ. শীল্ড হচ্ছে ত্রিমুটের শ্রেষ্ঠ ট্রফি। আই. এফ. এ. শীল্ড জয় না করলে ত্রিমুকুট বিজয়ী বলা চলে না। ১৯৪০ সালে মোহামেডান শীল্ডের ২য় রাউণ্ডে রেঞ্জার্সের কাছে ২—০ গোলে পরাজিত হয় আই. এফ. এ. লীগ অবশ্য তারাই পেয়েছিল। মোহামেডান ভারতের বড় ট্রফি প্রায় সব কটাই জিতেছে কিন্তু একই বৎসর সব পায়নি।

১৯২৭ সালে সন্তোষ ট্রফির খেলা কলকাতায় হয়েছিল এবং ভারতের সব প্রদেশের টীমই কলকাতায় খেলতে এসেছিল। মহীশূর টীমের সঙ্গে ম্যানেজার হয়ে এসেছিলেন বিখ্যাত খেলোয়াড় লক্ষ্মীনারায়ণ। তিনি উক্ত মহীশূর টীমের কয়েকজন খেলোয়াড়কে ইষ্ট বেঙ্গল টিমে খেলবার জন্য মনোনীত করেছিলেন, তন্মধ্যে রাইট আউট—ব্রজভেলু, রাইট ইন—ভেঙ্কটেশ, সেণ্টার ফরোয়ার্ড—সাম্পাঙ্গী, লেফট আউট—রমন ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ; কিন্তু ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব ভেঙ্কটেশ ও সাম্পাঙ্গী এই দুইজনকে পরবর্তী ১৯৪৮ সালে গ্রহণ করেছিল। সাম্পাঙ্গী ১৯৪৮ সালে ইষ্ট বেঙ্গল টিমে খেলে তারপর রাজস্থান ক্লাবে চলে যায়। তারপরে মোহনবাগান টিমেও খেলেছে। ব্রজভেলু, রমণ এরাও রাজস্থান ও মোহনবাগান টিমে খেলেছে। ভেঙ্কটেশ ইষ্টবেঙ্গল টিমেই থেকে যায়। ভেঙ্কটেশকে প্রথমে ইনসাইড খেলালে দেখা গেল যে সে মোটেই সুবিধা করতে পারেনা। তারপর থেকে রাইট আউট পজিসনে খেলতে দেওয়া হয়। অবশ্য এর পূর্বে সে কোনদিন রাইট আউটে খেলেনি কিন্তু এমনি তার ভাগ্যগুণ যে রাইট আউটে পরিবর্ত্তিত হয়ে ক্রমে ক্রমে ভারত জোড়া নাম করল। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে রাইট আউটে সব চেয়ে বেশী নাম করেছিল ছোট নূর মহম্মদ। তার খেলায় যেমন সৌন্দর্য ছিল তেমন কার্য্যকরী শক্তিও ছিল অসাধারণ। গোলও করেছেন যথেষ্ঠ কিন্তু ভেঙ্কটেশ উক্ত পজিসনে সকলকে ছাপিয়ে উঠেছিল। তার খেলার দাপট গোল করার অপূর্ব্ব দক্ষতা ক্রীড়ামোদী দর্শক সাধারণকে মুগ্ধ করে দিত। ভেঙ্কটেশ ভারতে এবং ইউরোপে সর্বত্র প্রশংসা পেয়েছে। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আউট সাইড খেলোয়াড় সামাদের সঙ্গেই তার একমাত্র তুলনা চলে।

১৯৪৮ সালের ভারতীয় অলিম্পিক টিমের লেফট ইনসাইড আমেদ খাঁ এ বৎসর ইষ্টবেঙ্গল টিমে যোগদান করে। আমেদ খাঁ লেফট ইন সাইডে তখন সবচেয়ে বেশী খ্যাতিমান ছিল। তিনি

বাঙ্গালোর মুসলিন টীমের খেলোয়াড় ছিলেন। বিখ্যাত খেলোয়াড় সাবু, মাসুম এর নিকট আত্মীয়। আমেদ খাঁ পরবর্ত্তী ৮।৯ বৎসর খেলে অতি বিখ্যাত হয়েছিলেন। তার সমকক্ষ খেলোয়াড় তখন আর কেউ ছিলনা। লক্ষ্ণৌ নিবাসী আবিদ রাইট ইন সাইডে মোহামেডানে খেলেছিলেন। সে বৎসর তিনি ইষ্টবেঙ্গলে এসে যোগ দেন। আবিদ একজন উচ্চ শিক্ষিত এম এ পাশ খেলোয়াড়। খেলায়ও তখন তাঁর যথেষ্ট নাম ছিল। দেখতেও তিনি খুব সুদর্শন ছিলেন। হায়দ্রাবাদের ফরোয়াড ধনরাজ ও ইষ্টবেঙ্গলে এসে যোগ দেন। তিনি হায়দ্রাবাদ পুলিশ টিমের হয়ে ১৯৪৫ সালে আই. এফ. এ. শীল্ডে খেলে গিয়েছিলেন তারপর মহীশূর টিমের হয়ে ১৯৪৭ সালে সন্তোষ ট্রফিতে খেলে গিয়েছেন। ১৯৪৮ সালে ভারতীয় অলিম্পিক টিমেও স্থান পেয়েছিলেন। এ বৎসর তিনি ইষ্টবেঙ্গল সেণ্টার ফরোয়ার্ডরূপে খেলতে এলেন।

খ্যাতনামা ব্যাক খেলোয়াড় তাজ মোহাম্মদ মোহামেডান টীম পরিত্যাগ করে ভবানীপুর টীমে খেলছিলেন, এ বৎসর ইষ্টবেঙ্গল টীমে এসে যোগদান করেন। জলপাইগুড়ীর গোলরক্ষক মনিলাল ঘটকও এ বৎসর ইষ্ট বেঙ্গলে এসে যোগ দেন। সুনীল ঘোষ খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন, যেহেতু আমেদ খাঁ তার স্থানে খেলতে আসেন। লেফট আউট সালে এতদিনে বেশ পাকাপোক্ত খেলোয়াড়ে পরিণত হয়েছিল। সেণ্টার হাফ কাইসার ছিলেন সে বৎসর টীমের অধিনায়ক। তিনি খেলেছেনও ভাল এবং ভাগ্যবানও বটেন, যেহেতু তাঁরই অধিনায়কতায় সে বৎসর ইষ্ট বেঙ্গল টিম 'ত্রিমুকুট'-জয় করেছিল। কাইসার ১৯৩৬ সালে এই ক্লাবেই এসে প্রথম যোগ দেন, তারপর বৎসর তিনি কালীঘাট টীমে চলে যান, তারপর কয়েক বৎসর তিনি ভবানীপুর টীমে খেলেন। ১৯৪৪ সাল থেকে তিনি পুনরায় ইষ্ট বেঙ্গল টীমেই খেলতে থাকেন। তিনি প্রথম খেলা আরম্ভ করেন রাইট হাফ পজিসনে।. পরবর্ত্তী সময়ে তিনি সেণ্টার হাফ পজিসনে খেলেই নাম

করেন। কাইসার খুবই অমায়িক, সচ্চরিত্র ও বিনয়ী ছিলেন। খেলতেন খুব মনোযোগ দিয়ে, তাঁর খেলার মধ্যে বড় নূর মহম্মদের খেলার ছাপ ছিল। কাইসার দিল্লীনিবাসী ছিলেন। তাঁর পুরা নাম সৈয়দ মহম্মদ কাইসার।

১৯৪৯ সালে টীম হলো এইরূপঃ—

গোলে—মনিলাল ঘটক. সত্যেন মুখার্জি (ফ্যান্সী)

ব্যাকে—ব্যোমকেশ বসু, তাজ মোহাম্মদ, পি. চক্রবর্ত্তী (এই বৎসর ইনি প্রায় রিটায়ার্ড)

হাফে—ডি. চন্দ, কাইসার (অধিনায়ক), কাশী মিত্র, খগেন সেন

ফরোয়ার্ডে—ভেঙ্কটেশ, আবিদ, ধনরাজ, আমেদ, সালে ও আপ্পারাও

লীগের খেলা আরম্ভ হলো, তাতে দেখা গেল যে কোন টীমই এদের কাছে দাঁড়াতে পারে না। প্রত্যেক খেলাতেই এঁরা অধিক-সংখ্যক গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করছে। লীগে সর্ব্বসাকুল্যে ২৬টি খেলায় ৭৭টি গোল দিয়ে খেলার পরিসমাপ্তি করেন। মাত্র তিনটি খেলায় তাদের পরাজয় ঘটেছিল। বিপক্ষে ১০টি গোল হয়েছিল। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে এত ভাল টীম এবং খেলেছেও অতি চমৎকার, কিন্তু মোহনবাগান টীমের কাছে লীগের দুইটি খেলাতেই হার স্বীকার করতে হয়েছিল। প্রথম খেলায় বৃষ্টিকাদার মাঠে একটি সন্দেহজনক পেনাল্টী গোলে মোহনবাগান জয়ী হয়। রেফারী নৃপেন সেন উক্ত সন্দেহজনক পেনাল্টীর নির্দ্দেশ দেন। দর্শকগণ তাতে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। পরে উক্ত রেফারী নৃপেন সেনকে আর কোন খেলায় যোগদান করতে দেখা যায়নি। তিনি রেফারীগিরি পরিত্যাগ করেছিলেন। সেদিন দর্শকদের কটূ মন্তব্য ও গালিগালাজ তাকে রেফারীগিরি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। দ্বিতীয় খেলায় ইষ্ট বেঙ্গল টীম খুব জোর দিয়ে খেলেনি, সেইজন্য ১—২ গোলে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল।

বিশেষ কারণ উক্ত খেলার পূর্বেই তারা চাম্পিয়ানশিপ পেয়ে গিয়েছিল। সেইজন্যে উক্ত খেলায় ইষ্ট বেঙ্গল টীম তেমন মনোযোগ দিয়ে খেলেনি এবং মোহনবাগান টীম সেই অমনোযোগের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে খেলায় জয়ী হয়। ইষ্টবেঙ্গল লীগের তিনটি গেম বাকী থাকতেই চ্যাম্পিয়ান হয়ে যায়। যেদিন চ্যাম্পিয়ান হয় সেদিন খেলা ছিল মোহামেডানের সঙ্গে। মোহামেডান স্পোর্টিং সেদিন ইষ্ট বেঙ্গলের কাছে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। ৬—১ গোলে খেলার পরিসমাপ্তি হয়। এতবেশী গোলে তারা কোনো দিন কারো কাছে হার স্বীকার করেনি, অথচ সেদিন তাদের টীম এমন কিছু খারাপ ছিল না। তা'ছাড়া এই মোহামেডানই লীগে রানার্স আপও হয়েছিল। মোহনবাগান হয়েছিল তৃতীয় স্থানাধিকারী। যাই হউক লীগ খেলা শেষ হলো। আপ্পারাও লীগ খেলায় খুব কম খেলেছে—বেশীর ভাগ খেলাতেই রাইট ইনে আবিদ খেলেছে এবং সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান আবিদই সংগ্রহ করে। তারপর শীল্ডের খেলা সুরু হলো। শীল্ডে ই. আই. রেল দলকে ২—০ গোলে, দিল্লীর রাইসিনা দলকে ৪—০ গোলে, শিলচর টাউন ক্লাবকে ৬—০ গোলে, সেমি ফাইনালে গৌহাটীর মহারাণা ক্লাবকে ৮—০ গোলে (ইহাই অদ্যাবধি সেমি-ফাইনালে বড় রেকর্ড), ফাইনালে মোহনবাগানকে ২—০ গোলে পরাজিত করে শীল্ড লাভ করে। ফাইনালের পূর্বে ক্লাবের সমর্থকবৃন্দ খুবই ভাবনায় পড়েছিল, যেহেতু লীগের দুইটি খেলাতেই যখন মোহনবাগানের নিকট পরাজয় বরণ করতে হয়েছে তখন শীল্ডে না জানি কি হবে? কিন্তু শীল্ড খেলায় অতি সহজেই মোহনবাগানকে ২টি গোল দিয়ে পরাস্ত করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। গোলদাতা ছিলেন ভেঙ্কটেশ ও আমেদ।

টিম ছিল এইরূপ :—

ইষ্ট বেঙ্গল—গোলে—মনিলাল ঘটক।

ব্যাকে—ব্যোমকেশ বসু ও তাজ মোহাম্মদ।

হাফে—ডি. চন্দ, কাইসার, খগেন সেন।

ফরোয়ার্ডে—ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ, সালে।

মোহনবাগান—গোলে—ডি.সেন, ব্যাকে—ডাঃ পি. কুমার, দেবু পাল।

হাফে—অনিল দে, টি. আও (অধিনায়ক), অভয় ঘোষ।

ফরোয়ার্ডে—রশিদ, আর. গুহ ঠাকুরতা, সেলিম, অমল মজুমদার, নায়ার। রেফারী ছিলেন মেজর আপফোল্ড। রেফারীং খুবই ভাল হয়েছিল।

তারপর এলো রোভার্স কাপের খেলা। রোভার্স কাপে খেলতে যাবার সময় একজন ভাল সাইড হাফ-ব্যাকের প্রয়োজন পড়ে। সেইজন্য মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের হাফ-ব্যাক লতিফকে দলভুক্ত করে পাঠানো হয়। রোভার্সের খেলায় মহারাষ্ট্র একাদশকে ৩—০ গোলে, টাটা স্পোর্টস দলকে ২—০ গোলে, সেমি-ফাইনালে জি. আই. পি. রেল দলকে ৪—১ গোলে ও ফাইনালে কলকাতার ই. আই. রেল দলকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে রোভার্স কাপ জয় করে ফাইনালে ধনরাজ ২ গোল ও ভেঙ্কটেশ ১ গোল করে। টিম ছিল এইরূপ :—

ইষ্টবেঙ্গল—এস. মুখার্জি (ফ্যান্সী), ব্যোমকেশ বসু ও তাজ মোহাম্মদ; ডি. চন্দ, কাইসার (অধিনায়ক), ও লতিফ, ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ ও সালে।

ই. আই. আর.—ইলিয়াস; অনিল গড়গড়ি ও অনিল নাগ; বিহারীলাল, মোহিনী ব্যানার্জি; অনিল নন্দী; এস. ঘোষ, কে. ব্যানার্জী, মেওয়ালাল, এ. চক্রবর্ত্তী ও এস. নন্দী। রেফারী ছিলেন এল. এল. পেণ্টন।

৯ই অক্টোবর কুপারেজ মাঠে (বোম্বাই) উক্ত ফাইনাল খেলা হয়। ২২টি টিম উক্ত রোভার্স প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। ইষ্ট বেঙ্গলের রাইট ইন সাইডে প্রথম তিনটি গেম আবিদ খেলেছিল, কিন্তু ফাইনাল খেলায় আপ্পারাওকে খেলানো হয়েছিল। আপ্পারাও

টীমের সঙ্গে বোম্বাই যায়নি। ঠিক ফাইনাল খেলার দিন প্লেনে করে কলকাতায় আসে আবার প্লেনে করেই বোম্বাই চলে যায় এবং সেইদিনই খেলায় যোগদান করে। এক হিসাবে এটা ভালই হয়েছিল বটে যেহেতু আপ্পাবাও সেই কারণে রোভার্স কাপ হোল্ডার খেলোয়াড় রূপে পরিগণিত হলো, কিন্তু ন্যায়বিচারে এটা ঠিক কাজ হয়নি। যেহেতু আবিদ আই. এফ. এ. শীল্ডে ও ফাইনাল গেম ছাড়া বাকী সব কটা গেমেই যোগদান করেছিল—শুধু ফাইনাল খেলার দিনই তাকে বাদ দিয়ে আপ্পাবাওকে খেলানো হয়। রোভার্সেও ঠিক তাই করা হয়। সেইজন্য আবিদ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয় ও পরের বৎসর ক্লাব পরিত্যাগ করে চলে যায়। সে বৎসর টীমের খেলোয়াড়দের মধ্যে সব চেয়ে বেশী কার্য্যকরী শক্তি দেখিয়েছিল ব্যাক তাজ মোহাম্মদ। এই তাজ মোহাম্মদ কলকাতার মাঠে অন্যূন দশ বৎসর খেলে গেছে কিন্তু এই ১৯৪৯ সালে ইষ্ট বঙ্গলে যোগদান করে যে রকম খেলা সে দেখিয়ে গেছে এত ভাল খেলা এর পূর্বে আর কোনোদিন সে খেলেনি একথা ঠিক। এই বৎসরটি তার খেলার জীবনের শ্রেষ্ঠ বৎসর। এই বৎসরেই সে সব চেয়ে বেশী যশ লাভ করেছে। বাস্তবিক সে বৎসর যখন তাজ মোহাম্মদ ইষ্ট বেঙ্গলে যোগদান করে তখন অনেকেই বলেছে যে এত একরকম রিটায়ার্ড খেলোয়াড়। মোহামেডান, ভবানীপুর এই দুই ক্লাব চষে এসেছে সুতরাং এখানে এসেও আর কি করবে? কিন্তু খেলায় দেখা গেল একেবারে উল্টোফল তাজ মোহাম্মদ সমগ্র টিমের অর্দ্ধেক মওড়া একা সামলেছে—বাকী ছ'আনা আমেদ খাঁ আর বাকী ছ'আনা সকলে মিলে। কথাটা একটু কড়া হয়ে গেল, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা এইরূপই হয়েছিল। বড় দুঃখের বিষয় এরপর ১৯৫০ সাল থেকে আর আমরা তাঁর দেখা পেলাম না। যাই হউক ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব থেকেই তার খেলার পরিসমাপ্তি বলা চলে; কিন্তু এই পরিসমাপ্তির মুখে যা নমুনা সে রেখে গেল তা' কলকাতার

ক্রীড়ামোদীরা কোনোদিন ভুলবে না। সে বৎসর ব্যোমকেশ বসু তার সঙ্গে শুধু ঠেকা দিয়ে গিয়েছে মাত্র বেশী কিছু করতে হয়নি তাকে। অবশ্য ব্যোমকেশ বসু পরবর্ত্তীকালে বিশেষ নাম করেছে। তাজ মোহাম্মদ এরপর পাকিস্তানের একটি টিমের হয়ে রোভার্স কাপ খেলতে এসেছিল এটুকু আমরা শুনেছি মাত্র। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট তাকে আর ভারতে খেলবার অনুমতি দেয়নি। মণিলাল ঘটক গোল-রক্ষক হিসাবে খুব যে একজন উচ্চাঙ্গের খেলোয়াড় ছিলেন তা' বলা যায় না কিন্তু তিনি খুব ভাগ্যবান খেলোয়াড় এটা ঠিক। বাঙ্গালী গোলরক্ষকদের মধ্যে পূর্ণ দাশ, মণি তালুকদার, পি. ব্যানার্জ্জি ও কে. দত্ত এদের নাম সকলের উপরে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁরা খুব উচ্চাঙ্গের খেলোয়াড় হলেও কোন বড় ট্রফি এঁদের ভাগ্যে জোটেনি। আর মণিলাল ঘটক ৫ বার আই. এফ. এ. শীল্ড, ৩ বার লীগ ও ডুরাণ্ড কাপ ইত্যাদি জয় করেছে, সুতরাং বিজয়ী গোলরক্ষক হিসাবে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

১৯৪৯ সালের শেষ দিকে ডিসেম্বর মাসে সুইডেনের হেলসিংবার্গ টিম কলকাতায় খেলতে আসে। ইষ্ট বেঙ্গলের সঙ্গে তাদের খেলা পড়ে ৫ই ডিসেম্বর। তখন ব্যাক তাজমোহাম্মদ দেশে চলে গিয়েছে, ভেঙ্কটেশ ও তাই। ভেঙ্কটেশের পরিবর্ত্তে আবিদকে রাইট আউটে খেলানো হয়। হায়দ্রাবাদ থেকে ব্যাক আজিজকে আনানো হয়। মোহামেডানের সাইড হাফ লতিফকে (যিনি ইষ্ট বেঙ্গলের হয়ে রোভার্স কাপে খেলে এসেছে) লেফট হাফে খেলতে নেওয়া হলো কিন্তু খুব ভাল খেলেও ২—০ গোলে পরাজিত হতে হয়। হেলসিংবার্গ টীম খুব যে ভাল খেলা দেখিয়েছিল তা'নয়, কিন্তু তারা দুটি গোল করে জয়লাভ করে। আর ইষ্টবেঙ্গল টীম আপ্রাণ চেষ্টা করেও গোল করতে পারেনি। খেলায় কার্য্যকরী শক্তি দেখিয়েছিল ইষ্ট বেঙ্গলই বেশী। গোলেও সট নিয়েছে বহুবার কিন্তু হেলসিংবার্গ গোলরক্ষক অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তা প্রতিরোধ করেছে। উক্ত খেলায় সবচেয়ে

দর্শনীয় খেলা দেখিয়েছিল আমেদ খাঁ ও হেলসিংবার্গের গোলরক্ষক কার্লস্বেন সন।

টীম ছিল এইরূপ :—

হেলসিংবার্গ—এফ. সি—কার্লস্বেন সন, পি. এস, প্লিং, হ্যারী জিগলার, এস. ও. স্বেন সন, এস. এপলটপ্ট, ও. পারসন, মল্টি-মারটেনসন, এস. পারসন, কে. জে. ফ্রাঙ্ক, বি. কার্লস্বন, এ জাল্টিন।

ইষ্ট বেঙ্গল—মণিলাল ঘটক, আজিজ, বি. বসু, ডি. চন্দ, কাইসার লতিফ, আবিদ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ, সালে।

রেফারী—ডাঃ সন্মথ দত্ত।

হেলসিংবার্গের সেণ্টার ফরোয়ার্ড ও লেফট আউট গোল দিয়েছিল।

১৯৫০ সাল। ইষ্টবেঙ্গল টীমের পক্ষে সেবৎসর খুবই সুযোগ এসেছিল অনেক কিছু করবার, কিন্তু দু একটি খেলোয়াড়ের অভাবে সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়নি। যথা—সে বছর ব্যাক খেলোয়াড়ের অভাব হয়েছিল। গত বছর পরিতোষ চক্রবর্ত্তী কাষ্টম বিভাগে চাকুরী পেয়ে ক্লাব পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়। তা' ছাড়া প্রমোদ দাশগুপ্তও খেলা ছেড়ে দিয়েছিল। কেবল রাখাল মজুমদার তখনও টিকে ছিল আর ছিল ব্যোমকেশ বসু। গত বৎসরের সেরা খেলোয়াড় তাজ মোহম্মদ পাকিস্তান চলে যায়। ভারতে ফিরে আসার অনুমতি না পাওয়ায় তার আশা পরিত্যাগ করতে হয়। তার উপর বোমকেশ বসুও খেলার মাঝামঝি আহত হওয়ায় শেষ দিকে আর মোটেই যোগদান করতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ সেণ্টার হাফেরও অভাব হয়। কাইসার লীগের প্রথমার্দ্ধে খেলেছিল বটে, কিন্তু শেষার্দ্ধে খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করে। সেই জায়গায় বি. রায় নামক একজন অখ্যাত খেলোয়াড় দিয়ে কাজ চালানো গোছের খেলা চলে কোন ক্রমে কিন্তু সুবিধা হয় না। শুধু ফরোয়ার্ডের উপর নির্ভর করেই

খেলা চলছিল। এ বৎসর আবিদ পুনরায় মোহামেডান টীমে চলে যায়। ভেঙ্কটেশ, আপ্পাবাও, ধনরাজ, আমেদ ও সালে এই পাঁচ জন খেলোয়াড় অনায়াস ভঙ্গিতে খেলেই অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ দখল করে। ২৬টি খেলায় ১৯টি জয় ও ৭টি ড্র গেম হয়েছিল। স্বপক্ষে ৫৩ গোল, বিপক্ষে ৯ গোল; সর্ব্বশুদ্ধ ৪৫ পয়েণ্ট; মোহনবাগান ৪০ পেয়ে বানার্স হয়। সেণ্টাব ফবোয়ার্ড ধনরাজ সর্ব্বসাকুল্যে ১৮টি গোল কবে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গোলদাতাব সম্মান অর্জ্জন করেন। নূতন খেলোয়াড কয়েকজন টীমে যোগদান কবেছিল বটে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন লেঃ গোকুল তিনি সাইড হাফে খেলতেন। মোহনবাগান টীমেব সঙ্গে প্রথম খেলায় জয়ী হয় দ্বিতীয় খেলায ড্র গেম থাকে।

তারপব আসে আই. এফ. এ. শীল্ডেব খেলা। শাল্ডে ১ম বাউণ্ডে হাওড়া ইউনিয়ন, ২য় বাউণ্ডে মুঙ্গেবের তরুণ ক্লাব, ৩য় বাউণ্ডে ক্যালকাটা ক্লাব, ৪র্থ বাউণ্ডে ভবানীপুরকে হারিয়ে এবং সেমি-ফাইনালে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ২— গোলে পরাজিত করে ইষ্ট বেঙ্গল ফাইনালে উঠে। ও-দিকে ই. আই. রেল দল, নিউ দিল্লী হিরোজ, মহারাষ্ট্র একাদশ ও কালীঘাট টীমকে হারিয়ে এবং সেমি-ফাইনালে মোহনবাগানকে ২—০ গোলে পরাজিত কবে ভারতীয় সৈনিক দল (সার্ভিসেস একাদশ) ফাইনালে উঠে। ফাইনালে উক্ত সার্ভিস টীমকে হারাতে ইষ্ট বেঙ্গলেব বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। পাঁচজন ফরোয়ার্ডের দাপট ও সাবলীল ভঙ্গীতে বল আদান-প্রদান কবে নিয়ে যাওয়া ও গোল করা, দর্শকদেব চক্ষুকে বড়ই আনন্দদায়ক তৃপ্তি দিয়েছিল। সার্ভিস দল এদের গতিবেগকে সামাল দিতে প্রাণান্তকব পবিশ্রম করেছে মাত্র, মুখ্যতঃ কিছুই কবে উঠতে পারেনি। ৩—০ গোলে সার্ভিস টীম পরাজিত হয়। গোলদাতা ছিলেন ধনরাজ ২, অধিনায়ক সালে ১ গোল। উক্ত খেলায় আমাদের ভারতীয় সৈন্য বিভাগের তদানীন্তন প্রধান সেনাপতি জেনারেল কারিয়াপ্পা উপস্থিত

ছিলেন। রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাস নাথ কাটজু, মেজর জেনারেল সত্যব্রত সিংহ রায় ও অন্যান্য অনেক বড় বড় অফিসারও উক্ত খেলায় দর্শক ছিলেন। খেলায় বিজয়ী ইষ্ট বেঙ্গল টিমের অধিনায়ক সালের হস্তে আই. এফ. এ. শীল্ড তুলে দেন ডাঃ কে. এন কাটজু। তিনি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা অপরাজিত লীগ ও শীল্ড বিজয়ী ইষ্ট বেঙ্গল টীমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। উক্ত খেলায় ইষ্ট বেঙ্গল টিমের প্রবীণ খেলোয়াড় বেবা গুহ পুনরায় ব্যাক পজিসনে খেলতে নামেন এবং যথাযথভাবে তাঁর সম্মান রক্ষা করেন। ফাইনালে টীম ছিল এইরূপ :—

ইষ্ট বেঙ্গল—এম. ঘটক ; এন. গুহ, রাখাল মজুমদার ; ডি. চন্দ, বীরেন রায়, গোকুল, ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ, সালে ( অধিনায়ক )।

সার্ভিস একাদশ—ক্ষেম বাহাদুর, জং রণবীর সিং ; জোনস, চন্দন সিং, লাল বাহাদুর ( ছোট ) ; দিল বাহাদুর, লাল বাহাদুর ( বড় ) টিক্কা রাম, সাইমন, পুরাণ বাহাদুর। রেফারী অলক রায়।

১৯৫০ সালে ডুরাণ্ড কাপের খেলা পুনরনুষ্ঠিত হয় দিল্লীতে তাতে যোগদান করার জন্য ভারতের বিশিষ্ট টীমগুলির নিকট আমন্ত্রণ আসে। ইষ্ট বেঙ্গল টীমের নিকটও যথারীতি নিমন্ত্রণ আসে। কলকাতা থেকে মোহনবাগান, টীমও আমন্ত্রণ পেয়ে ডুরাণ্ড খেলতে যায়। সর্ব্বশুদ্ধ ১৬টি টিম নিয়ে ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতার খেলা হয়। সেমি-ফাইনালে হায়দ্রাবাদ পুলিশের নিকট ১—০ গোলে পরাজিত হয় ইষ্ট বেঙ্গল টিম। মোহনবাগান টীমও ফাইনালে হায়দরাবাদ পুলিশের সঙ্গে পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। হায়দ্রাবাদ পুলিশ ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে সে বৎসর রোভার্স কাপ ও হাদদ্রাবাদ পুলিশ টীমই জয় করেছিল। ইষ্ট বেঙ্গল টিম রোভার্স কাপে সে বৎসর যোগদান করেনি।

ইষ্ট বেঙ্গল টিম ডুরাণ্ড কাপ খেলার উদ্দেশ্য নিয়ে দিল্লীতে যায়, কিন্তু তার পূর্ব্বে দিল্লী ক্লথমিল ফুটবল প্রতিযোগিতায়ও যোগদান করে এবং কৃতিত্বের সঙ্গেই উক্ত ট্রফি জয় করে ফাইনালে অষ্টম গুর্খা রাইফেল টিমকে পরাজিত করে ২—০। গোলে উক্ত গুর্খা রাইফেল টিমে সার্ভিস টিমের কয়েক জন খেলোয়াড় যোগদান করেছিল। দিল্লী ক্লথ মিল ফাইনালে টিম ছিল এইরূপ ঃ—

ইষ্ট বেঙ্গল—এস. মুখার্জ্জী, আব মজুমদার ও এস. ঘোষ ডি. চন্দ, বি. রায়, গোকুল, ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ, সালে।

অষ্টম গুর্খা বাইফেল—ক্ষেম বাহাদুর; হবকা বাহাদুব, ও তেগ বাহাদুব; বীর বাহাদুব, লাল বাহাদুব. ও হীবাসিং, টিক্কাবাম, জং বাহাদুর, রবিলাল; পুবণ বাহাদুর ও কালা সিং। বেফারী—হরনাম সিং

একটি কথা এখানে উল্লেখ না করে পাবলাম না—যেহেতু পাঠকবর্গের কথাটি জানা প্রয়োজন। ১৯৫০ সালে ডুবাণ্ড কাপ খেলা দিল্লীতে নূতন পর্য্যায়.আরম্ভ হয়, তাব পূর্ব্বে এই খেলা সিমলায অনুষ্ঠিত হতো। তখন ডুরাণ্ড কাপ কমিটি বিশেষ বিবেচনা করে টিম গ্রহণ করতেন। ডুরাণ্ড খেলার পূর্ব্বেই রোভার্স কাপ ও আই. এফ. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে যেতো এবং এই দুই প্রতিযোগীতার বিজয়ীদের দুই পাশে রেখে খেলার তালিকা প্রস্তুত করতেন। এটা আমরা বরাবারই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ১৯৫০ সালে উক্ত নিয়মে খেলার তালিকা প্রস্তুত হয় নাই। রোভার্স কাপবিজয়ী হায়দ্রাবাদ পুলিশ টিম ও অপরাজিত আই. এফ. এ. লীগ ও শীল্ড বিজয়ী ইষ্ট বেঙ্গল টিমকে এক পাশে রেখে অন্য পাশে মোহনবাগান টীমকে রাখা হয়, অথচ সে বৎসর মোহনবাগান টীমের কোন রকম কৃতিত্বের ছাপ ছিলনা। এর জন্য আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না, শুধু পাঠকবর্গের অবগতির জন্য লিখলাম।

১৯৫০ সালে ইষ্ট বেঙ্গল টীমের খেলোয়াড়গণ—

গোলে -মণিলাল ঘটক, এস. মুখার্জী, ( ফ্যান্সী )

ব্যাকে—রাখাল মজুমদার, ব্যোমকেশ বসু, এস. ঘোষ, এন. ব্যানার্জী

হাফে ডি. চন্দ, কাইসার, বীরেন রায়, গোকুল, এস. রায়, এন. বড়ুয়া, খগেন সেন, শচীন মুখার্জী।

ফরোয়ার্ডে—ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ, সালে, শৈলেন রায়

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে খেলোয়াড়দের সম্বর্দ্ধনার জন্য ক্লাবকর্ত্তৃপক্ষ নিজ মাঠে একটি প্রমোদ অনুষ্ঠান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলার রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাশ নাথ কাটজু ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। তা' ছাড়া আরও বহু গণ্যমান্য লোক নিমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রমোদ অনুষ্ঠানে নানা প্রকার প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল—উল্লেখযোগ্য হিসাবে বলা যায় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ কুমার শচীনদেব বর্ম্মনের সঙ্গীত, বোম্বাই আগত মুকেশের সঙ্গীত, শিখারানী বাগের নৃত্য, ক্ষীরোদ নট্টের ঢোল আরও হাস্যকৌতুক ও নানা প্রকার প্রমোদের ব্যবস্থা বেশ সুষ্ঠু ভাবেই হয়েছিল।

১৯৫১ সাল। এ বৎসর ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে একটি সুবর্ণ সুযোগ এসছিল ত্রিমুকুটবিজয়ী হওয়ার, কিন্তু কিছুটা নিজেদের দোষ-ত্রুটী ও কিছুটা ভাগ্যদেবীর অকৃপায় সে সুযোগের সদ্ব্যবহার হয়নি। গত বৎসরের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ ও অনায়াসলব্ধ আই. এফ. এ শীল্ড পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। ডুরাণ্ডের সেমিফাইনালিষ্ট হয়ে ক্লাবের মন সন্তুষ্ট হয়নি—কিন্তু উপায় কি ? রক্ষণভাগ তেমন পুষ্ট ছিল না সেইজন্য বলবারও কিছু ছিল না। এ বৎসর গোড়া থেকেই ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সচেতন ও যত্নবান হলেন। ব্যাকের অভাব পূরণ করবার জন্য হায়দরাবাদ থেকে একটি ব্যাক সংগ্রহ করলেন।

তার নাম আনসারী। মোটামোটি মন্দ খেলোয়াড় নয়। খুব চমৎকারিত্ব না থাকলেও তার খেলায় কার্য্যকরী শক্তি বেশ ভালই ছিল এবং বেশ মানিয়েই সে খেলে গেছে। সবচেয়ে বড় যে অভাব ছিল, সেই অভাব পূরণ হলো সার্ভিসেস টীমের সেণ্টার হাফ খেলোয়াড় চন্দন সিং যোগদান করায়। সেই সময় চন্দন সিং একজন উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের খেলোয়াড় বলে পরিগণিত ছিলেন। আমরা এতাবৎকাল যে কয়জন উৎকৃষ্ট পর্যায়ের সেণ্টার-হাফ খেলোয়াড় দেখেছি, তাদের তুলনায় চন্দন সিং নিকৃষ্ট ত নয়ই বরং সমপর্য্যায়ের, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ভারতীয় সেণ্টারহাফ খেলোয়াড় হিসাবে ননী গোঁসাই, নূর মহম্মদ (বড়), অকিল আমেদ, বীরেন সেনের পরই চন্দন সিংয়ের নাম আসে। উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের সেণ্টার-হাফ খেলোয়াড় এই কয়জনকেই ধরতে হবে। তারপরে মোহিনী বানার্জি, কাইঁসার, নাসিম, মহীউদ্দিন এদের নাম করা যায়। আর যাঁরা সেণ্টার-হাফ বলে পরিচিত বা বাছাই খেলায় নির্ব্বাচিত হয়েছে তাঁদের নাম করতে আমরা নারাজ। কেন, তা' বুঝিয়ে বলছি। প্রথমে বলাই চ্যাটার্জির নামই করা যাক্। ইনি মোহনবাগান টীমে খেলতেন এবং উক্ত সেণ্টার-হাফ পজিসনেই খেলেছেন, ১৯২১ সাল থেকে প্রায় ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্ত। ইনি এথলেট ও মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে যথেষ্ট নাম করেছেন একথা সত্য, কিন্তু ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে সুনাম তাঁর ছিল না এবং উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের সেণ্টার-হাফ খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর নাম কোনমতেই আসে না একথা প্রায় ক্রীড়ামোদীই জানেন। ইনি ফুটবল খেলায় কিছুটা কার্য্যকরী শক্তি দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় দৈহিক শক্তির পরিচয় দিতেন। খেলার সৌন্দর্য্যের দিকে তাঁর নজর ছিলনা। বেশীর ভাগ বিপক্ষদলকে কিভাবে মারধোর করে দাবিয়ে রাখা যায় সেই দিকেই তাঁর নজর থাকতো বেশী। এই সুনাম ও দুর্ণাম তাঁর যথেষ্টই ছিল। তারপর আসে বাঘা সোম। ইনি প্রথমে উয়াড়ী টীমের খেলোয়াড় ছিলেন এবং ফরোয়ার্ড লাইনেই খেলতেন। মোহনবাগানে খেলতে

এসে ইনি সেণ্টার-হাফ পজিসনেই খেলতেন তারপর ই. বি. রেলে চাকুরী নিয়ে উক্ত রেল দলেই খেলেছেন এবং সেণ্টার-হাফ পজিসনেই খেলতে দেখেছি। তবে বাঘা সোমের মধ্যে উৎকৃষ্ট খেলার ছাপ ছিল বটে কিন্তু ইনিও মারধোর করে খেলার হাত থেকে রেহাই পান না সুতরাং উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের খেলোয়াড় বলে এঁকেও গণ্য করা যায় না। তারপর আসে আব্দুল হামিদ্। ইনি একজন শিক্ষিত ও গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস হোল্ডার ছিলেন। কোয়েটার সেণ্ডিমোনিয়াম ফুটবল টীমে লেফট হাফ-ব্যাক রূপে খেলতেন। কলকাতায় এসে ইনি মোহন-বাগান টীমে যোগদান করেন এবং সেণ্টার-হাফ পজিসনে খেলেন। তিনি রক্ষণকার্য্যে খুবই পটু ছিলেন কিন্তু সেণ্টার-হাফের বড় কর্ত্তব্য বল যোগানো, সেটা তিনি পারতেন না। ফরোয়ার্ডের পায়ে বল যোগানো তাঁর দ্বারা মোটেই হতো না, এটা আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। ১৯৩৪ সালে ইনি মোহনবাগানে এসে যোগদান করেন। দু'বছরের বেশী ইনি খেলেননি সেই দু'বছর বাছাই করা খেলায় লেফট হাফ-ব্যাকরূপেই নির্ব্বাচিত হয়েছেন। তারপর দেখা যায় মোহনবাগানেয় সেণ্টার-হাফ টি. আও। ইনি তার সমকালের প্রায় প্রত্যেক বাছাই-করা খেলাতেই সেণ্টার-হাফ রূপে নির্ব্বাচিত হয়েছেন, অথচ আমরা দেখেছি সেণ্টার-হাফের প্রকৃত কর্ত্তব্য উনি মোটেই পালন করতে পারতেন না। রক্ষণকার্য্যে ইনিও বেশ পটু ছিলেন, কিন্তু বল যোগানোর বেলায় মাথা গুলিয়ে ফেলতেন। খেলাধুলার কর্ত্তৃপক্ষের নির্ব্বাচনে কিন্তু এঁরাই বেশীর ভাগ স্থান পেয়েছে। এই রকম পক্ষপাতিত্বের উৎস যে কোথায় তা' অবশ্য দর্শক সাধারণের বুঝতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু এসকলের প্রতিকারও কোন কালে হবে না। এইরূপ পক্ষপাতিত্ব বহুদিন চলবে এইরূপেই মনে হয়। সুতরাং অবান্তর কথা বাড়িয়ে লাভ নাই।

১৯৫১ সালে টীম হলো এইরূপ—

গোলে—মণিলাল ঘটক

ব্যাকে—ব্যোমকেশ বসু ( অধিনায়ক ) ও আনসারী
হাফে--গোকুল, চন্দন সিং, এস. রায় ( পল্টু )
ফরোয়ার্ডে—ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ, সালে, প্যাট্রিক।

লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ কতকটা অবহেলার জন্য হাতছাড়া হয়ে যায়। লীগ খেলায় কর্ত্তৃপক্ষ ও খেলোয়াড় এই দুই দলেরই ত্রুটীর জন্য লীগ ফস্‌কে যায়। নতুনা টীম হিসাবে এদের প্রচুর শক্তি ছিল এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। মোহনবাগানের সঙ্গে লীগের প্রথম খেলায় মোহনবাগান জয়ী হয়, দ্বিতীয় খেলায় ইষ্ট বেঙ্গল জয় লাভ করে। মোহনবাগান টীম লীগচ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে।

তারপর এলো আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলা। শীল্ডের খেলায় ইষ্ট বেঙ্গল টীমের কোন ত্রুটী দেখা যায়নি। বেশ সুষ্ঠুভাবে খেলে ফাইনালে হাজির হলো। ২য় রাউণ্ডে কাষ্টমস্‌কে ৩-১ গোলে, ৩য় রাউণ্ডে ২৪ পরগণা টিমকে ৩—১ গোলে, কোয়ার্টার ফাইনালে মহারাষ্ট্র একাদশকে ৩—১ গোলে, সেমি-ফাইনালে রাজস্থানকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে। কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার দিন বিশিষ্ট দর্শক হিসাবে মাঠে উপস্থিত ছিলেন নেপালের মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ। তিনি মাঠে নেমে ইষ্ট বেঙ্গল ও মহারাষ্ট্র দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দ্দন করেন এবং খেলা দেখে ইষ্ট বেঙ্গল টীমের খেলোয়াড়দের ভূয়সী প্রশংসা করেন। যাই হউক অপর দিকে ফাইনালে উঠলো মোহনবাগান টিম। খেলার চারদিন আগে থাকতেই গ্যালারীতে প্রবেশার্থী দর্শকদের লাইন পড়ে গেল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য—দিবারাত্রি হাজিরা দিয়ে লাইন রক্ষা করা যে কি ব্যাপার প্রত্যক্ষদর্শী না হলে বুঝান দায়, যাই হউক যথাসময়ে খেলা আরম্ভ হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উক্ত খেলা ড্র হয়ে যায়। কোন পক্ষই খেলায় গোলের সুযোগ করে উঠতে পারেনি, উভয় দলের রক্ষণভাগ খুব দৃঢ় ভাবে রক্ষণকার্য্যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। আবার ৪ দিন পর খেলার তারিখ পড়ে, তাতেও উক্তরূপে দর্শকদের লাইন পড়ে। ২য়

দিন খেলায় মমীাংসা হয়ে যায় অতি সহজেই। খেলা আরম্ভের ১৭ মিনিটের মধ্যেই পর পর দুটি গোল দিয়ে ইষ্টবেঙ্গল টিম খেলার মীমাংসা করে নেয়। উক্ত দুটি গোলই দিয়েছিলেন লেফট আউট সালে। পরে আরও সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল:বটেকিন্তু আর কোন গোল হয়নি। রাজ্যপাল কাটজু উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন।

খেলায় টীম ছিল এইরূপ—

ইষ্ট বেঙ্গল—মনিলাল ঘটক, ব্যোমকেশ বসু ( অধিনায়ক ) ও আনসারী ; গোকুল, চন্দন সিং ও এস, রায় (পল্টু );
ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ ও সালে।

মোহনবাগান— চঞ্চল ব্যানার্জী ; পূর্ণেন্দু বড়ুয়া ও শৈলেন মান্না (অধিনায়ক); রতন সেন, টি. আও, রবি দে, বাবু, রুনু গুহ ঠাকুরতা, রবি দাশ, সত্তার ও এ. দাশগুপ্ত (ঝণ্টু)।

রেফারী—মেজর আপফোল্ড। ইনি একজন অতি উচ্চদরের রেফারী ছিলেন।

শীল্ডের খেলাব সময় মোহনবাগান টীমে ভিন্ন টীমের দুজন খেলোয়াড়কে খেলতে দেখা গেল—একজন ভবানীপুর টিমের রবি দাস, অন্যজন বি. এন. আর টিমের হাফব্যাক রবি দে। এই দুই রবির আবির্ভাবেও যে টিমের শক্তি খুব বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে তেমন মনে হলো না। একটা কথা এই যে এক টিমের খেলোয়াড় অন্য টিমের হয়ে খেলতে পারে না এটাই আমরা এতাবৎকাল জেনে এসেছি কিন্তু মোহনবাগান টীমের প্রয়োজনে আইন-কানুনও যে রদবদল হয়ে যায় সেটাই আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত কাণ্ড করেও মোহনবাগান টীম ইষ্ট বেঙ্গলকে কাবু করতে পারলো না। ইষ্ট বেঙ্গল টীম পর পর তিন বৎসর শীল্ডবিজয়ী হয়ে রেকর্ড স্থাপন করলো। তিন বার উপযু্পরি শীল্ড পেয়েছে গর্ডন হাইলেণ্ডার, ক্যালকাটা এফ. সি. ও সেরউড ফরেষ্টার্স। এবার ভারতীয় টীম হিসাবে ৩ বার শীল্ড বিজয়ী হলো ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব।

তারপর এলো দিল্লীর ডুরাণ্ড কাপের খেলা। গত বৎসর ইষ্ট বেঙ্গল টীমকে ডুরাণ্ডের সেমি-ফাইনালিষ্ট হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল কিন্তু এবারে আর তা' হলোনা—ডুরাণ্ড কাপ জয় করে নিয়ে আসা হলো। ফাইনালে কলকাতার রাজস্থান টীম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এবং প্রথম দিন ড্র করার পর দ্বিতীয় দিন ২-১ গোলে খেলার মীমাংসা হয়ে যায়। ইষ্ট বেঙ্গল ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়। ২২শে অক্টোবর উক্ত ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলার শেষে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ পুরস্কার বিতরণ করেন। ফাইনালে টীম ছিল এইরূপ :—

ইষ্ট বেঙ্গল—মণিলাল ঘটক ; ব্যোমকেশ বসু (অধিনায়ক) ও আনসারী, গোকুল, চন্দন সিং, এস. রায় (পল্টু) ; ভেঙ্কটেশ, সুশান্ত ঘোষ, ধনরাজ, আমেদ ও সালে।

রাজস্থান—সঞ্জীব ; ম্যানুয়েল ও বত্নম, অরোকীস্বামা, গুরুবক্‌স মহাবীব ; কানাইয়ান, ম্যাসী, মেওয়ালাল, বমন, কুপ্পাস্বামী।

রেফারী—মেজর আপফোল্ড

ফাইনালে ইষ্ট বেঙ্গল পক্ষে গোল করেন আমেদ ও ভেঙ্কটেশ। রাজস্থান পক্ষে রমণ। উক্ত খেলায় আপ্পারাও যোগদান কবতে পারেননি সেই জন্য সুশান্ত ঘোষ (বি. এন. আর) রাইট ইন পর্য্যায়ে খেলেছিল।

তারপর এলো রোভার্স কাপের খেলা। ইষ্ট বেঙ্গল টীম কলকাতার অন্য টীমের কয়েকজন খেলোয়াড়কে নিয়ে বেশ শক্তিশালী টীম তৈরী করে বেশী আশা পোষণ করে খেলতে গেল। যদি রোভার্স কাপ জিততে পারা যায় তা'হলে সত্যিকারের ত্রিমুকুট-বিজয়ী বলে গণ্য হওয়া যায়। কিন্তু অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাসে তা' আর সম্ভব হলো না। কোয়ার্টার ফাইনালে মাদ্রাজের উইমকো টীমের সঙ্গে ১-০ গোলে পরাজিত হয়ে ফিরে আসে।

টীম ছিল এইরূপ :—

ইষ্ট বেঙ্গল—এম. ঘটক, ব্যোমকেশ বসু ও ক্লডিয়াস ; লতিফ, চন্দনসিং ও সৈয়দ ; ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ ও সালে।

উইমকো—মুর্ত্তি ও সুন্দররাজ অন্ধ্রনায়ালু ; গোবিন্দন, আলগিরাস্বামী ওলেমুর; ডোরাইরাজ, বালসুব্রহ্মণ্যম, থঙ্গরাজ, কিট্টু, লোগনাথন।

উক্ত খেলায় উইমকোর সেণ্টার ফরোয়ার্ড থঙ্গরাজ জয়সূচক গোলটি করেন। ইষ্ট বেঙ্গলে বি. এন. আর. টীমের ব্যাক ক্লডিয়াস ও মোহামেডান টীমের লতিফ ও সৈয়দকে হাফব্যাক খেলানো হয়। উক্ত খেলোয়াড়ত্রয়ের এ বৎসরের খেলায় বেশ সুনাম ছিল, সেইজন্য এদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেদিনের খেলায় এদের কার্য্যকরী শক্তি প্রকাশ পায়নি। ক্লডিয়াসের খেলা ভালই হয়েছিল কিন্তু সাইড হাফদ্বয়ের খেলা মোটেই আশানুরূপ হয়নি।

তারপর নবেম্বর মাসে সুইডেন থেকে একটি ফুটবল টীম আসে কলকাতায় খেলবার জন্য। টীমটির নাম গোটেবার্গ ফুটবল ক্লাব। উক্ত গোটেবার্গ টীম যথেষ্ট শক্তিশালী টীম ছিল, কিন্তু ইষ্ট বেঙ্গল টীমের সঙ্গে খেলায় তারা সুবিধা করতে পারেনি। ১—০ গোলে পরাজিত হয়ে ফিরে যায়। ২৫শে নভেম্বর উক্ত খেলাটির অনুষ্ঠান হয় ক্যালকাটা মাঠে। উক্ত খেলায় রেফারী ছিলেন রমেন বাকচী। ইষ্ট বেঙ্গলের পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেন লেফট আউট সালে।

টীম ছিল এইরূপ :—

ইষ্ট বেঙ্গল—এম ঘটক ; বি. বসু ( অধিনায়ক ) ও আনসারী, গোকুল, চন্দন সিং, ও এস. রায় ; ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ ও সালে।

গোটেবার্গ এফ. সি—হেনরী এণ্ডারসন ; গুস্তাফ লারসন ও স্বেন এপলগ্রেন ; হোলগার, হেনসন ও রুণী কোলম্যান ; রুনী ইমানুয়েলসন (অধিনায়ক), কেণ্ট বানটসন,

লেসার্ট এণ্ডারসন, রেল কার্লসস্টন, স্বেন জেবলম, এরিক বার্কোভিস্।

১৯৫২ সাল। এই বৎসর ইষ্ট বেঙ্গল টীমে কয়েকজন নূতন খেলোয়াড় আমদানী হয়। মোহনবাগান থেকে ব্যাক ডাঃ পি. কুমার, পাকিস্তান থেকে আগত লেফট আউট মাসুদ ফক্রী,বাঙ্গালোর থেকে রমণ নামে একটি নবাগত খেলোয়াড়, হাফব্যাক অসীম মুখার্জী, বি. গুহ, ফরোয়ার্ড নিশিথ বিশ্বাস, ব্যাক এস. মল্লিক প্রভৃতি। তন্মধ্যে মাসুদ ফক্রী ছিল সকলের ব্যতিক্রম। এই ধরনের খেলোয়াড় একমাত্র ইউরোপীয়ান সাইড ছাড়া আর অন্যত্র দেখা যায়নি ১৯২১ সালে ওরসেস্টার সায়ার রেজিমেণ্ট টীম আই. এফ. এ. শীল্ড জয় করেছিল। সেই টীমে গামারী (Gummery) নামে একটি লেফট আউট খেলে গিয়েছিল। উক্ত গামারী একজন উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের খেলোয়াড় ছিলেন, যাঁরা তাঁর খেলা দেখেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন। উক্ত গামারীর খেলার সঙ্গে ফকরীর খেলা সমপর্য্যায়ভুক্ত। ফক্রী দেখতে অতি সুদর্শন, অনেকটা ইউরোপীয়ান সাহেবদের মত। তার খেলার ধরনও ছিল অবিকল সাহেবদের মত। তা'ছাড়া তার খেলা ও গোল দেওয়ার কায়দা, বুদ্ধিমত্তা অনন্যসাধারণ। খুব ফাঁকার মধ্য দিয়ে বল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা সে সব সময়েই করতো—কারোর গায়ে না ঠেকে এইরকম ভাবে। এখানে যখন আসে তখন তার বয়স ছিল খুবই কম—বোধ হয় কুড়ি বৎসরের বেশী হবেনা। হাল্কা লম্বা ধরণের চেহারা, মুখ চোখ অতি সুন্দর। যদিও ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবে লেফট আউট সালে তখন দিগগজ খেলোয়াড়রূপে বর্ত্তমান ছিল, তথাপি ফক্রী আসার পর তাকেই বেশীর ভাগ সময় খেলান হয়েছে। এহেন ফক্রীর যোগদানে টীমের শক্তি যে অনেকটা বর্দ্ধিত হলো, তা' বলাই বাহুল্য।

লীগ খেলা আরম্ভ হলো, ইষ্ট বেঙ্গল টীম খুব ভালই খেলতে লাগলো। শেষ পর্য্যন্ত ২৬টি খেলায় ১৭টি জয়, ৬টি ড্র ও ৩টিতে

পরাজয়, স্বপক্ষে ৩০টি গোল, বিপক্ষে ৫টি গোল এই নিয়ে ইষ্ট বেঙ্গল লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করলো। রানার্স হলো ভবানীপুর টীম ৩৬ পয়েণ্ট পেয়ে। মোহনবাগান ২৫ পয়েণ্ট পেয়ে ৮ম স্থান অধিকার করে। এবারও মোহমবাগান লীগের তুটি খেলাতেই ইষ্ট বেঙ্গলের নিকট পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। ২য় খেলায় কমজোরী টীম নিয়েও ইষ্ট বেঙ্গল মোহনবাগানকে হারিয়ে দেয় শুধু ফকরীর একটি দর্শনীয় গোলের জন্য। প্রথম খেলাতে মোহনবাগান ১ গোলে পরাজিত হয়েছিল ধনরাজের চাতুর্য্যপূর্ণ সটে।

তারপর আই অফ. এ. শাল্ড খেলা আরম্ভ হলো। ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের সদস্য ও সমর্থকদের মনে আশা ছিল যে এ বৎসর যদি শীল্ড নাতে পারে তবে নূতন রেকর্ড স্থাপন হবে, যা এতাবৎ হয়নি। তিন বৎসর উপর্যুপরি শীল্ড পেয়েছে গর্ডন, ক্যালকাটা ও সেরউড ফরেষ্টার। ইষ্ট বেঙ্গলও গত তিন বৎসর উপর্যুপরি শীল্ড পেয়েছে। যদি এবৎসর নিতে পারে তবে পূর্ব্বেকার রেকর্ড ভঙ্গ হয়ে নূতন রেকর্ড স্থাপন হবে। টীম যা ছিল তাতে এরূপ আশা করা অবান্তর নয় বরং উপযুক্ত, কিন্তু 'ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র নচ বিদ্যা ন পৌরুষ।'

শীল্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে দেখা হলো মহীশূর একাদশ টীমের সঙ্গে। টীম হিসাবে মহীশূর টীম এমন কিছু অজয় বা তুর্জয় নয় বরং সাধারণ টীমই বলা চলে, কিন্তু খেলার সময় দেখা গেল ইষ্ট বেঙ্গল কয়েকজন খেলোয়াড় টীমে অনুপস্থিত। বিপক্ষে শক্ত টীমই হউক অথবা তুর্ব্বল টীমই হউক, শীল্ডের খেলায় যতদূর সম্ভব ভাল টীম নামানো দরকার, তাতে ফলাফল যাই হউক না কেন, কিন্তু অত্যন্ত তুঃখের বা মনস্তাপের বিষয় যে ইষ্ট বেঙ্গলের টীম দেখে দর্শকগণ বিস্ময়ান্বিত হয়ে পড়লো। রক্ষণভাগের মেরুদণ্ড চন্দন সিং অনুপস্থিত, তারস্থানে তুর্বল খেলোয়াড় লেফট হাফব্যাক অসীম মুখার্জিকে নামানো হয়েছে। তা ছাড়া ব্যাক হিসাবে সে বৎসর এস. মল্লিক ভাল খেলছিল সেদিন তাকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। ফকরীও নেই,

তার পরিবর্তে সালে। অন্য খেলোয়াড়ের কথা বাদই দিলাম চন্দন সিংয়ের অনুপস্থিতি একেবারে অসহনীয়বোধ হলো। অথচ চন্দন সিং সেদিন মেম্বার গ্যালারীতে বসে খেলা দেখেছে। কি কারণে চন্দন সিং খেলতে নামলোনা তা' কেউ জানতে পারলো না। খেলা খুবই খারাপ হতে লাগলো, ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, সালে, বি. বোস এদের প্রত্যেকের খেলাই অত্যন্ত নিম্নস্তরেব হতে থাকলো। তারপর দ্বিতীয়ার্দ্ধের মাঝামাঝি সময়ে মহীশূরের সেণ্টার ফবোয়ার্ড নারী ১টী গোল করে বসল। সে গোল আব শোধ হলো না। দর্শক সাধারণ তাজ্জব বনে গেলো। মহীশূব টীম যে সেদিন খুব একটা ভাল গেম দিয়েছিল তাও নয়, অথচ বিনা আয়াসে তাবা খেলায় জিতে গেল। একমাত্র আমেদ খাঁ যথেষ্ট পরিশ্রম ও চেষ্টা করেছিল বটে কিন্তু তার একাব চেষ্টা ফলবতী হয়নি। সেই মহীশূব টীম পববর্ত্তী খেলায় রাজস্থান টীমেব কাছে ৩-০ গোলে পরাজয় বরণ কবে বিদায় নেয়। রাজস্থান মোহনবাগানেব সঙ্গে ফাইনাল খেলে কিন্তু ২—২ গোলে খেলাটি ড্র হয়ে যায়। সে বৎসব সময়ের অভাবে শীল্ড খেলা পুনরনুষ্ঠিত হয়নি।

তারপর আসে ডুরাণ্ডেব খেলা। ইষ্ট বেঙ্গল অবশ্য বেশ সুনামের সঙ্গে খেলেই ডুরাণ্ড কাপ জয় করে হায়দবাবাদ পুলিশ টীমকে হারিয়ে। সে বৎসর দিল্লীর ডি. সি. এম. ট্রফিও জয় কবে নিয়ে আসে অষ্টম গুর্খা রাইফেল টীমকে হারিয়ে। বোম্বাই রোভার্স কাপ খেলতে ইষ্ট বেঙ্গল সে বৎসর যায়নি।

১৯৫২ সালের খেলোয়াড়—

গোলে—মণিলাল ঘটক

ব্যাকে—ব্যোমকেশ বসু, ডাঃ পি কুমার, এস মল্লিক

হাফে—গোকুল, চন্দন সিং, এস. রায়, অসীম মুখার্জী, বি. গুহ

ফরোয়ার্ডে—ভেঙ্কটেশ (অধিনায়ক), আপ্পাবাও, ধনরাজ, আমেদ সালে, মামুদ ফকৃরী, রমণ, নিশীথ বিশ্বাস।

১৯৫৩ সাল।

এই বৎসরও টীমে কয়েকটী নূতন খেলোয়াড় আমদানী হয়। যথাক্রমে আসামের খ্যাতনামা গোলরক্ষক শৈলেন দাশ গুপ্ত ( ডাক্তার ), ডোরাই লিঙ্গম নামে একটি মাদ্রাজী ব্যাক খেলোয়াড়, মাদ্রাজের উইমকো টীমের খ্যাতনামা সেণ্টার-হাফ আলগিরা স্বামী ও এন. কৃষ্ণস্বামী বা কিট্টু, এরিয়ান টীম থেকে হাফ ব্যাক অমল দত্ত, মোহামেডান থেকে রাইটইন ফজলুর রহমান খাঁন আর পাকিস্তান থেকে নিয়াজ মহম্মদ নামক একজন হাফ ব্যাক খেলোয়াড় যোগদান করে। চন্দন সিং রাজস্থান ক্লাবে চলে যায়। লীগের খেলা অবশ্য ভাল ভাবেই চলতে থাকে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে মোহনবাগান লীগের ১ম খেলায় ইষ্ট বেঙ্গলের নিকট ১—০ গোলে পরজয় বরণ করে। মোহনবাগান অবশ্য ইষ্ট বেঙ্গলের নিকট বহুবার পরাজিত হয়েছে, সেজন্য কথা নয়। কথা হচ্ছে এইজন্য যে এই খেলায় ইষ্ট বেঙ্গলের লেফট আউট ফকরীর চাতুর্য্যপূর্ণ দর্শনীয় গোল। এই গোলটির কথা বহুদিন ক্রীড়ামোদী দর্শকদের মনে থাকবার কথা, যেহেতু মোহনবাগানে সে বৎসর গোলরক্ষক ছিলেন ভারতীয় অলিম্পিক ফুটবল টীমের খ্যাতনামা গোলরক্ষক মহীশূরের বরদারাজ। এই বরদারাজ সেদিন খুবই কৃতিত্বের সহিত গোলরক্ষাকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন নাই। ফক্রীর চাতুর্য্যের কাছে তাঁকে অবনত হতে হয়েছিল। তা' ছাড়া মোহনবাগানের টীমও সেদিন শক্তিশালী টীমই ছিল। ইষ্ট বেঙ্গলের টীমের চাইতে মোহনবাগান টীম যে শক্তিশালী ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কার্য্যকালে মোহনবাগান সর্ব্বরকমে হীনপ্রভ হয়ে পড়ে। ইহা একটি স্মরণীয় খেলা। টীম ছিল এই রূপ—

ইষ্ট বেঙ্গল—মনিলাল ঘটক, ডাঃ পি. কুমার, ডোরাই লিঙ্গম ;
গোকুল, আলগিরাস্বামী ও এস. রায় ; ভেঙ্কটেশ,
এফ, আর. খাঁন, ধনরাজ, আমেদ, ফক্রী।

মোহনবাগান—বরদরাজ, সুশীল গুহ; শৈলেন মান্না, রতন সেন, এস. সর্ব্বাধিকারী ও এস. ঘোষ, বাবু, সমর ব্যানার্জি, রমণ, সত্তার, জে. এন্টনী।

সে বৎসর লীগের খেলা সম্পূর্ণ হয়নি। অনিবার্য্য কারণ বশতঃ লীগের খেলা পরিত্যক্ত হয়। তন্মধ্যে প্রধান কারণটি হলো ইষ্ট-বেঙ্গল টীমের ইউরোপভ্রমণ। লীগের ২৮টি খেলার মধ্যে মাত্র ১৭—১৮টি গেম পর্য্যন্ত হয়েছিল। ইষ্ট বেঙ্গল লীগের শীর্ষ স্থানাধিকারা থেকে ১৭টি গেম খেলে খেলা পরিত্যাগ করেন।

সেই বৎসর ইউরোপের রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেষ্ট সহরে বিশ্ব-যুব-উৎসব অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা তালিকাভুক্ত ছিল এবং পৃথিবীর প্রায় দেশেই তারা আমন্ত্রণ জানায়, তাতে অনেক টিম যোগদান করেছিল। ভারতবর্ষ থেকেও একটি টিম নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ আসে। ইষ্টবেঙ্গল টিম সে আমন্ত্রণ গ্রহন করে। ইস্টবেঙ্গল টিমে কিছু ত্রুটি ছিল ব্যাক ও হাফ ব্যাক নিয়ে। তখন সারা ভারতে একমাত্র চন্দন সিং ছাড়া ভাল সেণ্টার হাফ খেলোয়াড় ছিল না অথচ চন্দন সিং সেই বৎসরই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব পরিত্যগ করে রাজস্থান ক্লাবে যোগ দিয়েছে। ক্লাবের পক্ষে এবিষয়ে বড়ই আক্ষেপের কারণ হলো। কি আর করা যায়? কর্ত্তৃপক্ষ দক্ষিণ ভারত থেকে তুচারজন খেলোয়াড় আনাবার ব্যবস্থা করলেন। বাঙ্গালোর থেকে অভিজ্ঞ সেণ্টার হাফ বসিরকে আনানো হল, মাদ্রাজের উইমকো টীমের খ্যাতনামা সেণ্টার ফরোয়ার্ড থঙ্গরাজ এলো। ট্রায়াল নেওয়া হলো। এ. আই. এফ এফ. বসিরকে খেলতে অনুমতি দিলেন না, কেবল থঙ্গরাজ দলভুক্ত হলেন। এই থঙ্গরাজের খেলা আমরা মাত্র এক দিনই দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে যে মুর্গেশের স্টাইলের খেলা এবং খুবই সুযোগসন্ধানী সে। চেহারাও ভাল সেণ্টার ফরোয়ার্ডের উপযুক্তই বটে। অবশ্য এই থঙ্গরাজ ইউরোপ সফরে ইষ্ট বেঙ্গলের

পক্ষে খেলে বেশ সুনাম অর্জ্জন করেই ফিরে আসেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্ত্তী কালে তাঁকে কলকাতায় খেলাবার চেষ্টা করেও কোন ফল হয়নি, যেহেতু থঙ্গরাজ মাদ্রাজ উইমকোর কর্ম্মচারী। দীর্ঘদিনের ছুটি করে তাঁকে দিয়ে খেলানো সম্ভব হয়নি। মাদ্রাজ সহর ছেড়ে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। নতুবা ইষ্ট বেঙ্গল টীমে খেলবার আগ্রহ তাঁর যথেষ্টই ছিল। যাই হউক ইষ্ট বেঙ্গল টীম ১৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে ইউরোপ সফরে রওনা হলেন। ২৭শে জুলাই। দলের সঙ্গে ম্যানেজার হয়ে গেলেন জেনারেল সেক্রেটারী জ্যোতিষচন্দ্র গুহ।

খেলোয়াড়গণ—গোলে—মণিলাল ঘটক, ডাঃ এস. দাশ গুপ্ত,

ব্যাকে—ডাঃ পি, কুমার, ডোবাই লিঙ্গম, নিয়াজ আলী

হাফ-ব্যাকে—গোকুল, আলগিরাস্বামী, অমল দত্ত, অসীম মুখার্জী

ফরোয়ার্ডে—ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, থঙ্গরাজ, আমেদ, সালে, ফক্‌রী, কিট্টু।

সেই বৎসরের স্থায়ী অধিনায়ক ধনরাজকে নিয়ে যাওয়া হয় নাই। তার পরিবর্ত্তে গোকুলকে অধিনায়ক এবং আমেদ খাঁকে সহকারী অধিনায়ক নির্ব্বাচিত করে নেওয়া হয়।

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ইষ্টবেঙ্গল টীম বুখারেষ্ট সহরে পৌছায়। ৬ই আগস্ট লেবাননের সঙ্গে প্রথম গেম খেলে এবং ৬—০ গোলে জয়লাভ করে। ২য় খেলা হয় অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে, তাতেও ২—০ গোলে জয়লাভ করে। তারপরে রুমানিয়ার সঙ্গে সেমি-ফাইনাল খেলায় ৩ ০ গোলে পরাজয় বরণ করে। তারপর বুখারেস্টের যুব-উৎসব শেষে রাশিয়া ভ্রমণের প্রস্তাব আসে। রাশিয়ার পাশপোর্ট, ও ভিসা সংগ্রহ করে আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো সহরে গিয়ে পৌছায়। ২১শে আগস্ট প্রথম খেলা হয় রাশিয়ার টর্পেডো ডাইনামো টীমের সঙ্গে। খেলাটী মস্কো ডাইনামো

স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। রাশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্টেডিয়াম এইটি। এই খেলায় দর্শকসংখ্যা ছিল অপরিমিত। ভারতবর্ষ থেকে এই প্রথম একটি ফুটবল টীম রাশিয়া-ভ্রমণে গিয়েছে, এই সংবাদ রাশিয়ার সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গেয়েছে এবং কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয়ে বহুলোক খেলা দেখতে এসেছিল। অবশ্য খেলা দেখে ক্রীড়ামোদী দর্শকবৃন্দ নিরাশ হয়নি। তাঁরা এই নবাগত ভারতীয় টীমের খেলা দেখে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ভূয়সী প্রশংসাই সেদিন করেছিলেন। খেলার ফলাফল হয়েছিল সমান সমান উভয় পক্ষই তিনটি করে গোল দেন। খেলাটীর ছায়াচিত্র গ্রহণ করে উহা সমগ্র রাশিয়ায় ও ভারতে দেখান হয়েছিল।

খেলার টিম ছিল এইরূপ—

ইষ্টবেঙ্গল—এম. ঘটক, ডাঃ পি. কুমার, ডোরাইলিঙ্গম, নিয়াজ, আপ্পাগিরাস্বামী, ও অমল দত্ত, ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, থঙ্গরাজ, আমেদ ও ফক্‌রী।

টর্পেডো ডাইনামো—পেট্রোভ, বুচকোভ, ও গোমেস, আর্মিপোভ, সোলো মার্টিন ও সেন উইকোভ, ইলিন, ইভানভ, মালোভ, ফেডোরোভ, ও আনিসিমভ।

ইষ্টবেঙ্গল পক্ষে গোল দেন—থঙ্গরাজ ১টি ও ভেঙ্কটেশ ২টি;

টর্পেডো পক্ষে গোল দেন - ইভানভ, ফেডোরোভ, ইলিন।

এই খেলাটি সত্যিই অপূর্ব আনন্দ দান করেছিল রাশিয়ান দর্শকদের

তারপর ইষ্টবেঙ্গল টিম জার্জিয়ার রাজধানী তিফ্‌লিসে যায় একটি গেম খেলবার জন্য। সেই খেলায় ৯—১ গোলে পরাজিত হয়। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ দাঁড়াতেই পারেনি। ওখান থেকে কিয়েভ. যায়—সেখানে ১টি খেলায় ১৩—১ গোলে পরাজিত হয়। এত গোল হওয়ার কারণ সেখানে আরও প্রচণ্ড শীত, ভারতীয় খেলোয়াড়দের হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে যায়। খেলবে কি!

দৌড়াবার ক্ষমতাও লুপ্ত হয়ে যায়। ইচ্ছা করলে স্থানীয় দল আরও অনেক গোল দিতে পারতো, কিন্তু তা' তারা করেনি। থেমে গিয়ে -ছিল এবং নিজেরাই দৌড়াদৌড়ি করে সময় ক্ষেপ করেছে। পুনরায় মস্কোতে ফিরে এসে মস্কো ডাইনামো টীমের সঙ্গে খেলে এবং ৬—০ গোলে পরাজিত হয়। এই খেলাটি যদিও প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়েছিল তথাপি মস্কো ডাইনামো টীমের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। মস্কো ডাইনামো টীম রাশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টীম। তাদের সঙ্গে ইষ্টবেঙ্গল কেন ইউরোপের যে কোন শ্রেষ্ঠ টীমই হিমসিম খেয়ে যায়। মস্কো ডাইনামো টীমের খেলোয়াড়গণ বাস্তবিকই আদর্শ খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত। তারপর রাশিয়া সফর করে ইষ্টবেঙ্গল ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

ইতিমধ্যে কলকাতায় আই. এফ. এ. শীল্ড খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। ইস্টবেঙ্গল কলকাতায় এসেই শীল্ডের খেলায় যোগদান করে। ২য় রাউণ্ডে পুলিশ টীমকে ৩—১ গোলে, তৃতীয় রাউণ্ডে গুর্খা রাইফেলস্ টীমকে ১—০ গোলে, চতুর্থ রাউণ্ডে টাটা স্পোর্টস্ দলকে ০ ০, ১—০ গোলে, সেমি-ফাইনালে উয়ারী টীমকে ২—১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠলো। অপর দিকে বোম্বাই থেকে আগত ইণ্ডিয়া কালচার লীগ টীম ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গলের সম্মুখীন হলো। তারা ২য় রাউণ্ডে জর্জ টেলিগ্রাফ দলকে ১ ০ গোলে, ৩য় রাউণ্ডে মজঃফর-পুরের স্টুডেন্টস্ ক্লাব দলকে ৬—০ গোলে, ৪র্থ রাউণ্ডে মোহনবাগান দলকে ৪ ২ গোলে পরাজিত করে। সেমি-ফাইনালে জামসেদপুর স্পোর্টিং টীমকে ১ ১, ৩—০ গোলে পরাস্ত করে ফাইনালে উঠে। ইণ্ডিয়া কালচার লীগ টীম বোম্বাইয়ের সমস্ত বাছাই-করা খেলোয়াড় নিয়ে তৈরী। বেশ শক্তিশালী টীমই বলা চলে। ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা ঠিক যোগ্য দল মনে না হলেও উপর্যুপরি দুই দিন তারা অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে—কোন দলই গোল করতে পারেনি। তৃতীয় দিন খেলার পর দেখা গেল উভয় দলই

একটি করে গোল করেছে। কিন্তু বোম্বাই দল এ. আই. এফ. এফ.-এর নিকট প্রতিবাদ জানায়! প্রতিবাদ জানাবার কারণ ঘটেছিল এই যে ইতিমধ্যে পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশন তাদের দেশের কোন খেলোয়াড়কে অন্য দেশে আর খেলতে দিতে রাজী নয়, সেইজন্য এক রুল জারী করে এবং সেই রুল জারী হয় মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্ম্মকর্ত্তা এবিষয়ে এ. আই. এফ. এফ.-এর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা পঙ্কজ গুপ্তের কাছে বলায় তিনি পাকিস্তানী খেলোয়াড়দের খেলাবার জন্য মৌখিক অনুমিত দিলেন এবং সেই কারণেই ২ জন পাকিস্তানী খেলোয়াড়কে (নিয়াজ ও ফকৃরী) দলভুক্ত করে খেলানো হয়। অথচ বোম্বাই-আগত টীম প্রতিবাদ করে। তারপর নানা বাদ-প্রতিবাদ সভা-সমিতি করে আই. এফ. এ. সিদ্ধান্ত করে যে ইষ্টবেঙ্গল টীমকে বাতিল করে ইণ্ডিয়া কালচার লীগ টীমকে বিজয়ী সাব্যস্ত করা হৌক। কার্য্যতঃ তাই করাও হলো। ইণ্ডিয়া কালচার লীগ টীম আই. এফ. এ. শীল্ডবিজয়ী হয়ে শীল্ড নিয়ে বোম্বাই চলে গেল। এইরূপ সুবিচার ইষ্টবেঙ্গল টীমের উপর খেলাধূলার কর্ম্মকর্ত্তারা চিরদিনই করে আসছেন, আরও কতকাল করবেন তা একমাত্র সর্ব্বনিয়ন্তাই জানেন।

উক্ত ফাইনাল খেলায় তিন দিনের অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়গণ—

ইষ্টবেঙ্গল—গোলে—এম. ঘটক, বি. বোস, ডাঃ কুমার, গোকুল, আলগিরাস্বামা ও অমল দত্ত, নিয়াজ, ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, কিট্টু, আমেদ, সালে, ফকৃরী।

আই. সি. এল (বোম্বাই)—সঞ্জীব, শিবরাম ও পিটার্স, র‍্যাফেল. গোলাব সিং ও শঙ্কর, ডি. শা, পারেব, স্যাক্সবি, টমাস ও কৃষ্ণান।

তারপর দিল্লী ডুরাণ্ড কাপে ইষ্টবেঙ্গল টীম যোগদান করে, কিন্তু দেরাদুনের ন্যাশনেল ডিফেন্স একাডেমী টীমের কাছে অপ্রত্যাশিত-ভাবে পরাজয় বরণ করে ফিরে আসতে হয়। রোভার্স কাপে সে বৎসর টীম যোগদান করেনি।

১৯৫৪ সাল।

এ বৎসর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে বড়ই দুর্বৎসর। এ বৎসরে এই ক্লাবের পক্ষে কোন কিছুই উল্লেখযোগ্য নাই। এ বৎসর টীমের অধিনায়ক ছিলেন আমেদ খাঁ, কিন্তু তাঁর অধিনায়কতায় কোনই সুফল পাওয়া গেল না। এ বৎসর আই. এফ. এ. লীগ ও শীল্ড দুই-ই মোহনবাগান পায়। মোহনবাগানের সঙ্গে লীগের ১ম খেলায় ইষ্টবেঙ্গল পরাজিত হয়, দ্বিতীয় খেলায় ইষ্টবেঙ্গল মাঠে উপস্থিত হয়নি—মোহনবাগান ওয়াক ওভার পায়। সে বৎসর শীল্ডেও ইষ্ট-বেঙ্গল টীম যোগদান করেনি। ডুরাণ্ড কাপে যোগদান করেছিল বটে, কিন্তু মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল টীমের সঙ্গে পরাজিত হয়ে ফিরে আসতে হয়। রোভার্স কাপেও যোগদান করেনি।

এ বৎসর নূতন খেলোয়াড়ের মধ্যে মাদ্রাজের উইমকে. টিমের ফরোয়ার্ড বালসুব্রহ্মণ্যম উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন।

১৯৫৪ সালে রাশিয়ান ফুটবল টিম ভারত সফরে আসে। সমগ্র ভারতভ্রমণ করে প্রত্যেকটি খেলাতেই তারা জয়লাভ করে গেছে। সর্বসমেত ১০০টি গোল করেছে। ভারতের কোন নামজাদা টীমই বাদ যায়নি এদের কাছে না হেরেছে। খেলায় তারা খুবই উৎকর্ষতা দেখিয়েছিল। এমন চমৎকার দর্শনীয় গেম আমরা এর পূর্বে আর কখনও দেখি নি।

১৯৫৫ সাল।

ইষ্টবেঙ্গল টিম আই. এফ. এ. লীগে এরিয়ানের সঙ্গে যুক্তভাবে রানার্স আপ হয়। চ্যাম্পিয়ানশিপ দখল করে মোহনবাগান টিম। লীগের খেলায় কোন বিশেষত্ব ছিল না। মোহনবাগানের সঙ্গে লীগের খেলায় ১ম দিন ড্র হয় এবং দ্বিতীয় দিন ইষ্টবেঙ্গল পরাজিত হয়। তারপর শীল্ডের খেলায় সেমি-ফাইনালে রাজস্থানের নিকট পরাজিত হয়ে শীল্ড থেকে বিদায় নিতে হয়। মোহনবাগান টিমও এরিয়ান টিমের নিকট পরাজয় বরণ করে। রাজস্থান ও

এরিয়ান শীল্ড ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। রাজস্থান এরিয়ান টিমকে প্রথম দিনে কাবু করতে পারেনি, ড্র হয়, কিন্তু পরদিন ১—০ গোলে এরিয়ানকে হারিয়ে শীল্ড বিজয়ী হয়। এই বৎসর ইষ্টবেঙ্গল ডুরাণ্ড কাপে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের নিকট পরাজয় বরণ করে। রোভার্স কাপে যোগদান করেনি। এ বৎসর টিমের অধিনায়ক ছিলেন গোকুল।

টীমের খেলোয়াড়গণ :- -

গোলে - ডাঃ শৈলেন দাশগুপ্ত

ব্যাকে— ডাঃ পি. কুমার, এস মল্লিক, এ হক

হাফে— গোকুল ( অধিনায়ক ), অমল গুপ্ত, সম্বুল খাঁ, অমল দত্ত

ফরোয়ার্ডে--বালসুব্রহ্মণ্যম, আমেদ খাঁ, পরেশ চ্যাটার্জি, কিট্টু, সুধীর রায় এবং আপ্পারাও।

সুবিখ্যাত খেলোয়াড় আপ্পারাও এ বৎসর খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। প্রায় ১৮ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তিনি ফুটবল খেলেছেন, তাঁর মত যশস্বী খেলোয়াড় ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই। তিনি পাঁচ বার আই. এফ. এ. শীল্ড হোল্ডার ছয়বার লীগ চ্যাম্পিয়ান, ডুরাণ্ড কাপ, রোভার্স কাপ, অল ইণ্ডিয়া টুর্ণামেণ্ট (ত্রিবাঙ্কুর) প্রভৃতি ভারতের সেরা ট্রফিগুলি জয় করেছিলেন। তাঁর মত ও-রকম চমৎকার খেলা আজ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ের মধ্যে দেখা যায়নি আর ভবিষ্যতে দেখার আশাও করা যায় না—কেননা বর্ত্তমানে ঐ ধরনের খেলোয়াড় আর একটিকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ত'ছাড়া ও-রকম নিরহঙ্কারী নির্ব্বিরোধ, শান্ত, অমায়িক হাস্যমুখ খেলোয়াড় খুব কমই দেখা যায়। তিনি ভারতবর্ষে একজন আদর্শ ফুটবল খেলোয়াড়। মাদ্রাজ প্রদেশে কোকনদ (cocanada) সহরে তাঁর নিবাস। তাঁর ভগ্নীপতি রামালু-ও একজন ভাল খেলোয়াড় [illegible] ইষ্টবেঙ্গলে খেলে গেছেন। [illegible] আপ্পারাওয়ের সম্মান রক্ষার জন্য যথাসাধ্য [illegible] ক্লাবের প্রতি আপ্পারাও কৃতজ্ঞ ও আস্থাবান।

১৯৫৬ সাল।

এই বৎসর আই. এফ. এ লীগ ও শীল্ড খেলায় ইষ্টবেঙ্গল টীম সুবিধা করতে পারেনি। লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং শীল্ড-হোল্ডার হয়েছিল মোহনবাগান টীম। এ বৎসর পাকিস্তান থেকে দুজন খেলোয়াড় এসে যোগদান করে—একজন হাফ-ব্যাক খেলোয়াড় হাসান আর একজন লেফ্‌ট-আউটের খেলোয়াড় মুসা। তা ছাড়া সাভিসে টীমের দুজন খেলোয়াড়ও যোগদান করে—একজন কেম্পিয়া, অপরজন বীর বাহাদুর। এই দুজন খেলোয়াড় উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের হাফ-ব্যাক খেলোয়াড়। মাদ্রাজী ব্যাক খেলোয়াড় এম. রেড্ডী-ও এবৎসর যোগদান করেছিল। তাছাড়া এরিয়ান টীমের ব্যাক ভবরায়-ও যোগদান করে। এই বৎসরের প্রথম ভাগে ফেব্রুয়ারী মাসে কালিকট থেকে কে. পি. নায়ার গোল্ড কাপ খেলার জন্য ইষ্টবেঙ্গল টীমের কাছে এক আমন্ত্রণ আসে। তাতে যোগদান করার জন্য টীম তৈরী হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি টীম কালিকট যায় এবং উক্ত কে. পি. নায়ার গোল্ড কাপে যোগদান করে। ফাইনালে হায়দরাবাদ একাদশ টীমকে ৩—২ গোলে পরাজিত করে কাপ বিজয়ী হয়। ৬ই মার্চ্চ ১৯৫৬, কালিকটে এই ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনালে টীম ছিল এইরূপ—

ইষ্টবেঙ্গল—এস. ঘোষ, এম. রেড্ডি, ভব রায়, হাসান, কেম্পিয়া ও অমল দত্ত, বালসুব্রহ্মণ্যম, আমেদ ( অধিনায়ক ), মুসা, কিট্টু, সুধীর রায়।

হায়দরাবাদ একাদশ—ইব্রাহিম, গিয়াসুদ্দিন, হালিম, ইউসুফ খান, আমেদ হোসেন (অধিনায়ক), কালিম, শেখ আলী, রহমতউল্লা, রহমান. জুলফিকার, মহম্মদ ইউসুফ,।

রেফারী—মিঃ পেলানি ভেলু।

ইষ্টবেঙ্গল পক্ষে মুসা ২, কিট্টু ১, আর হায়দরাবাদ পক্ষে গোল করেন ইউসুফ খান ও রহমান। খিদিরপুর স্পোর্টিংয়ের গোলরক্ষক এস. ঘোষ ইষ্টবেঙ্গল টিমের হয়ে কালিকট খেলতে যায়।

তারপর লীগ ও শীল্ডে সুবিধা করতে না পারলেও ডুরাণ্ড কাপ জয় করে নিয়ে আসে। ডুরাণ্ড কাপে যাওয়ার সময় অন্যান্য টীমের খেলোয়াড় সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া হয়, যথা—বি. এন. আর. টীমের গোলরক্ষক মাখন চাটার্জি ও ফরোয়ার্ড ভারালু, রাজস্থান টীমের ব্যাক রহমান ও ফেণ, ফরোয়ার্ড কানাইয়ান দলভুক্ত হয়। ফাইনালে হায়দরাবাদ পুলিশ টিমকে ২—০ গোলে পরাজিত করে ডুরাণ্ড কাপ নিয়ে আসে। এই ফাইনাল খেলাটি ১৯৫৭ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। গোল করেছিল বালা ও মুসা।

টীমছিল এইরূপ—

ইষ্টবেঙ্গল—মাখন চাটার্জি, টি. এ. রহমন, ফেন, হাসান, বীর বাহাদুর, কেম্পিয়া, কানাইয়ান, বালসুব্রহ্মণ্যম, ভারালু, কিটু (অধিনায়ক), মুসা।

হায়দরাবাদ পুলিশ—নবী, আজিজ, ইউসুফ খান, প্যা া ট্রিক, কালিম. নুব, মইন, লায়কে, সুশে, জুলফিকার, মহম্মদ ইউসুফ।

রেফারী ছিলেন—জয় রামন।

রোভার্স কাপে—সে বৎসর-ও যোগদান করা হয়নি।

১৯৫৬ সালের টীমের নিয়মিত অধিনায়ক ছিলেন গোলরক্ষক ডাঃ এস. দাশ গুপ্ত, কিন্তু এ বৎসর যে দুইটি ট্রফি পাওয়া গিয়েছিল, তাহার কোনটাতেই তিনি যোগদান করেননি।

১৯৫৬ সালের খেলোয়াড়গণ—

গোলে—ডাঃ এস. দাশ গুপ্ত

ব্যাকে—ডাঃ পি. কুমার, ভব রায়, এম. রেড্ডি

হাফে—হাসান, কেম্পিয়া, বীর বাহাদুর, অমল দত্ত, অমল গুপ্ত
ফরোয়ার্ডে—বালসুব্রহ্মণ্যম, আমেদ, তাপস বসু, কিটু, মুসা,
সুধীর রায়।

১৯৫৭ সাল।

এ বছর কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল টীমের বিশেষ কোন কৃতিত্ব নাই। লীগে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। লীগ চ্যাম্পিয়ান হয় মোহনবাগান আর ইষ্টবেঙ্গলকে রানার্স আপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আই. এফ. এ. শীল্ডের সেমি-ফাইনাল খেলায় মোহামেডানের বিপক্ষে খেলতে হয়। মোহামেডান স্পোর্টিং মাঠেই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় মোহামেডানেব খেলোয়াড়গণ দৈহিক শক্তি প্রদর্শন করে খেলতে থাকে। অর্থাৎ ইষ্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের অযথা মারধোর কবতে থাকে। রেফারী খেলাটি ঠিকমত পরিচালনা করতে সক্ষম হয় না। এমতবস্থায় ইষ্টবেঙ্গল দলের সমর্থকগণ অধীর হয়ে উঠে, উপায়ান্তর না দেখে খেলার শেষার্দ্ধে ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়দের মাঠ থেকে টেনে নিয়ে আসা হয়। এই অবস্থাতে আই. এফ. এ. কর্তৃপক্ষ ইষ্টবেঙ্গল টীমকে সাসপেণ্ড করে। ইষ্টবেঙ্গলের সাধারণ সম্পাদক জ্যোতিষ গুহ আই. এফ. এ.র সিদ্ধান্তকে জুলুমবাজী মনে করে হাইকোর্টে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। হাইকোর্টে আই. এফ. এ. কমিটির উপর ইনজাঙ্কসন জারী করেন। এই সুযোগে জ্যোতিষ গুহ টীম নিয়ে দিল্লীতে ডুরাণ্ড কাপ ও ডি. সি. এম. ট্রফি খেলতে চলে যান। বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ডি. সি. এম. ট্রফি জয় করেন। তারপর ডুরাণ্ডের খেলায় ফাইনালে হায়দরাবাদ পুলিশ টীমের নিকট ২—১ গোলে পরাজয় বরণ করে ফিরে আসে। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান টীমের সঙ্গে খেলা পড়ে। দিল্লী সহরে ইষ্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান এই প্রথম সাক্ষাৎ, তা-ও আবার ডুরাণ্ড কাপের সেমিফাইনালে, কিন্তু এই প্রথম সাক্ষাতে ইষ্টবেঙ্গল টীমই জয়লাভ করে। খেলাটিতে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা

হয়েছিল। উভয় পক্ষই প্রাণপণ যুঝেছিল, শেষ পর্য্যন্ত—মোহনবাগান টীম মাথা হেট করতে বাধ্য হয়। ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৫৭ এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩—২ গোলে খেলার মীমাংসা হয়।

টীম এইরূপ ছিল—

ইষ্টবেঙ্গল এস. শেঠ, চিত্তচন্দ, শুভাশীষ গুহ, হাসান, বীর-বাহাদুর, রামবাহাদুর, ইব্রাহিম, বালসুব্রহ্মণ্যম, সুশান্ত ঘোষ, বলরাম, মুসা।

মোহনবাগান--স্বরাজ চাটার্জি, সুশীল গুহ, শৈলেন মান্না, কেম্পিয়া, এস. সর্ব্বাধিকারী, নর্সিয়া, এন. মুখার্জি, ভারালু, কেষ্ট পাল, চুনী গোস্বামী, এস. দত্ত।

রেফারী ছিলেন—জয়রামন।

ইষ্টবেঙ্গল পক্ষে গোল করেন বালসুব্রহ্মণ্যম, সুশান্ত ঘোষ, মুসা আর মোহবাগান পক্ষে চুনী গোস্বামী ও এন. মুখার্জি।

রোভার্স কাপে এ বৎসরও যোগদান করা হয়নি।

১৯৫৭ সালে ইস্টবেঙ্গল টীমে কয়েকজন নূতন খেলোয়াড় যোগ-দান করে। যথা—গোলরক্ষক সনৎ শেঠ, ব্যাক—চিত্ত চন্দ, শুভাশীষ গুহ, হাফ-ব্যাক—রামবাহাদুর, ফরোয়ার্ড—সুবিখ্যাত বলরাম, নারায়ণ, ও নীলেশ সরকার।

১৯৫৭ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের হকি টীম বাইটন কাপ জয় করে। যদিও এই ক্লাবের ইতিহাসে হকি, ক্রিকেট, টেনিস বা স্পোর্টস সম্বন্ধে এতাবৎ কিছুই লেখা হয়নি। পুস্তকের শেষাংশে এই সকল বিভাগের বৃত্তান্ত দেওয়া হবে; কিন্তু হকি বিভাগে বাইটন কাপ জয় করা খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক ও গৌরবের বিষয়। এইজন্য অন্ততঃ এইটুকু বিষয় লেখা হল। বাইটন কাপ ভারতীয় হকি খেলার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ট্রফি সুতরাং বাইটন বিজয় যে খুবই উল্লেখযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

সে বছর বাইটন কাপে উত্তর প্রদেশ, সেন্ট্রাল রেল দল, দিল্লী একাদশ প্রভৃতি বহিবাগত বিশিষ্ট টীম যোগদান করেছিল, তা' ছাড়া স্থানীয় টীমত আছেই। শেষ পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল টীম ও মোহামেডান স্পোর্টিং টীম ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ইষ্টবেঙ্গল মোহামেডানকে ১—০ গোলে পরাজিত করে কাপ জয় করে। তা'ছাড়া হকি খেলার ২য় ট্রফি লক্ষ্মীবিলাস কাপও ইষ্টবেঙ্গলই জয় করে।

ইষ্টবেঙ্গলের টীম ছিল এইরূপ—

গোলে—ডোগরা, ব্যাকে—গুরুবক্স সিং ও বডরিগ্‌স্ (অধিনায়ক)

হাফে—ইন্দ্রজিৎ সিং, উন্নিকৃষ্ণান, কনওয়েল

ফরোয়ার্ডে—রবি দাশ, বালু, জগদীশ, সুরেন্দ্র সিং ও শেঠি।

৯ই মে ১৯৫৭, এই খেলা হয়। নিয়মিত অধিনায়ক বি. দফাদার এই খেলার যোগদান করতে না পাবায় বডরিগস্ অধিনায়কতা করেন।

১৯১৮ সালে আই. এফ. এ. কমিটী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে গত বৎসরের মামলা মোকদ্দমা সমস্তই আপোষে মিটিয়ে ফেলেন। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব সম্মানজনক সর্ত্তে পুনরায় আই. এফ. এ,র খেলা ধুলায় যোগদান করেন। এ বিষয়ে জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র গুহ যে অনমণীয় মনোভাব দেখিয়েছিলেন, তা' বজায় থাকায় তিনি ক্লাব সমর্থকদের কাছে প্রশংসা লাভ করেন।

১৯৫৮ সাল।

লীগে তেমন সুবিধা হয়নি লীগ চ্যাম্পিয়ন হলো ইষ্টার্ণরেল দল, রানার্স হয় মোহনবাগান। ইষ্টবেঙ্গল তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এ বছর ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগানের নিকট লীগের দুইটি খেলাতেই পরাজয় বরণ করে।

তারপর আসে আই.এফ.এ. শীল্ডের খেলা। ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগানের সম্মুখীন হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বর ফাইনাল খেলার তারিখ পড়ে। উক্ত খেলায় মোহনবাগান টীম সর্ব্বাংশে ভাল খেলে

এবং প্রথমার্দ্ধে মোহনবাগান দলের অধিনায়ক সমর ব্যনার্জি ১টি গোল করে। তার কিছুক্ষণ পরেই তাদের রাইট হাফ কেম্পিয়া একটি আত্মঘাতী গোল করে খেলার ফলাফল সমান করে দেয়। তারপর আর কোন গোল হয় না, খেলাটি অমীমাংসিত ভাবেই শেষ হয়। এরপর মাঠ না পাওয়ায় খেলাটির পুনরনুষ্ঠান হতে দেরী হয়। অনেকদিন পর ২৯শে জানুয়ারী পুনরায় ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে খেলাটি পুনরনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খেলায় ইষ্টবেঙ্গল টীম ভাল খেলে এবং ১— গোলে জয়লাভ করে। খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষ দিকে রাইট ইন নারায়ণ তীব্র সটের সাহায্যে গোল করে খেলার জয়-পরাজয়ের মীমাংসা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই যে প্রথম খেলার দিন আই. এফ. এ. কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করেছিলেন যে উভয়দলকেই জয়ী সাব্যস্ত করে শীল্ড দিয়ে দেন, কিন্তু মোহনবাগানের অধিনায়ক সমর ব্যানার্জির আপত্তির জন্য তা' হয়নি। তিনি বল্লেন যে "এই রকম ভাগাভাগী করে শীল্ড নিয়ে কাজ নেই, যদি পারি খেলেই শীল্ড নেব।" অবশ্য তাঁর মনোভাব খুবই প্রশংসনীয়, একথা সত্য কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর এই গর্ব্বোক্তি কার্য্যকরী হয়নি। পরাজয় বরণ করেই ক্ষান্ত থাকতে হয়।

শেষ ফাইনাল খেলার টিম ছিল এইরূপ—

ইষ্টবেঙ্গল—এস. শেঠ, শুভাশীষ গুহ, রামবাহাদুর, হাসান, বীরবাহাদুর, তপন চৌধুরী, আমেদ, নারায়ণ, নীলেশ সরকার, বলরাম, মুসা।

মোহনবাগান—অবনী বসু, সুশীল গুহ, শৈলেন মান্না, কেম্পিয়া, আমেদ হোসেন, নর্সিয়া, ভেঙ্কট, এস. ব্যানার্জী (অধিনায়ক), কে. পাল, সি. গোস্বামী, রমন।

রেফারী—প্রভাত অরুন সোম।

ইষ্টবেঙ্গলের নিয়মিত অধিনায়ক অমল গুপ্ত খেলায় অংশ গ্রহণ না করায় সেণ্টার হাফ – বীরবাহাদুর অধিনায়কতা করেন। তা'ছাড়া

বীরবাহাত্তুরের খেলাও বাস্তবিক অধিনায়োকচিত হয়েছিল। এই খেলার সপ্তাহখানেক পূর্বে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী পরিবর্ত্তন হয়—জ্যোতিষ গুহ অপসারিত হন, তাঁর পরিবর্ত্তে জ্ঞানশঙ্কর সেন গুপ্ত এডভোকেট ) নূতন জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। অনেকের ধারণা এবার শীল্ড জয় নূতন সেক্রেটারী জ্ঞানবাবুর ভাগ্যের জোরেই হয়েছে। অবশ্য জ্ঞানবাবু ক্লাবের সঙ্গে বহুদিন যুক্ত আছেন এবং অক্লান্তভাবে ক্লাবের সেবা করে আসছেন।

১৯৫৯ সাল।

ইষ্টবেঙ্গল টীমের উল্লেখযোগ্য কোন কিছুই নাই। লীগে রানার্স আপ হয়েছিল। মোহনবাগানের সঙ্গে লীগের তুইটি খেলায় ১টিতে পরাজয়, ১টিতে জয়লাভ করে। আই. এফ. এ. শীল্ডে মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল তুই টীমই পুনরায় ফাইনালে উঠেছিল, কিন্তু খেলার মাঠ না পাওয়ায় উক্ত ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।

১৯৫৯ সালে আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিং টীমকে শোচনীয়ভাবে ৪—০ গোলে পরাজিত করেছিল। তার যোগ্য প্রতিশোধ নিয়েছিল মোহামেডান ডুরাণ্ড কাপে ও রোভার্স কাপ ফাইনালে। উক্ত তুইটি খেলাতেই ইষ্টবেঙ্গল শোচনীয়ভাবে মোহা-মেডানের কাছে পরাজয় বরণ করে। সে কথা ভোলবার নয়।

১৯৬০ সাল।

মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়, ইষ্টবেঙ্গল রানার্স আপ। শীল্ডের খেলায় সেমি-ফাইনালে ইণ্ডিয়ান নেভি টীমের কাছে ৩—০ গোলে পরাজয় বরণ করতে হয়। দিল্লীতে ডি. সি. এম. ট্রফি জয় করে ফাইনালে মোহামেডান স্পোর্টিংকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে। ডুরাণ্ড ট্রফিতে ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান যুগ্ম বিজয়ী সাব্যস্ত হয়। রোভার্স কাপে ইষ্টবেঙ্গল হায়দরাবাদ পুলিশের কাছে ২ দিন ড্র করার পর তৃতীয় দিনে ১—০ গোলে পরাজিত হয়ে ফিরে আসে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে রোভার্স কাপের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। বোম্বাইতে রোভার্স কাপে আর কোন দিন মোহনবাগানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। সেই খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ২—১ গোলে জয়লাভ করে। কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই এই তিন স্থানেই মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে মাথা হেঁট করেছে, এর ব্যতিক্রম হয়নি। ১৯৬০ সালে ইষ্ট বেঙ্গল টীম প্রথম হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ পায়।

১৯৬০ সাল।

বিখ্যাত খেলোয়াড় বলরামের অধিনায়কত্বে সুদীর্ঘ ৮ বৎসর পর ইষ্টবেঙ্গল সপ্তম বার লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে। বলরাম ২৪টি গোল দিয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মানও পায়। বলরামের মত কৌশলী গোলদাতা লেফট ইন এতাবৎ কাল দেখা যায়নি। নামজাদা খেলোয়াড় হিসাবেই বলরাম এই ক্লাবে যোগদান করেছিল, কিন্তু প্রথম প্রথম তেমন সুবিধা করতে পারেনি, ক্রমশঃ তার কার্য্যশক্তি প্রকাশ পেয়েছে। নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে ১৯৬০ সালে বলরাম ফরওয়ার্ড লাইনে অদ্বিতীয়। তারপরে হায়দরাবাদের ইউসুফ খাঁ, জুলফিকার ও চুনী গোস্বামীর নাম করা যায়।

লীগে ২৮টি খেলায় ২২টি জয়, ৩টি ড্র ও ৩টি পরাজয়। সর্বসমেত ৪৭ পয়েন্ট, স্বপক্ষে ৬৪ গোল বিপক্ষে ১১ গোল। ৪৭ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স হয় বি. এন. আর. টীম। মোহনবাগান লীগের দুইটি খেলাতেই পরাজয় বরণ করে ইষ্টবেঙ্গলের কাছে এবং উক্ত দুই দিনই গোল করে বলরাম।

তারপর আসে অই. এফ. এ. শীল্ডের খেলা। এবারেও ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগান ফাইনালে উঠে—২ দিন ড্র করার পর তৃতীয় দিনেও খেলার মীমাংসা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ইষ্টবেঙ্গলের সমাজপতি একটি গোল করেছিল, কিন্তু রেফারী সে গোল নাকচ করে দেয়। এ কথা

যুগান্তর পত্রিকা বেমালুম চেপে যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা সামান্য উল্লেখ করেছিল। কিন্তু ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করে। স্বাধীনতা পত্রিকা উক্ত গোল সম্পর্কে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে। যাই হউক খেলার মাঠে রেফারীর সিদ্ধান্তই চরম সুতরাং সংবাদপত্র বা দর্শক-সাধারণের মন্তব্যে রেফারী বা কর্ম্মকর্ত্তাদের মাথা ঘামে না। তারা এসব থোরাই কেয়ার করেন। শেষ পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে যুগ্ম বিজয়ী বলে সাব্যস্ত করা হয়।

শীল্ডে টীম ছিল এইরূপ—

ইষ্টবেঙ্গল—অবনী বসু, বিক্রমজিৎ দেবনাথ, চিত্ত চন্দ (অধিনায়ক), শ্রীকান্ত ব্যানার্জী, অরুণ ঘোষ, রামবাহাদুর, এস. সমাজপতি, সুনীল নন্দী, নীলেশ সরকার, কানন, বালু।

মোহনবাগান—সনৎ শেঠ, পি. সরখেল, টি. এ. রহমান, কেম্পিয়া, জার্ণেল সিং, অমিয় ব্যানার্জী, দীপু দাস, অমল চক্র, সালা-উদ্দিন, চুনী গোস্বামী (অধিনায়ক) অরুময়নৈগম।

রেফারী—নৃসিংহ চাটার্জী।

ইষ্টবেঙ্গল টীমের অধিনায়ক বলরাম এশীয় ক্রীড়াসম্মেলন খেলতে ভারতীয় ফুটবল টীমের সঙ্গে মারডেকা (মালয়) গিয়েছিলেন। সেখানে খেলায় তার পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে, সেইজন্য তিনি আই. এফ. এ. শীল্ডে যোগদান করতে পারেন নি।

১৯৬০ সালের খেলোয়াড়গণ—

গোলে—অবনী বসু, এস. কাঁড়ার

ব্যাকে—বিক্রমজিৎ দেবনাথ, চিত্ত চন্দ, অরুণ ঘোষ

হাফে—শ্রীকান্ত ব্যানার্জী, রামবাহাদুর, চিনু পাল

ফরোয়ার্ডে—সুকুমার সমাজপতি, সুনীল নন্দী, নীলেশ সরকার, কানন, বলরাম (অধিনায়ক), বালু, কানকি দাস।

১৯৬০ সাল।

এই বৎসর তিনটী নূতন খেলোয়াড় যোগদান করে. যথা, গোল রক্ষক—সি. আর. দাস, ব্যাক—সুশীল সিংহ, ফরোয়ার্ড হামিদ (হায়দরাবাদ)। সি. আর. দাশ মোহনবাগানে ছিল ২য় গোলরক্ষক হিসাবে এবং খেলেছেও ভাল, কিন্তু ইষ্টবেঙ্গলে যোগদান করে মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। সুশীল সিংহ বি. এন. আর. টীমে খেলছিল, এ বৎসর ইষ্টবেঙ্গলে যোগদান করে খুব ভাল খেলা দেখিয়েছে। এর ভবিষ্যৎ ভাল আশা করা যায়। হামিদ হায়দরাবাদের কোচ রহিমের আত্মীয়। ইনসাইডে খেলে থাকে, গত বৎসর মোহামেডানে খেলেছে, কিন্তু এ বৎসর ইষ্টবেঙ্গলে খেলে সুবিধা করতে পারেনি। খেলা মন্দ নয়, কিন্তু গোল করবার শক্তি কম। সন্তোষ চ্যাটার্জি নামক একটি লেফট আউট খেলোয়াড় আসে এরিয়ান টীম থেকে। এই বৎসর টীম লীগ খেলার প্রথম থেকেই এগিয়ে ছিল—শেষ পর্য্যন্ত এগিয়ে থাকা সম্ভব হয়নি। প্রধান কারণ এশীয় ক্রীড়া সম্মিলন জাকার্ত্তায় (যাভা, ইন্দুনেশিয়া) একটি ভারতীয় ফুটবল টীম পাঠানো হয়। সেই সঙ্গে ইষ্টবেঙ্গলের তিন জন সেরা খেলোয়াড় চলে গিয়েছিল (যদিও উক্ত এশীয় ক্রীড়া বাতিল হয়ে গিয়েছে)। শেষ পর্য্যন্ত লীগ খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সমান সমান পয়েন্ট পেলে উভয় দলেয় মধ্যে পুনরায় খেলা হয় চ্যাম্পিয়ানশিপ নির্ধারণের জন্য। সেই খেলায় মোহনবাগানই জয়ী হয় ২—০ গোলে তারপর আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলায় সেমি-ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল হায়দরাবাদ একাদশের নিকট ১—০ গোলে পরাজিত হয়। মোহন-বাগান উক্ত হায়দরাবাদ একাদশকে ফাইনালে ৩—০ গোলে হারিয়ে আই. এফ. এ. শীল্ড লাভ করে।

১৯৬০ সালে ডুরাণ্ড খেলা বাতিল করে দেওয়া হয়—কারণ চৈনিক ফৌজের আক্রমণ। বোম্বাই রোভার্স কাপ খেলা চালু ছিল। ইষ্টবেঙ্গল তাতে যোগ দেয়। ফাইনালে অন্ধ্র পুলিশের সঙ্গে

খেলা অমীমাংসিত থাকে। রোভার্স কাপ কমিটী ইষ্টবেঙ্গল ও অন্ধ্র পুলিশ দলকে যুগ্মবিজয়ী বলে সাব্যস্ত করেন। এবং খেলার পরিসমাপ্তি হয়।

ইষ্টবেঙ্গল টীম ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫২ সালে ডুরাণ্ড কাপ, আই. এফ. এ. শীল্ড ও রোভার্স কাপ খেলায় যুগ্মবিজয়ী আখ্যা লাভ করে। উক্ত তিনটি যুগ্মবিজয়ী খেলাতেই অধিনায়ক ছিলেন দলের লেফট ব্যাক চিত্ত চন্দ। ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

১৯৫২ সালের ফুটবল টীম—

গোলে—অবনী বসু, সি. আর. দাস। ব্যাকে—বি. দেবনাথ, সুশীল সিংহ, চিত্ত চন্দ (অধিনায়ক), হাফ-ব্যাকে—শ্রীকান্ত ব্যানার্জি, অরুণ ঘোষ, রামবাহাদুর, চিনু পাল। ফরোয়ার্ডে—এস. সমাজপতি, সুনীল নন্দী, নীলেশ সরকার, বলরাম, হামিদ, সন্তোষ চ্যাটার্জি।

১৯৫২ সালে হকি খেলায় একটি অপ্রত্যাশিত জয়লাভ ঘটেছিল বাইটন কাপ ফাইনালে। বাইটন কাপ প্রতিযোগিতায় ইষ্টবেঙ্গল টীম আশ্চর্যজনকভাবেই অগ্রসর হয়েছিল। প্রথম খেলায় দিল্লী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট টীমকে, ২য় খেলায় মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপ টীমকে, ৩য় খেলায় ইণ্ডিয়ান নেভী টীমকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে। তারপর ফাইনালে বোম্বাইয়ের গোল্ডকাপ বিজয়ী ও গত বৎসরের বাইটন বিজয়ী সেন্ট্রাল রেল দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। সেন্ট্রাল রেলদল সে বৎসর ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দল বলেই খ্যাত ছিল। এহেন সেন্ট্রাল রেল দলকে পরাজিত করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। যাঁরা খেলা দেখেছেন তাঁরাই ভাল করে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সেদিন সেন্ট্রাল রেল দল ইষ্টবেঙ্গল টীমের দাপটে কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। উক্ত খেলায় ইষ্টবেঙ্গল টীমের পক্ষে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন ব্যাক পি. চতুর্ব্বেদী, হাফব্যাক—কনওয়েল ও কুশলকুমার। ফরোয়ার্ড

লাইনের কৃতিত্ব খুব বেশী ছিল না তবে ক্ষিপ্র গতিবেগের জন্য বিপক্ষ-দলের ত্রাসের কারণ হয়েছিল।

ফাইনালে টীম ছিল এইরূপ—

গোলে—বি. কাপুর, ব্যাকে—পি. চতুর্বেদী, দলজিৎ সিং, হাফে—কনওয়েল, কুশলকুমার ও বেকার (অধিনায়ক), ফরোয়ার্ডে—কামারুদ্দিন, যোগীন্দর সিং, সৈয়দ, বালু, আফজল।

গোলরক্ষক কাপুর অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত গোল রক্ষা করেন। সারাক্ষণ খেলার মধ্যে কোন পক্ষই গোল করতে পারেনি। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় সেণ্টার হাফ কুশলকুমার সর্ট-কর্ণার হিটে জয়সূচক গোল করেন।

---

# হকি সেকশন

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের হকি সেকসন খোলা হয় ১৯২৫ সাল থেকে। তারা প্রথমে ২য় বিভাগে খেলতে আরম্ভ করে। অতি সাধারণ খেলোয়াড় নিয়েই খেলা চলতে থাকে, কোন কিছু উল্লেখ যোগ্য খেলা তখন হয়নি। ১৯৩৬-৩৭ সাল থেকে টীমের উন্নতি লক্ষিত হয়। উক্ত সময় দিল্লী, মানাভাদার ও ভূপাল থেকে কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় যোগদান করায় ১৯৩৭ সালে টীম অপরাজিত থেকে অতিরিক্ত যোগ্যতার সহিত ২য় ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়। তারপর নিয়মিতভাবে প্রথম ডিভিসন লীগ খেলে আসছে। ১৯৪৪ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সুযোগ এসেছিল বটে, কিন্তু সামান্যর জন্যে ফসকে যায়। তারপর ১৯৫৭ সালে ভারতীর হকির শ্রেষ্ঠ খেলা বাইটন কাপ জয় করে। ১৯৬০ সালে লীগ জয় ও ১৯৫১ সালে লীগে যুগ্মবিজয়ী হয়। ১৯৫২ সালে পুনরায় বাইটন বিজয়ী, ১৯৫৩ সালে বাইটন রানার্স ও লীগ বিজয়ী আখ্যা লাভ করে। ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালে লক্ষ্মীবিলাস কাপও পায়।

নিম্নে যে সেকল হকি খেলোয়াড় ইষ্টবেঙ্গলে খেলে সুনাম করে গেছে সেই সকল খ্যাতিমান খেলোয়াড়দের নাম দিলাম। খেলেছে বহু খেলোয়াড়, সকলের নাম মনেও নাই, তাছাড়া অখ্যাত খেলোয়াড়দের নাম লিখা শুধু বাহুল্য মাত্র। সেইজন্য আশা করি পাঠকবর্গ ক্ষমা করবেন।

গোলে—ইয়াসিন খান, বোস্তান খাঁ, এন. ঘোষ, রহমান, এস. বসু, এস. দেব, সমিম, ডবলিউ স্কট, মেণ্ডিজ, দেশমুখ, ডোগরা বি. কপুর।

ব্যাকে—সত্তার, সইদ, এস. মজুমদার, জিয়াউল হোসেন, নীরদ কর, রঙ্গনাথন, এইচ. দে, প্রমোদ দাশ গুপ্ত, টি. দে,

বি. ব্যানার্জি, এস. মল্লিক, বালকিষেন, স্বরূপ সিং, গুরুবক্স সিং, বড়রিগস, পি. চতুর্ব্বেদী, দলজিৎ সিং।

হাফে—সামসুদ্দিন, সফি, রফি, ইয়াহিয়া, পরেশ দাশগুপ্ত, জে, মহলানবীশ, সুশীল চক্রবর্ত্তী, এন, গুহ, আলেক্সি. টবি বোস. শিশির ঘোষ. এস. লডিড. এস. বসু. কনওয়েল, উন্নিকৃষ্ণান. বেকার হোল্ডার, ভগবান সিং, আমেদ, বি, চক্রবর্ত্তী, ইন্দ্রজিৎসিং, কুশল কুমার

ফরোয়ার্ডে—ওসমান, জাফর, মহম্মদ সুলতান, মহম্মদ তকী, জব্বর, আবদুল সাকুর, রসিদ (ছোট), রাখাল ঘোষ, বাহাদুর, এস. এ. খান, জি. রসুল. ব্যাস, হীরালাল, এন. মিশ্র. এন. সেন, দিলীপ বসু, অনিল দত্ত, বি, নাগ, সাজাহান, সুনীল ঘোষ, ভাটীয়া, চুনীলাল দীনদয়াল, শঙ্কর ঘোষ, এন, মণ্ডল, অচ্যুত রাও, রবি দাশ; বালু, জগদীশ. সুরেন্দ্রসিং, শেঠি, বি, দফাকার, বেনিয়ান, জে, ভট্টাচার্য, সরপাল, যশপাল, বলবীর সিং, বল দেও সিং, এ. অধিকারী, ভাস্করন, গুরু·দর্শনসিং, বি, আর, সিং, কামার আলী, যোগীন্দার সিং, সয়িদ, আফজল, বীরসিং, ইনামুর রহমান, আনিসুর রহমান, জার্নাইল সিং,

———

## ক্রিকেট সেকশন

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্রিকেট সেকসন খোলা হয় গোড়ার দিক থেকেই, কিন্তু এমন কোন বৈশিষ্টের ছাপ নেই। তবে কয়েকজন বিখ্যাত খেলোয়াড় ক্রমশঃ এই ক্লাবের পক্ষে খেলেছিলেন, নিম্নে তাঁদের নাম দিলাম।

শৈলেশ বসু, হেমাঙ্গ বসু, মণি দাস, মণি তালুকদার, সুধীর সেন, অমিয় দাশ গুপ্ত, এস. সি. ঘোষ, এস. বোস, ডি. বোস, কে. এল. রায়, তরুণ রায়, কে. ডি. ব্যানার্জ্জী, পরেশ দাশ গুপ্ত. জে. বোস (নয়া), নীরদ কর, অজয় বোস, জিতেন গল, জে. রায়, এস. মিত্র, জে. দাশ গুপ্ত, শিশির ঘোষ, যুধিষ্ঠির পাল প্রভৃতি।

## এথলেটিক স্পোর্টস

১৯৪৫ সাল থেকে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব স্পোর্টস আরম্ভ হয় এবং খুবই সাফল্যের সঙ্গে সামাধা করে। তারপর প্রত্যেক বৎসরেই উক্ত স্পোর্টস এই ক্লাবে হয়ে থাকে। ক্রমশঃ এর খুব সুনাম হয়। তা'ছাড়া ক্লাবের স্পোর্টস টীম প্রত্যেক বৎসরই অন্যান্য ক্লাবের স্পোর্টস গেমেও যোগদান করে এবং অনেক ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ানশিপও দখল করে।

১৯১৫ সালে ক্লাবের স্পোর্টস-এ সভাপতিত্ব করেন কলকাতার মেয়র আনন্দীলাল পোদ্দার। স্বনামখ্যাতা দেশনেত্রী শ্রীযুক্তা নেলী সেন গুপ্তা পুরস্কার বিতরণ করেন।

১৯৪৬ সালে উক্ত স্পোর্টস-এ সভাপতিত্ব করেন বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের চেয়ারম্যান শ্রীযুত জে. এন. মিত্র।

১৯৪৭ সালে উক্ত স্পোর্টস-এ সভাপতিত্ব করেন মাননীয় জাষ্টিস শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ মহাশয় (বর্ত্তমানে ইনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য)

১৯৪৮ সালে উক্ত স্পোর্টস-এ সভাপতিত্ব করেন বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়।

১৯৪৯ সালে উক্ত স্পোর্টস-এ সভাপতিত্ব করেন বাংলার তৎকালীন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভূপতি মোহন মজুমদার।

১৯৫০ সালে উক্ত স্পোর্টস-এ সভাপতিত্ব করেন কলিকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

১৯৫১ সালে উক্ত স্পোর্টস-এ সভাপতিত্ব করেন ফোর্ট উইলিয়ামের সর্ব্বাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সিংহ রায়।

১৯৫২ সালে উক্ত স্পোর্টস-এ সভাপতিত্ব করেন দেশনেতা ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

## *ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড়দের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়*

এই ক্লাবে বহু খেলোয়াড় আজ পর্য্যন্ত খেলেছে। সকলের নামের তালিকা প্রস্তুত করা কোনমতেই সম্ভব নয়, কারণ অনেক অখ্যাত খেলোয়াড়ও খেলেছে তাদের নাম আর কতদিন তালিকাভুক্ত থাকতে পারে? সেইজন্য যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছে তাঁদের নামই এই তালিকায় প্রকাশিত হলো।

**গোলরক্ষক**—নগেন কালী, মণি তালুকদার, পূর্ণ দাশ, পদ্ম ব্যানার্জি, ডি. সেন, কে, দত্ত, অমিতাভ মুখার্জি, নীহার মিত্র, প্রভাত মুস্তফী (নন্দ), সত্যেন মুখার্জি (ফেল্টী), মণিলাল ঘটক, ডাঃ শৈলেন দাশ গুপ্ত, সনৎ শেঠ. অবনী বসু. রবীন গুহ, কমল সরকার।

**ব্যাক**—ভোলা সেন, ভানু দত্ত রায়, প্রফুল্ল চ্যাটার্জী, দীনেশ গুহ, সন্তোষ গাঙ্গুলী, রাজেন ঘোষ, জে. সরকার (জিতা-পাগলা), পরেশ মজুমদার, শৈলেন চক্রবর্ত্তী, সেলিম পেশোয়ারী, রসিদ ( গদা ), প্রমোদ দাশ গুপ্ত, রাখাল মজুমদার,

মোজাম্মেল হক, বসন্ত বাক্‌চী, পরিতোষ চক্রবর্ত্তী, নরেশ বসু, ব্যোমকেশ বসু. তাজ মোহাম্মদ. আনসারী, ডোরাই লিঙ্গম, ডাঃ পি. কুমার, এম. রেড্ডি, এস. মল্লিক, ভব রায়, চিত্ত চন্দ, শুভাশীষ গুহ, অরুণ ঘোষ. বিক্রমজিৎ দেবনাথ, সুশীল সিংহ, চন্দন ব্যানার্জি. অমিয় ব্যানার্জি।

হাফব্যাক—(রাইট)—প্রফুল্ল মিত্র, হারান সাহা, কে. নাসিম, অজিত নন্দী, নগেন রায়, এস, তালুকদার, জগা চন্দ, গোকুল, কেম্পিয়া, হাসান, নারায়ণ সান্যাল, শ্রীকান্ত ব্যানার্জি।

সেণ্টার—ননী গোঁসাই, নূর মহম্মদ, শৈলেন দাশ গুপ্ত (কালো-মাণিক), বীরেন সেন, মহীউদ্দীন, এন. গুহ ( বেবী ), আমিন, অরোকরাজ, কাইসার, চন্দন সিং, আলাগিরাস্বামী, বীর বাহাদুর, বি. রায়।

(লেফ্‌ট)—সুরেন ঠাকুর, বিজয়হরি সেন, মণি দাস, কমল গাঙ্গুলী, জলিল, উষা রায়, হবিবুল্লা বাহার, অনিল বসু, বাদল মহলানবীশ, সুশীল চক্রবর্ত্তী, মুথরাজ, সুবোধ মিত্র, রূপা ভট্টাচার্য্য, রামু সেন, গিয়াসুদ্দিন, এস. তালুকদার, মহাবীর, কাশী মিত্র, খগেন সেন, এস. রায় (পণ্টু), অমল দত্ত, অমল গুপ্ত, নারায়ণ, অসীম মুখার্জি, রাম বাহাদুর, তপন চৌধুরী, চায়না পাল।

ফরোয়ার্ড (রাঃ আঃ)—নসা সেন, দেবেন পাল, মোনা মল্লিক, দুলাল, করিম, সাজাহান, আলী হোসেন, কৃষ্ণ রাও, ফটিক সিংহ, এস. গড়গড়ি, টীটুকর ভেঙ্কটেশ, বালসুব্রহ্মণ্যম্‌, বালু, সমাজপতি।

(রাঃ ইন্)—কালু ঘোষ, সুধীর মিত্র, সূর্য্য চক্রবর্ত্তী, লক্ষ্মীনারায়ণ, সুহাস চ্যাটার্জি. আর. দে, এ. ব্যানার্জি (বিরলা), আপ্পারাও. নারায়ণ, সুনীল নন্দী, বিসু চ্যাটার্জি।

(সেঃ ফঃ)—ধীরা মিত্র, মোনা দত্ত, রমিজ, এইচ. সেন. বিহারীলাল. বি. সোম, গৌর বসাক রামানা, মুর্গেশ, ডি. ব্যানার্জি, সোমানা,

বিশ্বেশ্বর রাও, পাগস্‌লী, স্বরাজ ঘোষ, ধনরাজ, তাপস বসু কানন, নীলেশ সরকার, অসীম মৌলিক,।

(লেঃ ইন্)—প্রশান্ত বর্দ্ধন, হেমাঙ্গ বসু, যতীন সরকার, রবি বসু, সুধাংশু মিত্র, মজিদ, জ্ঞানবর্দ্ধন, আখতার হোসেন, পরেশ মুখার্জি, পাখী সেন, নিধু মজুমদার, সুনীল ঘোষ, টবি বোস, এস. তালুকদার (ছোট) আমেদ, কিট্টু, বলরাম, রামাড়ু।

(লেঃ আঃ)—নেপাল চক্রবর্ত্তী, হীরা দাস, রঞ্জিৎ নারায়ণ (রুণু), কে. প্রসাদ, খালেক, নায়ার, আবু গাঙ্গুলী, সুশীল চ্যাটার্জি. সন্তোষ দত্ত, সালে, ফক্‌রী, সুধীর রায়, মুসা, কানকী দাস, সন্তোষ চ্যাটার্জী, রামান্না।

## *ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়*

**নগেন কালী**—ইনি একজন প্রথম শ্রেণীয় গোলরক্ষক ছিলেন। প্রথমে ঢাকায় খেলে নাম করেন, তারপর কলকাতায় এসে মোহনবাগান ক্লাবে খেলতে থাকেন। ১৯২০ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব স্থাপিত হলে ইনি ইষ্টবেঙ্গল টীমে যোগদান করেন এবং ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত খেলেন। ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রামনিবাসী এবং কলিকাতার বিখ্যাত হোমিও প্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। বর্ত্তমানে ইনি সায়ান্স কলেজে চাকুরী করিতেছেন।

**মণি তালুকদার**—ইনি প্রথমে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে গোলরক্ষক নগেন কালীর সহযোগী গোলরক্ষক হিসাবে খেলতে থাকেন; তারপর নিজের কৃতিত্বে প্রভুত যশ অর্জ্জন করেন। ইনি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে একাদিক্রমে ১৭ বৎসর খেলেছেন। তারপর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৮ সালে দেহত্যাগ করেন। ইনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট

প্রেসে চাকুরী করতেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার লোহজং নামক স্থানের বাসিন্দা ছিলেন।

**পূর্ণ দাস**—ইনি একজন প্রথম শ্রেনীর অতি বিখ্যাত গোলরক্ষক ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান কলিকাতায়। প্রথমে ইনি এরিয়ান ক্লাবে খেলতেন। বিখ্যাত ক্রীড়া-শিক্ষক দুঃখীরাম মজুমদার মহাশয়ের ইনি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১৯২৫ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে এসে যোগদান করেন এবং ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত খেলেন। পরবর্ত্তী কালে ইনি ইষ্টবেঙ্গল টীমের খেলোয়াড় বলেই লোকের কাছে পরিচয় দিতেন। খেলার সিজনে প্রত্যহ ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে আসতেন, খেলা দেখতেন ও খোলোয়াড়দের উৎসাহ দিতেন। ১৯৫২ সালে ইনি পরলোক গমন করেছেন।

**পদ্ম ব্যানার্জি**—ইনিও একজন প্রথম শ্রেণীর গোল রক্ষকছিলেন। প্রথমে ইনি হাওড়া হউনিয়ান টীমে খেলতেন। তারপর ১৯৩৬ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে যোগদান করেন এবং ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত খেলেন। ১৯৩৮ সালে ইনি মোহনবাগান ক্লাবে যোগদান করেন, কিন্তু নিয়মিত খেলেন নাই। তারপর খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন। ইনি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে দু'বৎসর মাত্র খেলেছেন বটে, কিন্তু এখনও ইনি ইষ্টবেঙ্গল টীমের বিশেষ অনুরক্ত। স্বভাবচরিত্রে পদ্ম বাবু একজন অতি অমায়িক ও মিষ্টভাষী আদর্শ খেলোয়াড় এবং সকলের প্রিয় ব্যক্তি। ইনি হুগলী জেলার বৈদ্যবাটী নিবাসী।

**কে. দত্ত (হারাধন)**—ইনি অনেকের মতে বাঙ্গালী গোল-রক্ষক মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাঁর কতকগুলি দোষও ছিল। খেলায় তিনি অনেক সময় একগুঁয়েমী করে খেলা নষ্ট করেছেন এবং বদনামের ভাগী হয়েছেন। তবে যেদিন তিনি খেলায় দৃঢ়চিত্ত হয়ে খেলেছেন সেদিন তাঁকে গোল দেওয়া অসাধ্য ছিল। তাঁর খেলা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এই মন্তব্যে একমত হবেন। ইনি ইষ্টবেঙ্গল টিমে খেলেছেন ১৯৩৮, ১৯৪১, ১৯৪৪, ৪৫ এই চারি

বৎসর মাত্র। তার আগে ও পরে ভবানীপুর, মোহনবাগান, রাজস্থান প্রভৃতি টিমেই খেলেছেন। ইনি বিখ্যাত খেলোয়াড় ও সেণ্টার ফরোয়ার্ড মোনা দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার বাজাপ্তিগ্রাম এদের বাসস্থান ছিল।

**ডি. সেন** (ধনদারঞ্জন সেন)—ইনিও একজন প্রথম শ্রেণীর গোলরক্ষক। ইনি প্রথমে কুমারটুলী টিমে খেলতেন। ১৯৩৯ সালে ইষ্টবেঙ্গল টিমে এসে যোগদান করেন ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত খেলে তারপর ১৯৪১ সালে মোহনবাগান টিমে যোগদান করেন। আবার ১৯৪৩ সালে ইষ্টবেঙ্গলে ফিরে আসেন এবং ইষ্টবেঙ্গলের প্রথম আই. এফ. এ. শীল্ড-জয়ে অংশ গ্রহণ করেন। তারপর পুনরায় মোহনবাগানে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে মোহনবাগান টিমের হয়ে আই. এফ. এ শীল্ডে পুনরায় নাম খোদাই করেন। এঁর পিতা শোভাবাজার-কুমারটুলী অঞ্চলে একজন খ্যাতনামা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন। এঁদের আদিবাস ফরিদপুর জেলায়।

**অমিতাভ মুখার্জি**—ইনি খুব উচ্চ শ্রেণীর গোলরক্ষক ছিলেন বলা যায় না, কিন্তু ভাগ্যবান ছিলেন একথা নিঃসন্দেহ। ১৯৪২ সালে ইনি ইষ্টবেঙ্গলে যোগদান করেন, তার পূর্ব্বে কালীঘাট টিমে খেলতেন। ১৯৪২ সালে ইষ্টবেঙ্গল প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়। তারপর ১৯৪৫ সালে ইনি আই. এফ. এ. শীল্ড জয়ের অংশ গ্রহণ করেছেন। ইনি ১৯৪২ সালে ক্লাবে ঢুকেছিলেন আর ক্লাব পরিত্যাগ করেন নি। পূর্ব্ববঙ্গে এঁদের আদিবাস।

**নীহার মিত্র**—ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন গোলরক্ষক বলাচলে প্রথমে মোহনবাগান টীমে খেলেছেন। ১৯৪২ সালে ইনি ইষ্টবেঙ্গল টিমে যোগ দেন এবং লীগের প্রথমার্দ্ধে ইনি নিয়মিত খেলেছিলেন, তারপর আর ক্লাব পরিবর্ত্তন করেন নি। ইনি ঢাকা জেলার লোক। বিখ্যাত হাফ ব্যাক ডাঃ সুবোধ মিত্র এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

**প্রভাত মুস্তফী** (নন্দ)—ইনি বালক কালে বয়েজ ইষ্টবেঙ্গল টিমে খেলতেন। ১৯৪৬ সালে ইষ্টবেঙ্গল টিমে এসে যোগদান করেন। তিন বৎসর টিমে খেলেছেন। একমাত্র ১৯৪৬ সালের লীগ-বিজয় ছাড়া আর কিছু উল্লেখযোগ্য এঁর খেলার জীবনে নাই। ইনি কলিকাতার লোক।

**সত্যেণ মুখার্জি** ( ফ্যান্সী )—ইনি ১৯৪৮ সালে গোলরক্ষক হিসাবে ইষ্টবেঙ্গল টীমে এসে যোগদান করেন। খেলোয়াড় হিসাবে মন্দ খেলেন নি। উল্লেখযোগ্য খেলা ১৯৪৮ সালের অলিম্পিক চীনা টীমের বিপক্ষে খেলে জয় লাভ এবং ১৯৪৯ সালে রোভার্স কাপ জয় ইত্যাদি। ১৯৫০ সালে ইনি মোহনবাগান টীমে যোগদান করেন।

**মণিলাল ঘটক**—ইনি একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান গোলরক্ষক ১৯৪৯ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে যোগ দেন। এর মধ্যে ,৯৫৬-৫৭ সালে রাজস্থান টীমে খেলে পুনরায় এই ক্লাবেই এসে অবসর গ্রহণ করেছেন। ইনি জলপাইগুড়ি টাউনের বিখ্যাত উকীল দুর্গাপ্রসন্ন ঘটকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। স্বভাব-চরিত্র খুবই ভাল, অবিবাহিত জীবন যাপন করেছেন। বর্ত্তমানে ব্যবসায় করেন। এঁর খেলার পরিচয় খেলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভাল রকম লেখা আছে।

## ব্যাক

**ভোলা সেন** (সুবোধচন্দ্র সেন)—ইনি একজন উচ্চশ্রেণীর ব্যাক খেলোয়াড় ছিলেন। প্রথমে ইনি ঢাকায় খেলতেন। কলিকাতা এসেই তিনি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগ দেন। ১৯২০ থেকে আরম্ভ করে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি ইষ্টবেঙ্গলে খেলেছেন। পরবর্ত্তীকালে ইনি ক্লাবের উন্নতির জন্য নানা কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর কর্ম্মপ্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। ১৯৩৮ সালে ইনি পরলোকগমন করেন। ঢাকা জেলার অধিবাসী ছিলেন। ল'-গ্রাজুয়েট হয়েও ইনি খেলাধুলায় মত্ত হয়ে ল'-প্র্যাক্‌টিশ করেন নি।

**ভানু দত্ত রায়** (মনীভূষণ দত্ত রায়)—ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার গচিহাটা গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। ইনি একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যাক খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁর খেলায় খুবই সৌন্দর্য্য ছিল। প্রথমে ইনি কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় খেলেছেন; পরে ভোলা সেনের আহ্বানে কলকাতায় এসে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগদান করেন। তিনি ইষ্টবেঙ্গল টীমের ২য় অধিনায়ক। ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত ইনি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন ১৯৫১ সালে ইনি পরলোকগমন করেন।

**প্রফুল্ল চ্যাটার্জি**—ইনি একজন প্রমথ শ্রেণীর ব্যাক খেলোয়াড় ছিলেন বটে তবে ভোলা সেন ও ভানু দত্ত রায়ের পরে তাঁর স্থান। প্রফুল্ল বাবুর লম্বা কিক ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও উপভোগ্য। তাঁর চেহারাটি ছিল খুবই সুন্দর আর দেহটি ছিল সুস্থ ও বলদৃপ্ত। প্রফুল্লবাবু সামনে পড়লে বিপক্ষ ফরোয়ার্ড ভয়ে তাঁর কাছে এগুতো না, অথচ তিনি কাহাকেও মারধোর করে খেলেন নি। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত ইনি ইষ্টবেঙ্গল টীমেই খেলেছেন, তারপর অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে পরলোক গমন করেছেন। ফরিদপুর জেলায় এ'র জন্মস্থান।

**দীনেশ গুহ**—দীনেশ বাবু অতি উচ্চাঙ্গের খেলোয়াড় ছিলেন। প্রথমে ইনি ঢাকা ওয়াড়ী টীমে খেলতেন। ১৯২৫ সালে কলকাতা এসেই ইনি ইষ্টবেঙ্গল টীমে যোগদান করেন এবং ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত খেলেন। তারপর ঢাকায় চাকুরী নিয়ে চলে যান। মাঝে মাঝে আই. এফ. এ. শীল্ডে ঢাকা ফার্ম টীমের হয়ে খেলতে এসেছেন। বর্ত্তমানে ইনি কলকাতার বাসিন্দা। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত আই. এফ. এ.র বাছাই করা ভারতীয় টীমে ইনি নির্ব্বাচিত হয়ে খেলেছেন। তখন বাছাই ভারতীয় টীমে গোষ্ঠ পাল ও দীনেশ গুহ জোড়া-ব্যাকের খেলায় অতুলনীয় চমৎকারিত্ব ছিল। দীনেশ বাবুর জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলায় যুন নামক গ্রামে।

**রাজেন ঘোষ**—ইনিও একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যাক খেলোয়াড় ছিলেন। ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া টাউন তাঁর জন্মস্থান। উক্ত ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতেই উনি ফুটবল খেলতেন—ঢাকা উয়াড়ী টীম যখন আই. এফ. এ. শীল্ডে খেলতে আসতো তখন ব্যাক খেলোয়াড় হিসাবে রাজেন ঘোষ উয়াড়ী টীমের হয়ে কলকাতায় খেলতে আসতেন। তারপর ১৯২৮ সালে ইনি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলতে আসেন। পরে ইনি স্পোর্টিং ইউনিয়ন টীমে যোগদান করেন কয়েক বৎসর উক্ত টিমে খেলবার পর টাউন ক্লাবে যোগদান করেন। এক বৎসর ইনি মোহনবাগানেও খেলেছেন তখন তাঁর খেলার শেষ অবস্থা।

**প্রমোদ দাশগুপ্ত**—ইনি একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যাক খেলোয়াড় ছিলেন। প্রথমে ভবানীপুর টীমে খেলেছেন তারপর ১৯৩৬ সালে ইষ্ট বেঙ্গল টীমে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত খুবই যশের সঙ্গে খেলেছেন তারপর আর নিয়মিত খেলেন নাই। প্রমোদ বাবু দেখতে খর্ব্বাকৃতি ছিলেন বটে, কিন্তু খেলার সময় তাঁর অনবদ্য ক্রীড়া-নৈপুণ্যে দর্শকগণ মুগ্ধ হয়ে যেতো। ইষ্ট বেঙ্গল টীম ভারতের সমস্ত বড় ট্রফি জয় করেছে বটে, কিন্তু প্রমোদ বাবুর দুর্ভাগ্য, এত ভাল খেলা দেখিয়েও একমাত্র লীগ ছাড়া আর কোন বড় ট্রফিতে নাম খোদাই করতে পারে নি। এতে তাঁর সমর্থকবৃন্দের মনে দুঃখ রয়ে গেছে। প্রমোদ বাবু এখনও ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গেই যুক্ত আছেন। ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার লেসিয়াড়া গ্রামে তাঁর জন্ম স্থান।

**রাখাল মজুমদার**—ইনিও একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যাক খেলোয়াড়। ইনি পূর্ব্বে ঢাকায় খেলতেন। ১৯৩৭ সালে কলকাতা এসেই তিনি ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবে যোগদান করেন। তখন ইষ্টবেঙ্গল টীমে প্রমোদ-রাখাল ব্যাকজুটীর খুবই নাম ছিল। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এঁদের বিবরণ যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। রাখাল লীগ ও শীল্ডে ২ বার নাম খোদাই করেছে। ইষ্ট বেঙ্গলের প্রথম শীল্ড জয় ( ১৯৪৩ সাল ) রাখাল মজুমদারের অধিনায়কত্বেই হয়েছিল। রাখাল একাদিক্রমে

ইষ্ট বেঙ্গল টীমে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত খেলেছে। রাখাল মজুমদারের স্মরণীয় খেলা সম্ভবতঃ ১৯৩৭ সালে ঢাকা একাদশের হয়ে ইসলিংটন কোরিন্থিয়ান টীমের বিপক্ষে খেলা। উক্ত খেলায় কোরিন্থিয়ান টীম ঢাকা একাদশের নিকট ১—০ গোলে পরাজিত হয়েছিল। কোরিন্থিয়ান দল ভারতে এই একটিমাত্র পরাজয় বরণ করে নিয়েছিল এবং রাখাল মজুমদারের খেলার ভূয়সী প্রশংসাও তারা করে গিয়েছিল। ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমার গাচিহাটা গ্রাম তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান। সুবিখ্যাত চিত্রকর হেমেন্দ্র মজুমদার তাঁর পিতৃব্য। বিখ্যাত ব্যাক ভানু দত্ত রায়ও তাঁর নিকট আত্মীয় ছিলেন। রাখাল বাবু বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্রেডমার্ক অফিসেয় একজন বড় অফিসার।

**পরিতোষ চক্রবর্ত্তী**—পরিতোষ চক্রবর্ত্তী-কে ভারতীয় ব্যাক খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা চলে। ১৯২০ সাল থেকে অদ্যাবধি বহু খেলোয়াড় ভারতীয় সাইডে ব্যাক পজিসনে খেলেছেন; তাঁদের মধ্যে জুম্মা খাঁ ও পরিতোষ চক্রবর্ত্তী সকলের উপরে স্থান পাবে একথা নিঃসন্দেহ। নিরপেক্ষ ভাবে বিশ্লেষণ করে যাঁরা বিচারে আসবেন তাঁদের এ নির্বাচন মানতেই হবে। পরিতোষ চক্রবর্ত্তীর খেলা যাঁরা দেখেছেন এবং তাঁর আগে-পরেও যাঁদের খেলা দেখছেন তাঁরা এ বিচার করতে পারেন। ১৯৪২ সাল থেকে পরিতোষ বাবু ইষ্টবেঙ্গল টীমে খেলতে থাকেন এবং তাঁর খেলার জীবনে যশ-মান এই ক্লাব থেকেই হয়েছে। তাঁর খেলার বিবরণ এই ইতিহাসের পাতায় দেওয়া হয়েছে। এক কথায় তাঁর অনবদ্য ক্রীড়া নৈপুণ্য যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কোন দিনই তাঁকে ভুলতে পারবেন না। ইনি কলকাতার অধিবাসী। প্রথমে এরিয়ান ক্লাব থেকে খেলা সুরু করেন। ইনি বর্ত্তমানে ক্যালকাটা কাস্টমস-এর একজন পদস্থ কর্ম্মচারী।

**মোজাম্মেল হক**—ইনি জলপাইগুড়ি টাউনের অধিবাসী; সুদর্শন হাল্কা ধরনের চেহারা। প্রথমে জলপাইগুড়ী টাউনে খেলেছেন,

কলকাতায় একমাত্র ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবেই খেলে গেছেন। ইনিও প্রথম শ্রেণীর ব্যাক খেলোয়াড় ছিলেন।

**ব্যোমকেশ বসু**—১৯৪৮ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগদান করেন, তার পুর্বে তিনি এরিয়ান টীমে খেলেছেন। ব্যোমকেশ বসু ভারতীয় ব্যাক সাইডে অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। ইনি ইষ্টবেঙ্গল টীমে থেকে প্রভূত যশ ও মান অর্জ্জন করেছেন। তাঁর অধিনায়কতায় ইষ্টবেঙ্গল টীম ১৯৫১ সালে আই. এফ. এ. শীল্ড ও ডুরাণ্ড কাপ জয় করেছিল। ১৯৪৮ থেকে প্রায় দশ বৎসর এই টীমে তিনি খেলেছেন। তারপর খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। ইনি খুলনা জেলার অধিবাসী—বর্ত্তমানে বার্ড কোং জুট মিলে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

**তাজ মোহাম্মদ**—তাজ মোহাম্মদ ১৯২৯ সালে মাত্র এক বৎসর ইষ্টবেঙ্গল টীমে খেলেছেন। তাঁর খেলার বিবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে। ইনি পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটা নিবাসী ছিলেন।

**ডাঃ পি. কুমার**—ডাঃ প্রকাশানন্দ কুমার বর্ধমান জেলার লোক। ইনিও একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যাক খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯২২ সালে ইনি ইষ্টবেঙ্গল টীমে যোগদান করেন। অদ্যাবধি এই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

## হাফব্যাক

**প্রফুল্ল মিত্র**—ইনি ১৯২১ সাল থেকে কয়েক বৎসর ইষ্টবেঙ্গল টীমে রাইট হাফ পজিসনে খেলেছেন—সুদর্শন, শক্তিমান চেহারা ছিল। খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। পরবর্ত্তী কালে ইনি ঢাকায় ওকালতী ব্যবসায় করেছেন। ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগনার ব্রাহ্মণ গাঁ ইঁহার জন্মস্থান।

**ননী গোঁসাই**—ইনি প্রথমে তাজহাট টীমে সেণ্টার হাফ পজিসনে খেলতেন, তারপর ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল

টীমে খেলেছেন। তাঁর সমকালীন তাঁর তুল্য সেণ্টার হাফ ভারতীয় সাইডে আর কেহই ছিল না। এত সুন্দর কার্য্যকরী খেলা আজকাল আর চোখে পড়ে না। ননী গোঁসাইর হেড একটা দেখবার মতন বস্তু ছিল—তা ছাড়া তাঁর মতন চরিত্রবান খেলোয়াড়, এমন অমায়িক ব্যবহার খুব কম খেলোয়াড়ের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁর খেলার বিবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। ইনি ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার মীর্জাপুর গ্রামনিবাসী ছিলেন। ১৯৫১ সালের ১১শে জানুয়ারী কলিকাতায় পরলোক গমন করেছেন।

**সুরেন ঠাকুর**—এঁর প্রকৃত নাম সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি দেখতে খর্ব্বাকৃতি ছিলেন কিন্তু তাঁর খেলা দেখে লোকে মুগ্ধ হতো। ইনি মোহনবাগান টীমেই খেলতেন। ১৯২১ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে এসে যোগদান করেন। লেফট হাফ ব্যাক পজিসনে ইনি খেলতেন। ৩।৪ বৎসর খেলার পর ইনি খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

**হারান সাহা**—ইনি রাইট হাফ ব্যাক পজিসনে এরিয়ান টীমে খেলতেন। ১৯২৫ সালে ইষ্টবেঙ্গলে এসে যোগদান করেন। খেলায় তাঁর খুবই সুনাম ছিল। ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত খেলে ই. আই. রেলে চাকুরী পেয়ে টীম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন, কিন্তু ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করেন নাই। পরবর্ত্তীকালে ইষ্টবেঙ্গল টীমের কর্ম্ম-পরিষদে যোগদান করেন। ১৯৪০-৪১ সালে ইনি ফুটবল সেকসনের সেক্রেটারী হয়েছিলেন। বিখ্যাত খেলোয়াড় আপ্পারাওকে ইষ্ট বেঙ্গল টীমে নিয়ে আসার ব্যাপারে হারান বাবু যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন।

**মণি দাস**—ইনি প্রথমে মোহনবাগান টীমে খেলতেন এবং একজন উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের লেফট হাফব্যাক খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯২৫ সাল থেকে ইষ্টবেঙ্গল টীমে খেলেন। ১৯২৮ সালে ইনি টীমের অধিনায়ক ছিলেন। সেই বৎসর টীম সর্ব্ব নিম্নস্থান পেয়ে ২য় বিভাগে অবতরণ করে। তারপর মণি দাস খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ক্রিকেট

খেলায় মণি দাস ছিলেন একজন উচ্চদরের খেলোয়াড়। তিনি হাওড়া টাউনের অধিবাসী।

**কমল গাঙ্গুলী**—ইনি একজন প্রথম শ্রেণীর হাফব্যাক খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত ইষ্ট বেঙ্গল টীমে খেলেছেন। ১৯৩৪ সালে ইনি টীমের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। সে বৎসর অধিকাংশ খেলায় তিনি লেফট ব্যাক পজিসনেও খেলেছেন। ১৯৩৫ সালে তিনি নিয়মিত খেলেন নি। তারপর ১৯৩৬-৩৭ খুবই ভাল খেলেছিলেন। ঢাকা জেলায় তাঁর আদি বাসস্থান।

**ডাঃ সুবোধ মিত্র**—ইনিও একজন প্রথম শ্রেণীর হাফব্যাক খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৩৬ সালে ইনি ইষ্টবেঙ্গল টীমে খেলেন। প্রয়োজনমত ইনি সেণ্টার হাফেও খেলতে পারতেন। ১৯৩৭ সালে ঢাকায় কোরিন্থিয়ান টীমের সঙ্গে যে টীম (ঢাকা একাদশ) খেলায় ১—০ গোলে জয়লাভ করেছিল ডাঃ মিত্র তাঁর অধিনায়ক ছিলেন। তাঁর নিবাস ছিল ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগনার ব্রাহ্মণগাঁও। বর্ত্তমানে ইনি কাঁচরাপাড়া টি. বি. হাসপাতালে চাকরীতে নিযুক্ত।

**অজিত নন্দী**—১৯৩৬ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে যোগদান করে পাওয়ার লীগ বা জুনিয়ার গেমে ফরোয়ার্ড পজিসনে খেলতেন। ১৯৩৭ সালে মোহামেডান স্পোর্টিং টীমের বিপক্ষে পাওয়ার লীগ খেলায় প্রথম রাইট হাফ পজিসনে খেলেন। তারপর প্রথম ডিভিসন লীগ খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের দ্বিতীয় গেমে প্রথম তিনি রাইট হাফ পজিসনে খেলতে নামেন। যে ঐতিহাসিক গেমে মোহামেডান ৪—২ গোলে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে পরাজয় স্বীকার করে সেই খেলায় অজিত নন্দী অভূতপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখান। তারপর থেকে রাইট হাফ পজিসনেই তিনি বরাবর খেলেছেন এবং এরকম চিত্তাকর্ষক খেলা এতাবৎকাল কোন রাইট হাফের খেলোয়াড়ের মধ্যেই দেখা যায়নি। ১৯৪২ সালে তিনি ইষ্টবেঙ্গল পরিত্যাগ করে ভবানীপুর চলে যান। আবার পরের বৎসর ১৯৪৩ সালে পুনঃ

প্রত্যাবর্ত্তন করেন আর সেই বৎসরই ইষ্টবেঙ্গল টীম প্রথম আই. এফ. এ. শীল্ড জয় করে। উক্ত শীল্ডের খেলায় অজিত নন্দী অংশ গ্রহণ করেন এবং আই.এফ.এ. শীল্ডে তাঁর নাম খোদাই হয়। তারপর তিনি খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। রাণাঘাট এদের পৈত্রিক বাসস্থান, কিন্তু চট্টগ্রামেই ছেলেবেলা কাটিয়েছেন। এঁরা চার ভাই সকলেই খ্যাতনামা খেলোয়াড়—অজিত, অনিল, নিখিল ও সুনীল।

**বীরেন সেন**—ননী গোঁসাই, নূর মহম্মদ, অকিল আমেদ, এই তিনজনের পরেই সেণ্টার হাফ পজিসনে বীরেন সেনের নাম আসে। বাঙ্গালী সেণ্টার হাফের মধ্যে ননী গোঁসাইর পরেই বীরেন সেন। ১৯৩৭-৩৮ পর্য্যন্ত ইনি ইষ্টবেঙ্গল টীমে খেলেছেন, তারপর ই. বি. রেলওয়েতে চাকুরী পেয়ে খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপূর্ব্বে কয়েক বৎসর তিনি স্পোর্টিং ইউনিয়নে খেলেছেন। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় টীম অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণে গিয়েছিল সেই টীমে বীরেন সেন সেণ্টার হাফ নির্ব্বাচিত হয়ে খেলতে যান। এবং খুবই সুনাম অর্জ্জন করে এসেছেন। তা'ছাড়া ইষ্টবেঙ্গল টীমে খেলার সময়ই তাঁর খেলার চরম উৎকর্ষতা দেখা গিয়েছিল। ফরিদপুর জেলায় আদি বাসস্থান।

**চন্দন সিং**—ননী গোঁসাই, বড় নূর মহম্মদ, অকিল আমেদ, বীরেন সেন এঁদের পরেই ভারতীয় সেণ্টার হাফ হিসাবে চন্দন সিং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, একথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখেছি। চন্দন সিং নেপালের অধিবাসী। প্রথমে গুর্খা রাইফেল টীমে খেলেছে। তারপর ১৯৫১ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে যোগদান করে। ১৯৫২ পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল টীমেই ছিল। সেই সময় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবও বিশেষ লাভবান হয়েছিল। চন্দন সিংয়ের খেলার উৎকর্ষতাও সেই সময়ই বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল। তারপর রাজস্থান ক্লাবে গিয়েও ভালই খেলেছিল। সর্ব্বশেষ একবছর মোহনবাগান টীমেও খেলেছে, কিন্তু তখন তার খেলার শেষ অবস্থা; সুতরাং সে সময় আর কোনও ভাল ছাপ রাখতে পারেনি।

**লেঃ এ, আর, গোকুল**—ইনি বাঙ্গালোর নিবাসী খেলোয়াড়। প্রথমে ইনি ভারতীয় সার্ভিসেস টীমের খেলোয়াড় ছিলেন। ফরোয়ার্ড ও হাফব্যাক দুই পজিসনেই খেলতে পারতেন। ১৯৫০ সালে ইষ্ট-বেঙ্গল টীমে যোগদান করেন। তারপর ইনি এই টীমে রাইট হাফ ব্যাক পজিসনেই খেলেছেন। ইনি একজন উচ্চাঙ্গের খেলোয়াড়, লেখাপড়ায়ও ইনি একজন উচ্চ শিক্ষিত। স্বভাবচরিত্রে চেহারায় ইনি একজন সুদর্শন ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক। ১৯৫৫ সালে ইনি টীমের অধিনায়ক ছিলেন। যতদিন ইনি খেলেছেন ততদিন খুব যশের সঙ্গেই খেলেছেন।

**অমল দত্ত**—ইনি ১৯৫৩ সালে ইষ্টবেঙ্গলে যোগ দেন। তার পূর্ব্বে এরিয়ানে খেলতেন। ইনি লেফট হাফব্যাক খেলোয়াড়। প্রয়োজন হলে সেণ্টার হাফেও খেলতে পারতেন। খেলোয়াড় হিসাবে ইনি একজন উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের হাফব্যাক খেলোয়াড়। ইনি খুব বেশী দিন খেলার জীবন যাপন করেন নাই। বর্ত্তমানে ইনি একজন ক্রীড়া শিক্ষক।

**হাসান**—পশ্চিম পাকিস্তাননিবাসী এই খেলোয়াড়টি ১৯৫৬ সাল থেকে ইষ্টবেঙ্গল টীমে খেলেছেন। রাইট হাফ পজিসনে ভাল খেলাই দেখিয়ে গেছেন। খেলার সৌন্দর্য্য যাই থাক না থাক খুব কার্যকরী খেলোয়াড় ছিলেন একথা অনস্বীকার্য্য। তা'ছাড়া খেলার সময় খুবই মনোযোগ ও যত্ন দিয়ে খেলেছেন—কোন সময়ই অবহেলা করেন নাই। ১৯৫৬ সালে কালিকটে গোল্ড কাপ ও ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতায় জয়লাভে হাসান যথাসাধ্য খেলেছে এবং তার পুরস্কারও পেয়েছে। তা'ছাড়া ১৯৫৮ সালের আই. এফ. এ. শীল্ড জয়ও তার কৃতিত্বের নিদর্শন। হাসান যতদিন খেলেছে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে খেলেছে এইজন্য তাকে প্রশংসা করতে সকলেই বাধ্য। তা'ছাড়া হাসান সত্যই একজন প্রথম শ্রেণীর হাফব্যাক খেলোয়াড় ছিলেন।

**বীরবাহাদুর**—ইনিও উক্ত গুর্খা রাইফেলস টীমের রাইট হাফে খেলতেন। **১৯৫৭** সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে যোগ দিয়ে সেণ্টার হাফ পজিসনে খেলেন এবং বেশ ভালই খেলেন। আক্রমণ ভাগ ও রক্ষণ ভাগ দুদিকেই তার দৃষ্টি থাকতো এবং দুদিকেরই তাল সামলাতেন অতীব নিপুণভাবে। পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, খুবই আন্তরিক দরদী খেলোয়াড় ছিলেন। **১৯৫৮** সালেব শীল্ড বিজয়ে ইনি অধিনায়কত্ব করেছিলেন। তারপরের বৎসর নিয়মিত অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

**রাম বাহাদুর**—ইনিও গুর্খা বাইফেলস টীমের খেলোয়াড ছিলেন। ১৯৫৭ সালে ইষ্টবেঙ্গলে যোগদান করে এতাবৎকাল খেলে আসছেন। এব সমকক্ষ ঘেলোয়াড বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় নাই। অতীব সুদর্শন, ভদ্র এবং শান্ত প্রকৃতি, স্বল্পভাষী। এব গুণেব কথা সর্ব্বজন বিদিত।

## ফরোয়ার্ড

**নসাসেন** ( ডাঃ রমেশচন্দ্র সেন )—ইনি তৎকালে একজন শ্রেষ্ঠ রাইট আউটসাইড ও ইনসাইড ফবোয়ার্ড ছিলেন। ঢাকা উয়াড়ী টীমের অতি নির্ভবযোগ্য খেলোয়াড ছিলেন। কলকাতায় এসে ২য় বিভাগে জোড়াবাগান টীমের হয়ে খেলেছেন। ১৯২০ সালে কলকাতায় আই. এফ. এ. লীগের বাছাই কবা ইউরোপীয়ান ও ইণ্ডিয়ান টীম নিয়ে খেলার প্রবর্ত্তন হয়। সেই প্রথম বাছাই করা টীমে নসা বাবু রাইট ইন পর্যায়ে খেলেছিলেন। প্রথম বাছাই করা ভারতীয় টীম ১৯২০ সাল। টীম ছিল এইরূপ :—
গোলে—প্রফুল্ল দাশ গুপ্ত ( মোহনবাগান ), ব্যাক—গোষ্ঠ পাল (মোহনবাগান), তুলসী দত্ত ( কুমারটুলী ), বীরেন গাঙ্গুলী (তাজহাট), অভিলাষ ঘোষ (মোহনবাগান) অধিনায়ক, মণি দাস (মোহনবাগান ), বি. চ্যাটার্জি ( এরিয়ান ), নসা সেন ( জোড়াবাগান ), ধীরা মিত্র ( তাজহাট ), ইউ. কুমার (মোহনবাগান), সামাদ ( তাজহাট )।

তারপর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব স্থাপনা হলে তিনিই প্রথম অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হন। স্বভাবে-চরিত্রে, খেলায়-স্বাস্থ্যে চেহারায় সবদিক দিয়েই তাঁকে অধিনায়ক বলে মানান হতো। বর্ত্তমানে তিনি লণ্ডনে আছেন। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের আশা আছে যদি তিনি ভগবৎ কৃপায় জীবিত থাকেন তবে আগামী ১৯৭০ সালে ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে সস্ত্রীক যোগদান করেন।

**মোনা মল্লিক** ( মাখনলাল মৌলিক )—১৯১৪ সাল থেকে ১৯২৮ পর্য্যন্ত ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় রাইট আউট ছিলেন—সমস্ত প্রতি-নিধিত্বমূলক খেলাতেই ইনি নির্ব্বাচিত হয়ে খেলেছেন। ১৯২৩ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগদান করেন, তাবপর খেলা থেকে অবসব গ্রহণ করেও কয়েক বৎসব ক্লাবেব ফুটবল সেকসনের পরিচালনা করেছেন। ইনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেসের একজন পদস্থ অফিসার। ফরিদপুব জেলার মাদাবীপুব সাবডিভিসনেব মশুরা গ্রামে জন্মস্থান।

**দুলাল গুহঠাকুরতা** (নবেন্দ্র গুহ ঠাকুবতা)—১৯২৭ সালে ইনি ইষ্টবেঙ্গল টীমে খেলতে আসেন। তদবধি ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত রাইট আউট পজিসনে খেলেছেন। উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ব খেলোযাড় বলে পরিচিত ছিলেন। অনেক প্রতিনিধিত্বমূলক খেলাতে ইনি অংশ গ্রহণ কবেছেন। বর্ত্তমানে ইনি ইনকাম-ট্যাক্স অফিসেব একজন পদস্থ অফিসার। বরিশাল বানবীপাড়াব গুহ-ঠাকুবতা বংশ।

**করিম**—১৯৩৬ সালে লক্ষ্মীনাবায়ণ বাঙ্গালোর থেকে করিমকে নিয়ে অসেন। তখন এর বয়স মাত্র ১৬।১৭ বৎসর। তখন থেকেই লক্ষ্মীনারায়ণের পাশে থেকে তাঁরই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে খেলায় সুনাম করে গেছে। ইষ্টবেঙ্গলে থাকা কালীন রাইট আউটে খেলেছে। ১৯৪০ সালে মোহামেডান স্পোটিং টীমে যোগদান করে রাইট ইন পজিসনে খেলে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করে। সেই সময় তার খেলা খুবই কার্য্যকরী হয়েছিল এবং সেই বৎসর

মোহামেডান আই. এফ. এ. লীগ, রোভার্স কাপ, ডুরাণ্ড কাপ প্রভৃতি জয় করে। তারপর করিম আর কলকাতায় খেলতে আসেনি। করিমের চেহারা ছিল খর্ব্বাকৃতি হৃষ্টপুষ্ট ধরনের।

**টীটুকর**—ইনি একজন প্রথম শ্রেণীর রাইট আউট খেলোয়াড় ছিলেন। প্রথমে মোহনবাগানে খেলেছেন। ১৯৪৫ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে যোগদান করেন। সেই বৎসর টীম লীগ ও শীল্ড, কোচ-বিহার কাপ ইত্যাদি জয় করে। টীটু কর আপ্পারাওয়ের পাশে খেলে সুনামই করেছে ২।৩ বছর খেলার পর খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এর বংশাবলীর সকলেই ঢাকা বিক্রম-পুরের অধিবাষী।

**ভেঙ্কটেশ** (পদ্মোত্তম ভেঙ্কটেশ্)—এর কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিশেষভাবেই লিখিত আছে। ভারতের সর্ব্বকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাইট আউট খেলোয়াড়। বর্ত্তমানে কলকাতাতেই বসবাস করছেন।

**বালসুব্রহ্মণ্যম** ইনি বাঙ্গালোর-নিবাসী খেলোয়াড়। সেখান কার কুলীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ছেলে। প্রথমে বাঙ্গালোর খেলা শিক্ষা করে মাদ্রাজ উইমকোতে চাকরী নিয়ে উক্ত উইমকো টীমেই খেলেছেন। তারপর কলকাতায় এসে প্রথমে ইষ্টবেঙ্গল টীমেই খেলেছেন এবং বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছেন। পরে টীম বদল করে রাজস্থান টীমেও খেলেগেছেন। বছর পাঁচেক কলকাতায় খেলার পর দেশে চলে গেছেন আর আসেন নি।

**সূর্য্য চক্রবর্ত্তী**—ইনি ঢাকা বিক্রমপুর কাইচল গ্রাম নিবাসী কুমিল্লার উকিল ললিত মোহন চক্রবর্ত্তীর ২য় পুত্র। ছেলেবেলায় কুমিল্লায় কাটিয়েছেন বেশীদিন, তারপর শান্তিনিকেতনে পড়তে আসেন। সেখানে স্কুল টীমে ফুটবল খেলার সময় কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথ তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেন এবং বলেন যে কালে তুই খেলায় ভাল নাম করবি। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের

আশীর্ব্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের মধ্যে সূর্য্য চক্রবর্ত্তীর মত এমন চৌকস খেলোয়াড় দেখা যায়নি। যাঁরা তাঁর খেলা দেখেছেন তাঁরা এখনও সূর্য্যবাবুর কথা ভুলতে পারেননি। বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের মধ্যে এরকম ধুরন্ধর খেলোয়াড় এর আগে একমাত্র শিবদাস ভাদুড়ীর নাম করা যায়। পরবর্ত্তীকালে তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়, একথা অত্যুক্তি নয়। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত বাছাই করা ভারতীয় টীমে তিনি স্থান পেয়ে এসেছেন। ২১ বার অসুস্থতার জন্য খেলতে পারেন নি কিন্তু নির্ব্বাচিত হয়েছেন। সূর্য্যবাবুর খেলার সময়কার অনেক চিত্তাকর্ষক গল্প আছে স্থানাভাব বশতঃ দেওয়া গেল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতবড় একজন ধুরন্ধর খেলোয়াড় হয়েও তিনি কোন বড় ট্রফি জয় করতে পারেন নি। এর প্রধান কারণ দলগত শক্তির অভাব এবং খালি পায়ে খেলা। এই দুটিতে মিলিয়েই তাদের ট্রফি জয়ের অন্তরায় হয়েছে। সূর্য্যবাবু কিছুটা খর্ব্বাকৃতি ও কৃশ ধরনের চেহারা, কিন্তু স্বাস্থ্য প্রায়শ ভালই। এখন বৃদ্ধ হয়েছেন কিন্তু সেই আগেকার মতই প্রায় দেখতে। বহুদিন ইনি ই. আই. আর. লোকো-শেড (লিলুয়া) চাকুরী করেছেন। বর্ত্তমানে রিটায়ার করে কোন্নগর নবগ্রাম কলোনীতে বাড়ী করে বাস করছেন। খেলা দেখার নেশা এখনও পরিত্যাগ করতে পারেন নি। ইনি প্রথমে এরিয়ান ক্লাবে যোগদান করে দুঃখী রাম বাবুর শিক্ষায় খেলায় উন্নতি করেন। তারপর ১৯২৫ সাল থেকে ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবে যোগ দেন। এখনও ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গেই যুক্ত আছেন।

**লক্ষ্মীনারায়ণ**—১৯৩৫ সালে লক্ষ্মীনারায়ণ বাঙ্গালোর থেকে এসে ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবে যোগ দেন। সূর্য্যবাবুর পর রাইট ইন পজিসনে লক্ষ্মীনারায়ণ ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনেক লেখা হয়েছে। ইনি একজন আদর্শ খেলোয়াড় এবং ক্রীড়াশিক্ষক। ১৯৩৭

সালে বাঙ্গালোর মুসলিম টীমের পক্ষে খেলে রোভার্স কাপ জয় করেন এবং উক্ত খেলায় জয়সূচক গোলটিও লক্ষ্মীনারায়ণ দেন।

**আপ্পারাও**—আপ্পারাও ১৯৪১ সালে কালীঘাট টীম থেকে এসে ইষ্ট বেঙ্গলে যোগ দেন। রাইট ইন পজিসনে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে এমন যশস্বী খেলোয়াড় আর একজনও নাই। বিশেষতঃ তাঁর নয়নাভিরাম মনোমুগ্ধকর খেলা যারা দেখেছেন তারা কোনদিনই ভুলতে পারবেন না। আপ্পারাওয়ের খেলা লিখে বুঝান অসাধ্য। বর্ত্তমানে দুইটী খেলেয়াড়ের মধ্যে আপ্পারাও-এর খেলাব কিছুটা ছাপ আছে যথা—বলরাম ও ইউসুফ খাঁ (হায়দরাবাদ)। আপ্পারাও কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার সময় অশ্রুজল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তাঁর দেশে তাঁকে কয়জন চেনে? আর এখানে অগণিত সমর্থক তার জন্য আক্ষেপ করছে এইজন্যে যে তার খেলা আর দেখতে পাওয়া যাবে না। শুধু কি কলকাতা? দিল্লী, বোম্বাই মাদ্রাজ ভারতের বড় বড় সহর সব জায়গাতেই আপ্পারাও খেলতে গিয়েছে। সুদুর ইউরোপেও খেলতে গিয়েছে। যেখানেই খেলেছে সেখানেই লোকের প্রশংসা পেয়েছে। তাই বলছি এরকম যশস্বী খেলোয়াড় ভারতীয়দের মধ্যে দেখা যায় না। আপ্পারাও অবসর নেবার সময় ক্লাবকর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক যথাসম্ভব সম্বর্দ্ধনা ও পুরস্কার লাভ করে গেছেন। পাঁচবার আই. এফ. এ. শীল্ড জয়, আটবার শীল্ড ফাইনালে অংশ গ্রহণ ও তিনবার লীগ বিজয়। তাছাড়া ডুরাণ্ড কাপ, রোভার্স কাপ বিজয় ইত্যাদি সব মিলিয়ে তাঁর ভাগ্যে যেরূপ পুরস্কার মিলেছে ভারতীয় আর কোন খেলোয়াড়ের ভাগ্যে সেরূপ মিলে নাই। সমগ্র পৃথিবীর ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে এরকম রেকর্ড মাত্র দুজনের আছে।

**ধীরা মিত্র**—ইনি একজন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরোয়ার্ড। তিনি তাজহাট টীমে খেলতেন। ইষ্ট বেঙ্গল টীম স্থাপিত হওয়ার সময় তিনি ইষ্ট বেঙ্গলে এসে যোগদান করেন। বছর দুই খেলার পর রিটায়ার করেন। ইনি ঢাকা জেলার শাকতা গ্রামের লোক।

**মোনা দত্ত**—ইনিও ১৯২২ সাল থেকে ১৯৩২ পর্য্যন্ত ভারতীয় শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরোয়ার্ড ছিলেন। প্রথমে ১৯২২ সালে ইষ্ট বেঙ্গল টীমে এসে যোগদান করেন, তারপর ৪ বৎসর খেলার পর মোহনবাগানে যোগ দেন, পুনরায় ১৯২৮ সালে ইষ্টবেঙ্গলে আসেন; কিন্তু সেই বৎসর টীম নিম্নাবতরণ করায় টীম পরিবর্ত্তন করেন এবং ই. বি. রেলদলে যোগ দেন। অবশ্য তখন তার ই. বি. রেলে চাকুরী হয়েছিল। তারপর মাঝে মাঝে মোহনবাগান টীমেও খেলেছেন। প্রথম জীবনে ইনি গোলরক্ষক হিসাবে খেলেছেন। বর্ত্তমানে তাঁর পুত্র ইষ্টবেঙ্গল টীমে জুনিয়ার গোলরক্ষক। সুবিখ্যাত গোলরক্ষক কে. দত্ত (হারাধন) তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমায় জন্ম ও বাসস্থান ছিল। মোনা দত্তের চেহারা ও স্টাইল ছিল প্রকৃত সেণ্টার ফরোয়ার্ডের উপযোগী—তাছাড়া তাঁর হেড ওয়ার্ক ছিল খুবই সুন্দর।

**রমিজ**—এর প্রকৃত নাম হাজী রমিজুদ্দিন আমেদ। ত্রিপুরা জেলার লোক। খুব অল্প বয়সেই খেলাধূলায় নাম করেন। কুমিল্লা ও ঢাকায় পড়াশুনা করেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটীর গ্রাজুয়েট। খুব ভাল দৌড়বীর ছিলেন। ১৯২৭ সালে অল বেঙ্গল স্পোর্টসে, ১৯২৯ সালে ত্রিপুরা জেলা স্পোর্টসে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। তারপর ফুটবল, হকি ও ক্রিকেট খেলায় যোগদান করেন। ঢাকার ভিক্টোরিয়া ও উয়াবী টীমেও খেলেছেন। ১৯৩১ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে যোগদান করেন। সূর্য চক্রবর্ত্তী একে কলকাতায় নিয়ে আসেন। ইষ্টবেঙ্গলে সেণ্টার ফরোয়ার্ডরূপে খেলেন। তখন তার বয়স মাত্র ২০ বৎসর। খেলায় তার সুনাম হয়েছিল বটে কিন্তু বেশী দিন খেলেন নি। পায়ে আঘাত পেয়ে ক্রমশঃ খেলা থেকে অবসর নেন।

**মুর্গেশ**—১৯৩৬ সালে লক্ষ্মীনারায়ণ মুর্গেশকে বাঙ্গালোর থেকে নিয়ে আসে। ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল টিমে খেলেছে। মাঝে গুরুতর আহত হয়ে খেলতে পারেনি, তারপরেও দু-একবার কলকাতায়

খেলতে এসেছে মহীশূর টীমের সঙ্গে। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরোয়ার্ড হাফিজ রসিদের পরেই মুর্গেশের স্থান। মুর্গেশ লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না, কিন্তু ফুটবল খেলায় অবিস্মরণীয় নাম রেখে গেছে। যাঁরা তার খেলা দেখেছে তাঁরা কোনোদিনই মুর্গেশকে ভুলতে পারবেন না। অল্প বয়সেই মুর্গেশ পরলোক গমন করেছে। ১৯৩৭ সালে বাঙ্গালোর মুসলিম টীমের পক্ষে খেলে বোম্বাই রোভার্স কাপ জয় করে। ইহাই তার জীবনে খেলায় বড় পুরস্কার লাভ।

**সোমানা**—সোমানার জীবন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে।

**প্রশান্ত বৰ্দ্ধন**—ইনি প্রথমে ঢাকা ওয়াড়ী টীমে খেলতেন। লেফট ইন, লেফট আউট ও সেণ্টার ফরোয়ার্ড এই তিন পজিসনেই ইনি খেলতে পারতেন। তবে সাধারণতঃ লেফট ইন পজিসনেই উনি খেলতেন। ত্রিপুরা জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার গৌতমপাড়া গ্রামের বিশিষ্ট বৰ্দ্ধন পরিবারে এঁর জন্ম। ত্রিপুরা জেলায় এই বৰ্দ্ধন পরিবার বিশেষ বিখ্যাত। এই পরিবারে অনেক জ্ঞানীগুণী অর্থবান লোক জন্মেছে। প্রশান্ত বাবুর খেলার যেমন বৈশিষ্ট ছিল আচার ব্যবহার চালচলনেও তেমনি বৈশিষ্ট ছিল। তাঁর চেহারাটি যেমন কার্ত্তিকের মত ছিল তেমনি সাজ পোষাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। তিনি ফুটবল খেলতে যখন মাঠে নামতেন তখন গলার কাছে নেকটাইয়ের আকারে একটি সুদৃশ্য রুমাল বেঁধে নামতেন। খেলোয়াড় হিসাবেও তিনি ছিলেন তৎকালের একজন উচ্চাঙ্গের খেলোয়াড়। ৯৪১৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**মজিদ**—ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেফট ইন সাইড খেলোয়াড়। বিহার প্রদেশের দানাপুর এঁর জন্মস্থান। ই, আই, রেল কোং (লক্ষ্ণৌ) লোকো ডিপার্টমেণ্টে ইনি চাকুরী করতেন। ১৯৩১ সালে

ইষ্টবেঙ্গল টীমে এসে যোগদান করেন। ১৯৩৭ পর্য্যন্ত নিয়মিত খেলেছেন। তারপর ১৯৩৮ সালে মোহামেডান টীমে যোগদান করেন কিন্তু নিয়মিত খেলেননি তারপর খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন। ১৯৪৪ সালে ইষ্টবেঙ্গল হিরোজ টিমে এসে খেলেছিলেন। ইষ্টবেঙ্গল হিরোজ টিম ইষ্টবেঙ্গল টিমের বয়স্ক প্রাক্তন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত টিম। তারপর আর খেলতে আসেন নি। বেঁচে থাকলে ১৯৭০ সালে ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে যোগদান করবেন বলে আশা আছে। মজিদের খেলার কথা এই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যথেষ্ট লেখা হয়েছে।

**জ্ঞানবর্দ্ধন**—এঁর ডাক নাম ভোলাবর্দ্ধন। ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার গৌতমপাড়া গ্রামের বর্দ্ধন পরিবারে এঁর জন্ম। কুমিল্লাতেই ইনি লেখাপড়া শিখেছেন খেলাধুলাও করেছেন ধনী পিতার সন্তান বলে ছেলেবেলা থেকেই খুব ষ্টাইলে চলতেন। খেলাতেও বেশ নাম ছিল ১৯৩৫ সালে ইষ্টবেঙ্গল টিমে খেলতে আসেন কিন্তু তখন লেফট ইনে মজিদ খেলতেন বলে ইনি নিয়মিত খেলতে পাননি। যেদিন খেলেছেন সেদিন বেশ ভালই খেলেছেন। ইনি বিখ্যাত খেলোয়াড় প্রশান্ত বর্দ্ধনের সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র।

**পরেশ মুখার্জি**—১৯৩৬ সালে ইনি ইষ্টবেঙ্গল টিমে যোগদান করেন। তার পূর্ব্বে স্পোর্টিং ইউনিয়নে খেলতেন। ইনসাইড খেলায় তাঁর সুনাম ছিল। একটু রোগা পাৎলা ধরণের চেহারা ছিল কিন্তু খেলা ভালই খেলতেন। ১৯৩৭ সালে তাঁর খেলার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৭ সালে ইসলিংটন কোরিন্থিয়ানের বিপক্ষে ঢাকা একাদশের পক্ষে ইনি খুব ভাল খেলেছিলেন। উক্ত খেলায় জয়ের নিদর্শন একমাত্র গোলটি অবশ্য পাখী সেন করেছিলেন কিন্তু উক্ত গোলের সুযোগ করে দিয়েছিলেন পরেশ মুখার্জি। এই খেলাটিই বোধ হয় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ খেলা।

**পাখী সেন** ( ভুপেন সেন )—ইনি মাত্র একবৎসর (১৯৩৭) ইষ্টবেঙ্গল টীমে খেলেছিলেন কিন্তু তাতেই তাঁর নাম লোকের মুখে

মুখে ছিল। ১৯৩৮ সালে ই. বি. আর. এ চাকুরী পেয়ে দল পরিত্যাগ করেন। তাঁর খেলার মধ্যে সৌন্দর্য্যের ছাপ ছিল, কার্য্যকরীও ছিল। ইনি ফরিদপুর জেলার লোক কিন্তু ঢাকাতেই শিক্ষাদীক্ষা সবই হয়েছিল। ১৯৩৮ সাল থেকে কলকাতাতেই বসবাস হয়েছে। ১৯৩৭ সালে ঢাকা একাদশের পক্ষে খেলে ইসলিংটন কোরিন্থীয়ানকে পরাজিত করেন। দলের একমাত্র গোলটি ইনিই করেছিলেন।

**নিধু মজুমদার**—ইনি বরিশাল জেলার লোক। কলকাতায় এসে ১৯৩৫ সাল থেকে ইষ্টবেঙ্গল টীমে যোগদান করেন। প্রায়শঃ সেণ্টার ফরোয়ার্ড রূপেই খেলেছেন ১৯৩৮ সালে লক্ষ্মী-নারায়ণের নির্দ্দেশে লেফট ইন সাইডে খেলতে অভ্যাস করেন এবং বিশেষ ফল দেখান। সেই বৎসরই ই, বি, আর চাকুরী দিয়ে তাঁকে দলভুক্ত করেন তারপর প্রায় ৭।৮ বৎসর নিয়মিত ফুটবল খেলে পরে অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তীকালে গোল করার দক্ষতা তাঁর যথেষ্ট জন্মেছিল। এক বৎসর তিনি আই, এফ, লীগে শ্রেষ্ঠ গোলদাতার সম্মান অর্জ্জন করেন (১৯৩৯)।

**সুনীল ঘোষ**—প্রথমে ক্যালকাটা জিমখানা নামক ৩য় ডিভিসন টীমে খেলতেন ১৯৪০ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে খেলতে আরম্ভ করেন। ইনি প্রথমে রাইটইন পজিসনে খেলতেন লক্ষ্মীনারায়ন একে লেফট ইন খেলাতে অভ্যস্থ করলেন। তারপর লক্ষ্মী-নারায়নের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পরবর্ত্তীকালে একজন অতি উচ্চ দরের লেফট ইন সাইড ফরোয়ার্ড রূপে যথেষ্ট নাম যশ অর্জ্জন করেছেন। ১৯৪১ সালে আপ্পারাও রাইট ইন, সোমানা সেণ্টার ফরোয়ার্ড ও সুশীল ঘোষ লেফট ইন এই ত্রয়ীর খেলা অতি চমৎকার হতে লাগলো। পরবর্ত্তী ১৯৪২ থেকে ৪৬ সাল পর্য্যন্ত খুবই চমৎকার কার্য্যকরী খেলা দেখিয়েছেন। তারপর ১৯৪৭-৪৮ সাল পর্য্যন্ত খেলেছেন বটে তখন খেলার একটু পড়তি অবস্থা। ১৯৪৯ সাল

থেকে ইনি একেবারেই খেলা ছেড়ে দিলেন। ১৯৪৪ সালে সুনীল ঘোষ ইষ্টবেঙ্গল ফুটবল টীমের অধিনায়ক ছিলেন। ইনি হকি খেলাতেও সমান দক্ষতার সঙ্গে খেলেছেন। ক্রিকেট খেলাতেও সুনাম ছিল। ঢাকা বিক্রমপুর রাউতভোগ গ্রামে এঁদের পৈত্রিক বাস। এঁর পিতা রাইমোহন ঘোষ মহাশয় কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবেরও একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। কিছুদিন ক্লাবের কর্ম্মপরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুনীলের ছোট ভাই শিশির ঘোষও ইষ্টবেঙ্গল টীমে জুনিয়ার গেম খেলে বেশ নাম করেছেন। হকি খেলায় ও ক্রিকেট খেলায় তার দক্ষতা ছিল আরও বেশী।

**আমেদ খাঁ**—ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেফট ইন সাইড ফরোয়ার্ড ১৯৪৯ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে যোগদান করে ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত খেলেছেন। তাঁর খেলার কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যথেষ্ট লেখা হয়েছে। আমেদ খাঁ খেলোয়াড় হিসাবে প্রভূত যশ অর্জন করেছে, যথেষ্ট দাপটের সঙ্গে খেলেছে, তার দ্বারা ক্লাব খুবই লাভবান হয়েছে একথা ঠিক কিন্তু আমেদ খাঁ চারিত্রিক দিক দিয়ে প্রশংসনীয় নয় যেহেতু তিনি অত্যন্ত দাম্ভিক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি যে একজন বড় খেলোয়াড় এই মনোভাবটা তাঁর সর্বসময়েই খেয়ালের মধ্যে থাকতো। তাঁর আচারে ব্যবহারে এই দাম্ভিকতা সুপরিস্ফুট ছিল। শেষ সময়ে তিনি ১৯৫১ সালে মোহামেডান স্পোর্টিং টীমে যোগদান করেন, যদিও তখন তার খেলা আর নাই বললেও চলে। তবু মোহামেডানে গিয়ে ২।৩টি গেম খেলে তারপর রীতিমত অবসর গ্রহণ করেন।

**কিট্টু**—(এন কৃষ্ণস্বামী) ইনিও লেফট ইন সাইডের খেলোয়াড়। মাদ্রাজ প্রদেশের লোক। প্রথমে মাদ্রাজের উইমকো টীমে খেলতেন। ১৯৫৩ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে এসে যোগদান করেন। খেলা তার বেশ ভালই ছিল, সুনামের সঙ্গেই খেলে গেছেন মধ্যে এক বৎসর রাজস্থান

টিমেও খেলেছেন। তারপর ১৯৫৬ সাল থেকে অবসর গ্রহণ করে স্বদেশে চলে গেছেন।

**বলরাম**—বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যকরী লেফট ইন সাইড ফরোয়ার্ড। বলরামের পরে হায়দ্রাবাদের জুলফিকারের নাম করা যায়। অনেকে চুনী গোস্বামীকে এর সমকক্ষ বা এরচেয়ে বড় খেলোয়াড় বলে মত প্রকাশ করেন কিন্তু আমি বলি যে ওটা অতিরিক্ত ভালবাসার ফল। আমি যাকে ভালবাসি তার চেয়ে জগতে আর বড় কিছু নেই, এ হলো সেই ধরণের কথা। নিরপেক্ষ বিচারে আমার মতকে স্বীকার করতেই হবে। যাক্ এ তর্কের কথা নয় বিচার বিশ্লেষণের কথা। বলরাম ১৯৫৭ সালে ইষ্টবেঙ্গল টিমে যোগদান করে। হায়দ্রাবাদে এর বাসস্থান। বলরাম প্রথম এসেই নাম করতে পারেনি ক্রমশঃ তাব সুনাম হয়েছে। তার খেলার ধরণ ও গোল করার কৃতিত্ব অসাধারণ। লেফট ইন সাইডে এরকম গোলদাতা খেলোয়াড় এতাবৎকাল দেখা যায়নি। তার চেহারাও প্রকৃত খেলোয়াড়োচিত এবং স্বভাব চরিত্র অতি সুন্দর। খুব ধীর নম্র অমায়িক এবং স্বল্পভাষী। ১৯৫৩ সালে বলরাম বি. এন, আর. এ চাকুরী পেয়ে টিম পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছে। আরও ১৯৫১—৫২ সালে বাইরে খেলতে গিয়ে পায়ে আঘাত পেয়ে খেলার সেই চমৎকারিত্ব কিছুটা ব্যাহত হয়েছে তবু এখনও বলরামের খেলার কার্য্যকরী শক্তি যথেষ্ট আছে।

**নেপাল চক্রবর্ত্তী**—ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রথম লেফট আউট ফুটবল খেলোয়াড়। ইনি প্রথম কুমার টুলী টিমে খেলতেন। ১৯১৯ সালে কুমার টুলী টিমে ২য় ডিভিসন লীগে প্রথম হয়েছিল কিন্তু আইনে বাধাপেয়ে প্রমোশন পায়নি। ১৯২০ সালে কুমারটুলী আই. এফ. এ শীল্ড ফাইনাল পর্য্যন্ত খেলেছিল। উক্ত টিমে নেপাল বাবুর কার্য্যকরী শক্তি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তাছাড়া ইষ্টবেঙ্গল টিমে যোগদান করেও নেপাল

বাবু ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত খেলেছেন এবং যথাসাধ্য সুনাম রক্ষার চেষ্টাই করেছেন। ইনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর লেফট আউট খেলোয়াড় ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। বর্ত্তমানে ইনি জামশেদ পুরের অধিবাসী।

**হীরাদাস**—ইনি ও একজন খ্যাতিমান লেফট আউট খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৩১ সালে ইষ্টবেঙ্গল টিমে যোগদান করেন। ১৯৩৩ সালে কালীঘাট টিমেও খেলেছিলেন। তারপর পুনরায় ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ সা[illegible] পর্য্যন্ত নিয়মিতই খেলেছেন ১৯৩৭ সাল থেকে ইনি অবসর গ্রহণ করেণ। ১৯৪৬ সালে হীরাদাস পরলোক গমন করেছেন।

**রঞ্জিত নারায়ন বা রুনু**—ইনি ১৯৩৪ সালে ইষ্টবেঙ্গল টিমে খেলেছেন রাইট আউট লেফট আউট দুই পজিসনেই খেলতে পারতেন। এঁর নিবাস কোচবিহার। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ কুমার শচীন দেব বর্ম্মণ এঁর মাতুল। ইনি পরে হাওড়া ইউনিয়ন টিমে খেলেছেন। ইনি জীবনে একটি খেলায় খুবই যশঅর্জ্জন করেছিলেন যথা ১৯৩৬ সালে হাওড়া ইউনিয়ান বনাম ইষ্ট ইয়র্ক শায়ার রেজিমেণ্ট টিমের খেলায় (আই. এফ, এ. শীল্ডের ৪র্থ রাউণ্ডে)। এই খেলাটি ডালহৌসী গ্রাউণ্ডে হয়েছিল। কর্দ্দমাক্ত মাঠে উক্ত খেলায় ১৯৩৫ সালের শীল্ড বিজয়ী ইষ্ট ইয়র্ক সেদিন হাওড়া ইউনিয়নের নিকট ৩—১ গোলে পরাজিত হয়। বিখ্যাত গোলকীপার পটার সাহেব ২ বার বল ধরতে গিয়ে কাদায় পা পিছলে পড়ে যায়। উক্ত ২ বারই রুনু ২টা গোল করে। পরবর্ত্তী খেলায় হাওড়া ইউনিয়ান মোহামেডানের কাছে ৫—০ গোলে (সেমিফাইনালে) হেরে যায়। অবশ্য হাওড়া ইউনিয়ন টীমে ও তখন নেহাৎ বাজে টীম ছিল বলা যায়না। তবে সেমিফাইনালে দুর্ধর্ষ মোহামেডানের কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়।

**কে. প্রসাদ**—১৯৩৬ সালে এই খেলোয়াড়টি ইষ্টবেঙ্গল টীমে যোগদান করে দুই বৎসর টীমে থাকারপর ১৯৩৮ সালে এরিয়ান টীমে চলে যায়। এর পূর্ব্বে হাওড়া ইউনিয়ান টীমে খেলতো। খর্বাকৃতি চেহারা ছিল বটে কিন্তু তার দৌড় ছিল খুব সাংঘাতিক। তা' ছাড়া ড্রিবলিং সেণ্টার করা নিখুঁত পাশ করা কর্ণারকিক তার পর গোল দেওয়া সব গুণই তার মধ্যে ছিল। একে ভারতীয় প্রথম শ্রেণীর লেফট আউট পর্য্যায়ে ধরা যায়। ১৯৩৯ সালে বি, এফ, এ. কর্তৃক অনুষ্ঠিত ব্রাবোর্ণ কাপে ইষ্টবেঙ্গল টীমের হয়ে খেলেছিল। বি. জি. প্রেসে চাকুরী করার দরুণ উক্ত বি. জি. প্রেস অফিস টীমেও খেলেছে। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় ফুটবল টীমের অষ্ট্রেলিয়া সফরে নির্ব্বাচিত হয়ে খেলে এসেছে এবং সুনাম অর্জ্জন করেছে।

**আবু গাঙ্গুলী**—এই খেলোয়াড়টি ১৯৪০-৪১ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে লেফট আউট পজিসনে খেলেছে। মোটামুটি মন্দ খেলে নাই, কাজ চলা গোছের খেলে গেছে।

**সুশীল চাটার্জী**—১৯৪২ সালের লীগের মাঝামাঝি সময়ে এসে ইষ্টবেঙ্গল টীমে যোগদান করে। তার পূর্ব্বে কালীঘাট টীমে খেলতো। সুশীল চাটার্জি একজন তৎকালীন প্রথম শ্রেণীর লেফট আউট খেলোয়াড় হিসেবে গণ্য করা যায়। ১৯৪২-৪৫ পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল টীমে খেলেছেন তারপর খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন। ১৯৪২ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ান, শীল্ড ফাইনালিষ্ট' ১৯৪৩ সালের লীগ বিজয় ইত্যাদিতে সুশীল চাটার্জি অংশ গ্রহণ করেছেন। খেলার ধরণ ভালই ছিল, প্রশংসনীয়।

**সালে**—উক্ত সালের পুরানাম পুথান পরামভিল বাবাখান আব্দুল রজ্জাক সালে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ( বর্ত্তমান কেরলে ) এর জন্ম ও বাসস্থান। ১৯৪৪ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে ত্রিবেন্দ্রামে ( ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ) অলইণ্ডিয়া ফুটবল টুর্নামেণ্ট খেলতে

গিয়েছিল সেই সময় একে সংগ্রহ করে নিয়ে আসা হয়। তখন একেবারে বালক ছিল ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের খেলোয়াড়ে পরিণত হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ সালে পর্য্যন্ত যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। উক্ত সময় ইষ্টবেঙ্গল টীমের রাইট আউট ভেঙ্কটেশ, লেফট আউট সালে এই খেলোয়াড়ের খ্যাতি সারা ভারত জুড়ে ছিল। এরকম দুটি আউট সাইড জুড়ী এতাবৎকাল কোন টীমেই দেখা যায়নি। এদের দর্শনীয় মনোমুগ্ধ কর খেলা এবং গোল করার কায়দা একটা দেখবার মত ছিল। বিপক্ষ টীমের ত্রাস সালে ভেঙ্কটেশ কয়েকটি বছর খুবই কৃতিত্ব ও দাপটের সঙ্গে খেলেছে। ১৯৫০ সালে, সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমের অধিনায়ক ছিলেন সেই বৎসর টীম অপরাজিত লীগ ও শীল্ড জয় করেছে। দিল্লীতে ডি. সি. এম. ট্রফি পেয়েছে। ডুরাণ্ড কাপের সেমিফাইনালে হায়দরাবাদ পুলিশ টীমের নিকট ১—০ গোলে পরাস্ত হয়ে ফিরে এসেছে। সুতরাং সালের অধিনায়কত্বে যশ অর্জ্জণ কম হয়নি। ১৯৫৪ সালে কাষ্টমস অফিসে চাকুরী পেয়ে টীম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অবশ্য তার পূর্ব্বেই বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি, এ পাশ করে নিয়েছিল। সালে এখনও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সংস্পর্শ ত্যাগ করেনি। প্রায়ই ক্লাব টেন্টে অথবা খেলা দেখতে আসেন। সালের স্বভাব চরিত্র ভাল, সাধারণের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার এবং বাংলা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলা অভ্যাস করে নিয়েছে।

**ফকরী**—এর প্রকৃত নাম মহম্মদ মাসুদ ফকরী। ইনি পশ্চিম পাকিস্তান কোয়েটার লোক। এর চেহারা দেখতে খুবই সুন্দর। ইউরোপীয়ান ছেলেদেব মত ছিল। ১৯৫২ ৫৩ সাল পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল টীমে খেলেছিল তারপর মোহামেডান টীমেও খেলেছে তার খেলা ছিল ঠিক সাহেবদের মত অথচ খুবই কার্য্যকরী। ফকরীর খেলায় খুবই সৌন্দর্য্যছিল। গোলকরার কায়দা ইত্যাদি ছিল অপূর্ব্ব। তার খেলার কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে।

**সুধীর রায়**—ইনি ও একজন ভাল লেফট আউট সাইডের খেলোয়াড়। ১৯৫৫ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে খেলেছেন। তার পূর্ব্বে এরিয়ান টীমে খেলেছেন। ইনি ঢাকা জেলার লোক।

**মুসা**—এই খেলোয়াড়টি পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী। ১৯৫৬ সালে ইষ্টবেঙ্গল টীমে খেলতে আসেন। লেফট আউট পজিসনে খেলতেন মাঝে মাঝে সেণ্টার ফরোয়ার্ড পজিসনে ও খেলেছেন। এর খেলা খুবই কার্য্যকরীছিল এবং গোল করার দক্ষতা বেশ ভাল রকমই ছিল। ৪ বৎসর ইষ্টবেঙ্গল টিমে খেলে তার পর মোহামেডানে যোগদান করে। একবৎসর মোহামেডানে খেলে গেছেন তারপর কলকাতায় খেলার আর সুবিধা হয়নি।

**নায়ার**—নায়ার সম্বন্ধে এই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনেক লেখা হয়েছে। এ রকম অল রাউণ্ডার খেলোয়াড় খুব কমই দেখা গেছে। গোলকরার দক্ষতা ছিল অপূর্ব্ব। ১৯৪৬ সালে নায়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোল দাতা হিসাবে ৩৫টি গোল করেছিল। লীগ খেলায় অদ্যাবধি উক্ত রেকর্ড কেউ ভাঙ্গতে পারেনি। তার খেলার কথা অনেকেই ভুলতে পারবেনা। নায়ার ক্লাব পরিবর্ত্তন করেছে অনেক বার। প্রথমে নেপিয়ার স্পোর্টিং তারপর রবার্ট হাডসন, ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগান, ভবানীপুর, মোহামেডান স্পোর্টিং প্রভৃতি টীমে খেলেছেন। তবে ইষ্টবেঙ্গল টীমেই তার সুনাম হয়েছিল বেশী একথা ঠিক।

---

এই পুস্তকের পরিশিষ্টাংশে একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ের অবতারণা না করে পারা গেল না—বিষয়টি এই যে মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের চির প্রতিদ্বন্দ্বীতা। একথা লোকের মুখে প্রায়ই শুনতে পাই, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়, যেহেতু মোহনবাগান ক্লাব সৃষ্টি হয়েছে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। আর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব সৃষ্টি হয়েছে ১৯২০ সালে, সুতরাং দেখা যায় যে উভয় টীমের স্থাপনকালের সময়ের তফাৎ ত্রিশ বৎসর। অতএব ত্রিশ বৎসরের ছোট যে প্রতিষ্ঠান

তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় কেমন করে? যাই হউক তবু হয়েছে—একথাও ঠিক। কেন হয়েছে সেই কথার আলোচনা প্রয়োজন। ইষ্টবেঙ্গল সৃষ্টির পর ২য় ডিভিসন লীগে খেলতে আরম্ভ করে। তারপর ১৯২৫ সাল থেকে প্রথম ১ম ডিভিসনে খেলতে থাকে।

মোহনবাগান টীম ইষ্টবেঙ্গল টীমের সঙ্গে প্রথম যখনই সাক্ষাৎ হয়েছে তখনই মার খেয়েছে অর্থাৎ পরাজিত হয়েছে। ১৯২৫ সালে লীগে প্রথম সাক্ষাৎ, তখনই ১—০ গোলে পরাজিত হয়েছে। তারপর আই. এফ. এ. শীল্ডে প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৪৪ সালের সেমিফাইনালে। সেদিনও মোহনবাগানের পরাজয় ঘটে ১—০ গোলের ব্যবধানে। তারপরের বৎসর ১৯৪৫ সালে শীল্ড ফাইনালে এই উভয় দলের সাক্ষাৎ ঘটে। সেই দিনও ১—০ গোলে মোহনবাগান হেরে যায়।

তারপর বর্ত্তমান ভারতের সেরা প্রতিযোগিতা দিল্লীর ডুরাণ্ড কাপ—তাতেও এই উভয় দলের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৫৭ সালে। সেদিনও মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের কাছে ৩—২ গোলে পরাজয় বরণ করে। তারপর বোম্বাই বোভার্স কাপে এই উভয় দলের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৬০ সালে। সেখানেও মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের কাছে ২—১ গোল খেয়ে ফিরে আসে।

তা ছাড়াও ১ম ডিভিসন আই. এফ. এ. লীগ খেলায় এই দুই দলের যতবার সাক্ষাৎ হয়েছে, সেই হিসাব খতিয়ে দেখলে দেখাযাবে ইষ্টবেঙ্গল টীম জয় লাভ করেছে বেশী। অদ্যাবধি ইষ্টবেঙ্গল টীমের জয়ের সংখ্যা বেশী। নিম্নে এই উভয় দলের খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি তাতে সকলেই দেখতে পাবেন কার কত হারজিৎ হয়েছে। এক্ষণে কথা হচ্ছে চির প্রতিদ্বন্দিতা সম্বন্ধে। "চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী" এই শব্দ ব্যবহার করা এদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। যেহেতু এক টীম প্রবীণ আর এক টীম নবীন (যথাসম্ভব); এই জন্যেই উক্ত শব্দ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নয়। তবে এই উভয় দলের তীব্র প্রতিদ্বন্দীতা লক্ষ্যণীয়। কারণ যে কি তা' অবশ্য

জনেসাধারণের বিশেষ ক্রীড়ামোদীদের অজানা নয়, সুতরাং এ সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষিপ্ত ফলাফল নজরে পড়লে আর কারোর কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা হবে না।

১৯২৫ সালের ২০ শে মে তারিখে আই. এফ. এ.র ১ম ডিভিসন লীগ খেলায় মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের প্রথম সাক্ষাৎ। উক্ত সাক্ষাৎকারে ইষ্টবেঙ্গল ১—০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করে।

টীম ছিল এইরূপ—

ইষ্টবেঙ্গল—পূর্ণদাশ, প্রফুল্ল চাটার্জি, সন্তোষ গাঙ্গুলী, হারান সাহা, ননী গোঁসাই, বিজয়হরি সেন, মোনা মল্লিক, সূর্য্য চক্রবর্ত্তী, মোনা দত্ত (অধিনায়ক), হেমাঙ্গ বসু, নেপাল চক্রবর্ত্তী।

মোহনবাগান—এ. ভাদুড়ী, গোষ্টপাল (অধিনায়ক), ডাঃ আর, দাশ, মতি সেন, বলাই চাটার্জি, সুধাংশু বসু, ফজলুর রহমান, রবি গাঙ্গুলী, এস. দাশ গুপ্ত, উমাপতি কুমার, ক্ষেত্র বসু।

উক্ত খেলায় জয়সূচক গোলটি করেছিলেন ইষ্টবেঙ্গলের লেফট আউট নেপাল চক্রবর্ত্তী। রেফারী—ডবলিউ বেনেট।

১৯৪৪ সালে আই. এফ. এ. শীল্ডের সেমি-ফাইনালে দুই দলে প্রথম সাক্ষাৎ। উক্ত সাক্ষাৎকারে ইষ্টবেঙ্গল ১—০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করেছিল। টীম ছিল এইরূপ—

ইষ্টবেঙ্গল—কে. দত্ত, প্রমোদ দাশ গুপ্ত (পরিবর্ত অধিনায়ক), পরিতোষ চক্রবর্ত্তী, এস. তালুকদার, কাইসার, গিয়াসুদ্দিন, কৃষ্ণ রাও, আপ্পারাও, বিশ্বেশ্বর রাও, টবি বসু, ফটিক সিংহ।

মোহনবাগান—রাম ভটাচার্য্য, শরৎ দাস, শৈলেন মান্না, অনিল দে (অধিনায়ক), টি. আও, দ্বিপেন সেন, ডি. রায়